বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

(Islam and Moral Education at the Primary Level of the General Education Curriculum of Bangladesh: A Review)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক
মুহাম্মদ আসকার আলী
রেজি: নং-১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা

(Islam and Moral Education at the Primary Level of the General Education Curriculum of Bangladesh: A Review)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

তত্ত্বাবধায়ক	গবেষক
ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক	**মুহাম্মদ আসকার আলী**
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ	রেজি: নং-১০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
	আরবী বিভাগ
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Zubair Mohammad Ehsanul Hoque
Professor & Chairman
Department of Arabic
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

الدكتور زبير محمد إحسان الحق
أستاذ ورئيس
قسم العربية، جامعة داكا
داكا- ١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No. ....

Date ....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক জনাব মুহাম্মদ আসকর আলী (রেজিঃ ১০/২০১৮-২০১৯, শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৮-২০১৯) কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষাঃ একটি পর্যালোচনা"** (Islam and Moral Education at the Primary Level of the General Education Curriculum of Bangladesh: A Review)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি একটি তথ্যবহুল ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণাকর্মে Plagiarism-নেই। আমার জানামতে, অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থেকে প্রকাশ কিংবা ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমাদানের সুপারিশ করছি।

3/7/23
(অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক)
তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **“বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষাঃ একটি পর্যালোচনা”** (Islam and Moral Education at the Primary Level of the General Education Curriculum of Bangladesh: A Review)” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণাকর্মে Plagiarism-নেই। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশবিশেষ আমি অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি।

(মুহাম্মদ আসকার আলী)
রেজিঃ নং ১০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-২০১৯
যোগদান: ১১/০২/২০১৯ খ্রি.
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংকেতসূচি

অ.	:	অনুবাদ
আ.	:	‘আলায়হিস সালাম
আনু.	:	আনুমানিক
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
ই.বি.	:	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
ড.	:	ডক্টর
ডা.	:	ডাক্তার
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
বি.দ্র.	:	বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
বা.	:	বাংলা/বঙ্গাব্দ
মৃ.	:	মৃত্যু
মু.	:	মুহাম্মদ
মাও.	:	মাওলানা
রা.	:	রাদি আল্লাহু তা’আলা ‘আনহু
রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি ‘আলায়হি
লি.	:	লিমিটেড
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সং.	:	সংস্করণ
হি.	:	হিজরী
Ltd.	:	Limited
P.	:	Page
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন (رموز تلفظ الحروف العربية بالبنغالية)

আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
اء	অ	ض	দ/জ্ব	ـَ	া	وُ	উ
ب	ব	ط	ত্ব	ـِ	ি	وُوْ	ঊ
ت	ত	ظ	য	ـُ	ু	وِيْ	বি/ভী
ث	ছ	ع	‘	اَ	া	يَ	ইয়া
ج	জ	غ	গ	اِيْ	ী	يِ	ই
ح	হ	ف	ফ	اُوْ	ূ	يِيْ	ঈ
خ	খ	ق	ক্ব/ক	أ	আ	يُ	য়ু
د	দ	ك	ক	أ	আ	يُوْ	য়ূ
ذ	য	ل	ল	إ	ই	عَ	‘আ/‘য়া
ر	র	م	ম	إيْ	ঈ	عَا	‘আ/‘য়া
ز	য	ن	ন	أُ	উ	عِ	ই
س	স	ه	হ	أُوْ	ঊ	عِيْ	ঈ
ش	শ	و	ও	وَ\وَا	ওয়া	عُ	উ
ص	ছ	ي	য়	وِ	বি	عُوْ	ঊ

সারসংক্ষেপ (Abstract)

বিশ্ব মানবতার হেদায়াতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানী বিধান ইসলাম। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে এ জীবন বিধান মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে। ইসলামে মানব জীবনের সকল দিক নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনসহ সকল বিষয়। যুগে যুগে যারা ইসলামের যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছে ও যথাযথ অনুসরণ করেছে ইতিহাসে তারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। মানুষের দুনিয়া ও পরকালীন সফলতা নির্ভর করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের উপর। মহানবি (স) এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত নানাভাবে ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার হয়ে আসছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে আমাদের দেশেও নানাভাবে ইসলাম শিক্ষা প্রচার ও প্রসার হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। আমাদের দেশ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭২ সালে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা নামে একটি বিষয় পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ইসলামধর্ম শিক্ষা না থাকায় এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের অনুশীলন না থাকায় প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ আজ অশান্তি, অশ্বস্তি, চরম অরাজকতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণ। ধোঁকা, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, জালিয়াতি, জুলুম. ব্যভিচার, সন্ত্রাস, বেহায়াপনা, দুর্নীতিসহ নানা সমস্যা মানুষের জীবন বিষিয়ে তুলেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য দেশের নীতি নির্ধারণী মহল আইন-কানুন প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা বাস্তবে তেমন কোন কাজে আসছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্যতম পদক্ষেপ হলো শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ইসলামি শিক্ষা প্রদান ও তা বাস্তবজীবনে অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মানবতার মুক্তির জন্য একমাত্র সঠিক জীবন পদ্ধতি ইসলামের শিক্ষাই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় যতটুকু ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা এদেশের জনগণের জন্য কতটুকু উপযোগী ও জনগণের কতটুকু প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে তা গবেষণা সময়ের অপরিহার্য দাবী হয়ে উঠেছে। তাই গবেষক **"বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক বিষয়ে এই গবেষণাকর্মটি রচনা করেছেন। আশাকরি এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে সচেতন মহলের নিকট বর্তমান সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুচারু ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের জন্য অভিসন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে অধ্যায়ের ভূমিকা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি, প্রশ্নমালা তৈরি, উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল, তথ্যের উৎস, গবেষণার সীমাবদ্ধতা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়টি ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পরিচিতি, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে ইসলাম শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার আলাদা আলাদা

পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে। নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা, মুহাম্মদ (স) এর যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে উমাইয়া যুগ ও আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ শিরোনামে অধ্যায়টি উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা, বাংলার বিভিন্ন সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা, বাংলায় সুলতানী আমলের শিক্ষাব্যবস্থা, মুঘল আমলের শিক্ষাব্যবস্থা, বৃটিশ আমল, পাকিস্থান আমল ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিগুলোতে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০)-এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রমের আলোকে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যসূচি ও শিখনফল পর্যালোচনা শিরোনামে অধ্যায়টি উপস্থ্পন করা হয়েছে। অধ্যায়ের শুরুতে বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রণিত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, প্রান্তিক যোগ্যতা, প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত **২৯**টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্য থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সাথে সর্ম্পকিত **১৬**টি প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল (Learning Outcomes), শিখনফলের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, পাঠ্যপুস্তক এবং সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক (তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি এবং পঞ্চম শ্রেণির) শিখনফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ের শিরোনাম গবেষণার ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ। অধ্যায়টিতে গবেষণার মূল বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক ফলাফল উপস্থাপিত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে গবেষণার ফলাফল চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে একটি আলোচনা, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ও একটি উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষ গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিটি গবেষণায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমার এ গবেষণাকর্মটিও সীমাবদ্ধতার বাইরে নয়। আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমি এ অভিসন্দর্ভটি সুন্দর ও প্রাসঙ্গিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার সীমাবদ্ধতা ও যাবতীয় ভুলক্রটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমার এ গবেষণাকর্মটি জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। মহান রব আমাকে ও এ অভিসন্দর্ভের পাঠকদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমিন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যিনি তাঁর অসীম অনুগ্রহে **"বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক বিষয়ে আমাকে এই এম.ফিল অভিসন্দর্ভ রচনা করার তাওফীক দান করেছেন। সাথে সাথে দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান শিক্ষক ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবাদের (রা) প্রতি যারা ইসলামি শিক্ষার প্রসারে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারের প্রতি, যিনি আমাকে তাঁর সানুগ্রহ তত্ত্বাবধানে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। স্যারের আন্তরিক সহযোগিতা ও সস্নেহ পরামর্শ ব্যতিত এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। স্যার শত ব্যস্ততার মাঝেও গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেষণা যুগিয়েছেন, অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, তথ্য সংযোজন, ভাষার ব্যবহারসহ নানা দিক ও বিষয়ে সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ সযত্ন পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন করার নির্দেশনা প্রদান করে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে নিরলস সহায়তা করেছেন। আমি স্যারের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব। মহান আল্লাহ স্যারের দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে আমি যে সব লাইব্রেরি ও গ্রন্থশালা থেকে উপকৃত হয়েছি এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং অনলাইন বই বিক্রির প্লাটফর্ম রকমারী ডট কম অন্যতম। এছাড়া আমার একান্ত প্রিয় কয়েকজন শিক্ষক ও বন্ধুদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে আমি উপকৃত হয়েছি, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞগণ আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক যিনি আমাকে মাদ্রাসায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম স্যার, কৈশোরকাল থেকেই আমার অনুকরণীয় শিক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন স্যার, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাযায়াত উল্লাহ ফারুকী স্যার ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ স্যার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যার ও অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মিজানুর রহমান স্যার, আমি স্যারদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মে আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রেষণা যুগিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষক আবদুল কুদ্দুস তাঁর কাছে আমি বিশেষ ঋণী । এছাড়া বন্ধু আবদুল মান্নান, কবির হোসেন ও

মুহাম্মদ কিফায়াত উল্লাহর নিকট ঋণী। আমাকে আরও যারা উৎসাহ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন স্যার, মাওলানা আব্দুল্লাহ হুজুর, মেজর কামরুল ইসলাম খাঁন স্যার, ড. ফিরোজ খাঁন নুন স্যার, মোহাম্মদ মাইনুল হোসেন স্যার, বন্ধু ফারুক হোসাইন ও বড় ভাই আবদুল হান্নানসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। যে সব প্রতিষ্ঠান ও লেখকের বই, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও জার্নাল ইত্যাদি থেকে তথ্য ও বিবরণ এ গবেষণা কর্মে ব্যবহার করেছি তাদের প্রতিও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে আমার পরিবারের সকল সদস্য, আমার মা, বড় ভাই, ছোট ভাই ও আমার আপুদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষ করে প্রিয়তমা স্ত্রী সাদিয়া সুলতানা সুমাইয়ার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা যিনি আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখে এই অভিসন্দর্ভ রচনায় মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন, সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন তিনি যেন আমার এই গবেষণাকর্ম কবুল করে সাফল্যের আনন্দে ভরিয়ে দেন।

মুহাম্মদ আসকার আলী
গবেষক

সূচিপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
		♦ প্রত্যয়নপত্র	II
		♦ ঘোষণাপত্র	III
		♦ সংকেতসূচি	IV
		♦ প্রতিবর্ণায়ন	V
		♦ সারসংক্ষেপ **(Abstract)**	VI-VII
		♦ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	VIII-IX
প্রথম অধ্যায়	:	ভূমিকা	**১-১০**
	:	● প্রস্তাবনা	২
	:	● গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
	:	● গবেষণার যৌক্তিকতা	৪
	:	● গবেষণা পদ্ধতি	৪
	:	● গবেষণার পরিধি	৫
	:	● নমুনা নির্বাচন	৫
	:	● প্রশ্নমালা তৈরি	৫
	:	● উপাত্ত সংগ্রহ	৫
	:	● উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল	৫
	:	● তথ্যের উৎস	৬
	:	● তথ্যসূত্র উপস্থাপন পদ্ধতি	৬
	:	● গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৬
	:	● সাহিত্য পর্যালোচনা	৭
		● শেষকথা	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পরিচিতি, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ	**১১-৪১**
	:	● ইসলাম এর পরিচয়	১২
	:	● শিক্ষার পরিচয়	১৪
	:	● ইসলামি শিক্ষা	১৭
	:	● নৈতিকতা	১৮
	:	● নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ	১৯
	:	● নৈতিক শিক্ষার পরিচয়	২১
	:	● ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২১
	:	● ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	২২
	:	● ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ	২৪

	:	● ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা	২৫
	:	● ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ	২৫
	:	● হিযরতের পূর্বে মক্কার শিক্ষাব্যবস্থা	২৫
	:	● মসজিদে আবু বকর (রা) প্রথম তা'লীমী মাদ্রাসা	২৬
	:	● ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের (রা) শিক্ষাকেন্দ্র	২৬
	:	● দারুল আরকাম মাদরাসা	২৭
	:	● হিজরতের পূর্বে মদিনার শিক্ষাব্যবস্থা	২৭
	:	● মসজিদ-ই-বনি যুরাইক মাদরাসা	২৮
	:	● মসজিদে কুবা মাদরাসা	২৮
	:	● মাদরাসা-ই-নাকী আল খাদিমাত	২৮
	:	● মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী গামীমের তালীমী মাদরাসা	২৯
	:	● রাসুলুল্লাহ (স) এর হিজরতের পর মদিনার শিক্ষাব্যবস্থা	২৯
	:	● প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র মসজিদে নববী	২৯
	:	● খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৬৩২ খ্রি.-৬৬১ খ্রি)	৩১
	:	● হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ	৩১
	:	● হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ	৩২
	:	● হযরত উসমান (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ	৩৩
	:	● হযরত আলী (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ	৩৩
	:	● উমাইয়া যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)	৩৫
	:	● আব্বাসীয় যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)	৩৬
	:	● আব্বাসী খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মাদ্রাসা ও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ	**৪২-৭৯**
	:	● নামকরণ	৪৩
	:	● স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪৩
	:	● জনসংখ্যা	৪৪
	:	● প্রশাসনিক কাঠামো	৪৪
	:	● শিক্ষা	৪৪
	:	● বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা	৪৫
	:	● ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলার বিভিন্ন সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা	৪৬
	:	● সুলতানী আমলে ইসলামি শিক্ষা	৪৬
	:	● সুলতান মাহমুদ (১০০০-১০২৬ খ্রি.)	৪৭
	:	● সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬ খ্রি.)	৪৭
	:	● ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (১২০৪ খ্রি.)	৪৭

	:	● কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)	৪৮
	:	● সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)	৪৮
	:	● সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন(১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)	৪৮
	:	● জালাল উদ্দীন ফিরোজ খিলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)	৪৮
	:	● আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩০৬ খ্রি.)	৪৯
	:	● গিয়াস উদ্দীন তুগলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)	৪৯
	:	● মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)	৪৯
	:	● ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)	৪৯
	:	● আলা উদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)	৫০
	:	● মুঘল আমলে ইসলামি শিক্ষা	৫১
	:	● সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)	৫১
	:	● সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.)	৫১
	:	● শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.)	৫২
	:	● সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)	৫২
	:	● সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)	৫৩
	:	● সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)	৫৩
	:	● সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)	৫৪
	:	● ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার যুগবিভাগ ও পাঠ্যসূচি (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)	৫৪
	:	● মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্‌রাসা	৫৮
	:	● বৃটিশ আমলে ইসলামি শিক্ষা	৬১
	:	● বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস	৬২
	:	● মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা	৬২
	:	● কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা	৬২
	:	● লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত	৬৪
	:	● ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষণা	৬৫
	:	● ১৮৩৫ সালে পাক ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ প্রবর্তিত ১ম শিক্ষানীতির পর্যালোচনা	৬৫
	:	● প্রাথমিক শিক্ষা	৬৬
	:	● ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন-১৮৮২ খৃ.	৬৬
	:	● মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্টা (হর্নেল কমিটি)-১৯১৪-১৯১৫ খৃ.	৬৭
	:	● মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারি (মোমিন) কমিটি (১৯৩১-৩৪ খৃ.)	৬৭
	:	● বৃটিশ বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্ন্তভুক্তকরণ	৬৮
	:	● পাকিস্তান আমলে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা	৬৮
	:	● শিক্ষা বিস্তারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা	৬৯
	:	● শিক্ষাক্রম	৬৯

	:	● জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৫৯ খৃ. (এস.এম. শরীফ কমিশন)	৭০
	:	● পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি-১৯৬৯ খ্রি. (এয়ার মার্শাল এম. নূর খান কমিশন)	৭১
	:	● পাকিস্তান সরকারের নতুন কমিটি শিক্ষানীতি-১৯৭০ খ্রি. (শামসুল হক কমিটি)	৭২
	:	● বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা	৭২
	:	● জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৭২ খ্রি. (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন)	৭৩
	:	● জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট-১৯৭৬	৭৪
	:	● বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮ খ্রি. মফিজ উদ্দীন কমিশন	৭৪
	:	● জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ খ্রি	৭৫
	:	● জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন)	৭৬
	:	● জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০	৭৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যসূচি ও শিখনফল পর্যালোচনা	**৮০-১৪০**
	:	● বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান	৮১
	:	● জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৮২
	:	● জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৮৪
	:	● প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম	৮৬
	:	● প্রান্তিক যোগ্যতা	৮৭
	:	● শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	৮৮
	:	● শিখনফল (**Learning Outcomes**)	৮৮
	:	● পাঠ্যপুস্তক	৮৯
	:	● জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা	৯০
	:	● তৃতীয় শ্রেণি	৯০
	:	● চতুর্থ শ্রেণি	১০১
	:	● পঞ্চম শ্রেণি	১১৮
পঞ্চম অধ্যায়	:	গবেষণার ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ	**১৪১-১৭১**
		● ভূমিকা	১৪২
	:	● গবেষণার ফলাফল	১৪২
	:	● ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী	১৪২
	:	● ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী	১৪৭
	:	● ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী	১৫০
	:	● শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	১৫৫
	:	● শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)	১৫৭

	:	● অভিভাবক (৩য় ও ৪র্থ) শ্রেণি	১৬০
	:	● অভিভাবক (৫ম) শ্রেণি	১৬১
	:	● আলোচনা	১৬৩
	:	● সুপারিশ	১৬৭
	:	● পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ	১৭১
		♦ উপসংহার	১৭২
		♦ গ্রন্থপঞ্জি	১৭৩
		♦ পরিশিষ্ট	১৭৯

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

প্রস্তাবনা: ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত শাশ্বত জীবন বিধান। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً

"আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে (ইসলাম) পূর্ণতা দান করলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম, আর দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করলাম" (আল কুরআন: ০৫: ০৩)। এতে মানব জীবনের সকল দিক আলোচিত হয়েছে। তাই ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ সকল দিক থেকে একজন মানুষ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য ইসলাম শিক্ষা অর্জন ও চর্চা অপরিহার্য।

সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। বহু বছর ভিনদেশী শাসকদের দ্বারা শোষিত হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দেশকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। তাই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উপযোগী সমাজগঠনমূলক সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭২ সালের এক আদেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন করে। এটি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ নামে পরিচিত। এ কমিশনে ১ম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক রাখা হয়। এরপর ১৯৮৮ সালে ড. মফিজ উদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত হয় দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশন। এ কমিশনে ধর্মশিক্ষাকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। এরপর ১৯৯৭ সালে ড. শামসুল হুদার নেতৃত্বে "জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭" গঠিত হয়। এ কমিশনেও ১০০ নম্বরের ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যিক রাখা হয়। পরবর্তীতে এম.এ বারী "শিক্ষা কমিশন ২০০১" এবং ২০০৩ সালে ড. মনিরুজ্জামান মিয়ার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ গঠিত হয়। সর্বশেষ ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯, যেটি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করে। এ শিক্ষানীতিতে ও ১০০ নম্বরের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা আবশ্যিক রাখা হয়।

ঐ সব সুপারিশে পাঠ্যসূচিতে ইসলামধর্ম শিক্ষা রাখা হলেও তা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে নাম মাত্র রাখা হয়েছে। অথচ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে "শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। প্রত্যেক ধর্মে ধর্মীয় মৌলিক বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর

দেয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া” (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, পৃ. ২০)।

কিন্তু এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে আদৌ কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব নয় বলে মনে করেন সচেতন জনসাধারণ। তাই বর্তমানে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে নানা অসংগতি দেখা যাচ্ছে, অপরাধ প্রবনতা, সুদ, ঘুষ, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, হত্যা, মাদকাসক্তি, প্রতারণা, মদ, জুয়া, কিশোর গ্যাং এবং ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান না মানাসহ অসংখ্য অপরাধ ব্যাপকতা ছাড়িয়েছে। আর শিক্ষার্থীরা ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে দিন দিন ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এছাড়া প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে যে, ধর্ম সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানার কারণে অনেক তরুণ তরুণী ধর্মের অপব্যাখ্যায় প্রভাবিত হয়ে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে, ফলে দেশ ও সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যেও অনৈতিকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে গেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী হলেও মনুষত্ববোধ তৈরী সম্ভব হয়নি। যার খেসারত দিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে আর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরী হচ্ছে ও দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এসব থেকে মুক্তি ও দক্ষ নৈতিকতাসম্পন্ন প্রশাসন, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, লেখক, বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, বিচারক, চিন্তাবিদ তৈরী করতে হলে কতটুকু ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন তা গবেষণা সময়ের দাবী। যেহেতু শিশুকিশোর বয়সেই উন্নত চরিত্র গঠন ও বিকাশ সাধনের উপযুক্ত সময়, তাদের নিষ্পাপ কোমল হৃদয়ে যা একবার গ্রথিত হয় তা পাথরে খোদাইয়ের মত স্থায়িত্ব লাভ করে। এ জন্য “শিক্ষা জীবন অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু থেকেই শিশুদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন” (নার্গিস, ২০১৫, পৃ. ১৮)।

কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে যতটুকু ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা জনগণের জন্য কতটুকু উপযোগী ও জনগণের প্রয়োজন কতটুকু পূরণ করতে পারছে এ বিষয়ে কোন একাডেমিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই গবেষক “বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমের প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা” শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার মনস্থির করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

সকল ধর্মের মানুষের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অপরিহার্য। কেননা ধর্মীয় শিক্ষাই মানুষের আচরণকে শৃঙ্খলিত করতে পারে। শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুর চরিত্র গঠনের চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষা যতক্ষণ না উত্তম চরিত্র গঠনে ব্রতী হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হবে না (আলম, ২০০৮, পৃ. ১৮)। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য সঠিক ও যথাযথ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা আবশ্যক বলে ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। যাতে তারা নিজেদের আদর্শ নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা কতটুকু বাস্তবসম্মত ও প্রয়োগযোগ্য তা গবেষণা করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। তাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো:

- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পরিচিতি, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ তুলে ধরা।

- বাংলাদেশে ইসলাম শিক্ষার ক্রমবিকাশ তুলে ধরা।
- স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিগুলোতে ইসলামি শিক্ষার স্থান নির্ণয় করা।
- শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রণীত তৃতীয়-পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের শিখনফল মূল্যায়ন করা।
- শিক্ষানীতি-২০১০ এ বর্ণিত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা।
- সৎ, দক্ষ ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরীতে ইসলাম শিক্ষার অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি হলো শিক্ষার অধিকার। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ যেহেতু মুসলিম সেহেতু শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি ধ্যান ধারণার প্রধান্য থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার পর থেকে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়নি। সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় মাত্র ১০০ নম্বরের ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। ফলে দেশের সাধারণ জনগণ ইসলাম সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতে পারে। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের মানুষ ইসলামের বাস্তব অনুশীলন ও অনুসরণ থেকে অনেকাংশে দূরে সরে গিয়েছে। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হলেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কাঙ্খিত সোনার মানুষ গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। দেশ আজ অন্যায়, অবিচার, অনাচার. হত্যা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি ও প্রতারণাসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হলো যে সমস্ত দেশ, জাতি বা গোষ্ঠি ইসলামের যথাযথ অনুসরণ করেছে তারা কখনো এমন সংকটে পতিত হয়নি। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামের কিছু অংশ শিক্ষা দেওয়ার কারণে কাঙ্খিত নৈতিকমান সম্পন্ন জাতি গঠন সম্ভব হচ্ছে না। মানুষের মৌলিক চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা সৃষ্টির জন্য যে যৎসামান্য কর্মসূচি পরিচালিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যার সুবিধা নিচ্ছে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মানুষের মাঝে ইসলামের নামে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখালেখি হলেও সম্মিলিত প্রচেষ্ঠা ও গবেষণার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা অত্যধিক। আর এ প্রচেষ্ঠার অংশ হিসেবে গবেষক **"বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা: একটি পর্যালোচনা"** শীর্ষক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন।

গবেষণা পদ্ধতি

যে কোন গবেষণা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন সঠিক গবেষণা পদ্ধতি। সম্প্রতি মিশ্র পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ সম্পর্কে caswell বলেন, A mixed research design always a better understanding of a research problem then either qualitative or quantitative data itself (katheri CR and others, 2014, p.1-20). এই গবেষণাকর্মটি মিশ্র পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণাটিতে গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নমালার সাহায্যে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তথ্যাদি উপস্থাপন ও ব্যাপক বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

গবেষণার পরিধি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের "তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণি" এর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই নির্বাচন করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সর্বশেষ (২০১০ সাল) পর্যন্ত প্রণীত সকল শিক্ষানীতি পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

নমুনা নির্বাচন

দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ১টি বড় বিভাগীয় শহর চট্টগ্রামের ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১০টি স্কুলের ১০ জন সহকারী শিক্ষক, ৩০ জন অভিভাবক, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির প্রত্যেক শ্রেণি থেকে ১ জন করে ১০+১০+১০=৩০ জন শিক্ষার্থীকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২ জন শিক্ষা কর্মকর্তা, ১ জন কারিকুলাম বিশেষজ্ঞকে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বমোট ৭৩ জনের সাক্ষাতকার ও মতামতের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা তৈরী

এই গবেষণাকর্মের জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞের জন্য আলাদা আলাদা ৫ সেট প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রথমে ১টি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরী করে চট্টগ্রামস্থ ২টি বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক, ৪ জন অভিভাবক, ১২ জন শিক্ষার্থী, ১ জন শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সেখান থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ও ত্রুটি বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে প্রশ্নপত্রের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নমালা নির্বাচিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও বিশেষজ্ঞদের মাঝে বিলি করা হয়েছে এবং উত্তরপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের সময় গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তথ্যদাতার সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উপাত্ত বিশ্লেষণ কৌশল

যে কোন গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কারণ তথ্য বিশ্লেষণের উপরই গবেষণার ফলাফল নির্ভর করে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত উত্তর ও মতামত গড়, শতকরা হিসাব এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে সারণী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস

এই গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য প্রধান ২টি উৎস নির্বাচন করা হয়েছে।

১.প্রাথমিক উৎস (Primary source) ও

২.দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary source).

প্রাথমিক উৎসসমূহ

নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ। প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎসসমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বই, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতির রির্পোটসমূহ, শিক্ষা ও ইসলাম শিক্ষা সংক্রান্ত দেশ বিদেশের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম, বই, জার্নাল, প্রবন্ধ প্রভৃতি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র উপস্থাপন পদ্ধতি

একজন গবেষককে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করতে হয়। গবেষণাকর্মকে প্রামাণ্য ও মৌলিক হিসেবে উপস্থাপনের জন্য গবেষক নিজস্ব চিন্তা-দর্শন, ভাষা ও তত্ত্ব প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় গবেষকের বক্তব্য শক্তিশালী ও জোরালো করার জন্য গবেষক বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য বা উদ্বৃতি উপস্থাপন করে থাকেন। যদি কোন উৎস থেকে তথ্য বা উদ্বৃতি উপস্থাপন করে তা উল্লেখ না করে গবেষক নিজের বলে চালিয়ে দেয় তা চৌর্যবৃত্তি বা Plagiarism হিসেবে গণ্য হয়; যা গবেষকের জন্য একটি নিষিদ্ধ কাজ। গবেষক এই গবেষণাকর্মে বিভিন্ন উৎস থেকে উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছেন। এখানে উদ্বৃতি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে APA বা American Psychological Association পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন যা বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষক নিরপেক্ষতার সহিত পূর্ণ আন্তরিকতা বজায় রেখে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার প্রয়াস পান। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং সমগ্র বাংলাদেশ থেকে কেবল চট্টগ্রাম বিভাগের ১০টি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বয়স কম হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তারা উত্তর দিতে গিয়ে জড়তায় ভূগেছে। এ বিষয়টি গবেষক নিজস্ব দক্ষতায় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকল উত্তরদাতা আন্তরিকতার সহিত তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছেন। গবেষণাকর্মটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সময় ও অর্থ সংকটের কারণে বিষয়টিকে ব্যাপক আকারে গবেষণার

আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তারপরও গবেষণাকর্মটি যৌক্তিক করার জন্য গবেষক পূর্ণ আন্তরিকতা ব্যবহারের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

যে কোন একাডেমিক গবেষণাকর্মের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা বা ইতোপূর্বে সম্পাদিত গবেষণাকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি গবেষণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাহিত্য পর্যালোচনার লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্বেকৃত গবেষণা, বই, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে গবেষককে গভীর ও সুচিন্তিত ধারণা প্রদান করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের করণীয় নির্ধারণ করতে সাহায্য করা। যেহেতু সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে পূর্বে সম্পাদিত গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা যায় এবং বর্তমান গবেষণার সমস্যা সমাধানের ধারণা লাভ করা যায় সেহেতু বলা যায় সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার একটি কম্পাস হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে যে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু প্রবন্ধ লেখা হলেও উল্লেখযোগ্য কোন একাডেমিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তবুও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যেসব তথ্য-উপাত্ত থেকে গবেষক উপকৃত হয়েছেন তা থেকে বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে কতিপয় বই, প্রবন্ধ ও গবেষণাকর্মের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন

গ্রন্থটি ড. শেখ সালমা নার্গিস-এর পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের কিছুটা সংক্ষিপ্তরূপ। গবেষণায় তিনি বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে নৈতিক শিক্ষা অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষক তার এই গবেষণায় বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের মোট ২৪টি বই অর্থাৎ ১ম শ্রেণির ৩টি, ২য় শ্রেণির ৩টি, ৩য় শ্রেণির ৬টি, ৪র্থ শ্রেণির ৬টি এবং ৫ম শ্রেণির ৬টি বইয়ের পাঠ্যসূচিতে যে নৈতিক শিক্ষার বিভিন্ন আলোচনা এসেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মোট ৭০টি নৈতিকতা চিহ্নিত করেছেন এবং শ্রেণি কক্ষে তার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হিসেবে কতটুকু ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে তার কোন সুপারিশ বর্ণিত হয়নি।

রাসূলুল্লাহ (স) এর শিক্ষানীতি

গ্রন্থটিতে ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম রাসুলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষানীতি অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এখানে তিনি রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার ধরণ, শিক্ষার পাঠ্যসূচি এবং তার ছাত্রদের সম্পর্কে আলোকপাত করেন। লেখক গ্রন্থটিতে দেখিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষানীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নৈতিক চরিত্র গঠন ও মানুষের আত্মিক উন্নয়ন। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষানীতির বৈপরিত্য সম্পর্কে ও আলোচনা করেন। নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে লেখক বলেন, আজকের জগতে বিদ্রোহী তারুণ্য কোন আদর্শের পরিচয় না পেয়ে হয়ে উঠেছে আগ্নেয়গিরির মত ধ্বংসময়ী। পরিবার, সমাজ ও দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অন্যায়, হিংসা,

বিদ্বেষ, জুলুম-নির্যাতন, ব্যভিচার, হানাহানি ইত্যাদি থেকে তারুণ্যকে বাঁচাতে হলে তরুণ সমাজের কাছে ইসলামের আদর্শের শিক্ষা তুলে ধরার তীব্র প্রয়োজন।

ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

গ্রন্থটিতে অধ্যাপক খুরশীদ আলম ইসলামি শিক্ষার মূলনীতি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন মনীষীর মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি উদার মতাবলম্বী শিক্ষার ব্যর্থতা তুলে ধরেন। আমাদের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই দায়ী করেন। ইমাম গাযালীর উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "শিক্ষা পদ্ধতি তরুণ মনকে শুধু জ্ঞান পূর্ণ করতেই চাবে না একে অবশ্যই একই সঙ্গে শিশুর নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি এবং তার মনে সামাজিক জীবনের গুণাবলীর ধারণা দিতে হবে" (আলম, ২০০৮, পৃ. ১৮)।

শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা

আবদুল মালেক ও অন্যান্য লেখকগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থটিতে শিক্ষার পরিচয় ও বিকাশ, শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, শিখনের মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন দিক থেকে বাংলাদেশে শিক্ষার কাঠামো, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাসহ গুণগত শিক্ষা, শিক্ষা উন্নয়ন ও পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। লেখকগণের মতে, শিক্ষার্থীদের সামাজিক, জাতীয় চেতনাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার প্রধান মাধ্যম হলো ধর্ম। ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপর, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী ও মূল্যবোধসম্পন্ন মহৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আধুনিক যুগের জটিল জীবনব্যবস্থা একটা নিয়মতান্ত্রিক সুশৃংঙ্খল পদ্ধতিতে নিয়ে আসার জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো আবশ্যক (মালেক ও অন্যান্য, ২০১২, পৃ. ৬৯)। সর্বোপরি বাংলাদেশে শিক্ষা বিজ্ঞানের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে গ্রন্থটিতে।

রাসূলুল্লাহর (স) শিক্ষাদান পদ্ধতি

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ রচিত উক্ত গ্রন্থটিতে জ্ঞান সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) এর দিক নির্দেশনা, রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষাভাবনা, শিক্ষানীতি, কারিকুলাম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, ইসলামের আলোকে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের স্থান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে রাসুলুল্লাহ (স) এর সময়ের বিস্তারিত পাঠ্যসূচি ও পাঠদান পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। শিক্ষক হিসেবে রাসুল (স) কেমন ছিলেন তার বর্ণনায় লেখক বলেন, "বর্ণনার সৌন্দর্যে, ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কথার স্পষ্টতায়, নিয়ম পদ্ধতির মাধুর্যে, ইশারা ইঙ্গিতের চমৎকারিত্বে, প্রাণের আলোকচ্ছটায়, অন্তরের কোমলতায়, বক্ষের প্রশস্ততায়, দয়া- মমতার প্রাচুর্যে, কঠোরতার বিজ্ঞতায়, সতর্কতার মহানুভবতায়, মেধার প্রখরতায়, যত্ন-তত্ত্বাবধানের পরিপক্কতায় এবং মানুষের সঙ্গদানের পর্যাপ্ততায় তিনি ছিলেন এই পৃথিবীর সত্যিকার অর্থেই প্রথম কল্যাণকর শিক্ষক" (মাবুদ, **২০১৫**, পৃ. ১৬)। সর্বোপরি পুস্তকটিতে রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষাদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.) কর্তৃক রচিত গ্রন্থটিতে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় ইসলামি শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিবাচক দিকসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার নামে মুসলিমদের কূপমুন্ডুক, চরিত্রহীন জাতি হিসেবে গড়ার ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের চিত্র ফুটে উঠেছে এ গ্রন্থে। মুসলিম জাতি ইসলামের সুমহান আদর্শের পরিবর্তে বহু দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুসলিমরা ইসলামি শিক্ষাদর্শন বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শন গ্রহণ করেছে নির্দ্বিধায়। তাই তাদের মাঝে দেখা দিয়েছে অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, পাপাচার ইত্যাদি। তা থেকে উত্তরণের জন্য লেখক অকাট্য যুক্তি ও তত্ত্বের আলোকে পাঠককে আকৃষ্ট করেছেন এ গ্রন্থে । ইসলামি শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত তারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এ গ্রন্থে।

শিক্ষার ভিত্তি (দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আইনগত ভিত্তি)

স্বপন কুমার ঢালী ও রেজা ইমাম কর্তৃক রচিত গ্রন্থটিতে দর্শন ও শিক্ষাদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর শিক্ষাদর্শনসহ আরো কয়েকজন মুসলিম মনীষীর শিক্ষাদর্শন আলোচিত হয়েছে। যেমন, হযরত আলী (রা), ইমাম আল গাজ্জালী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ। এছাড়া এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের ও ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে। যেমন, কনফুসিয়াস, এরিস্টটল, প্লেটো, রুশো, ফ্রয়েবল প্রমুখের শিক্ষাদর্শন। আর প্রাচীন আমল থেকে বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিক বিবরণও পাওয়া যায়। শিক্ষার সাথে সামাজিক সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে যুক্তিপূর্ণ উপায়ে। সর্বশেষ বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত শিক্ষার বিভিন্ন আইনগত ধারার বিবরণ পাওয়া যায়।

শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

লেখক মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান গ্রন্থটিতে শিক্ষা, শিক্ষাদর্শনের পরিচয় ও স্বরূপ, শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ আলোচনা করে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কোন মতবাদ উপযোগী সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া ভাববাদ, প্রয়োগবাদ, প্রতিষ্ঠাবাদ, বাস্তববাদ, জড়বাদ ও যুক্তিবাদসহ সারগ্রাহী তত্ত্ব আলোচনা করেন। গ্রন্থের বড় অংশজুড়ে আলোচনা হয়েছে ইসলামি জীবনদর্শন, শিক্ষার নৈতিক ও ধর্মীয় ইস্যু, শিক্ষায় নৈতিকতার স্থান, নৈতিক ও নৈতিক মানদন্ড, ধর্ম ও শিক্ষার দর্শন, গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, চিন্তা ও শিখন তত্ত্ব, শিখন অনুশীলন, শিক্ষক এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান আলোচনা করেছেন। শিক্ষায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ও ভূমিকার যথার্থ বর্ণনা পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। এছাড়া বিখ্যাত শিক্ষা দার্শনিকদের শিক্ষাদর্শন বর্ণনাসহ লেখক নিজের ব্যক্তিগত মতামত পেশ করেছেন। নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে লেখক বিভিন্ন দার্শনিকের ও বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, “ব্যক্তি পরিচয়, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে নৈতিকতার অবলম্বন ব্যাতিত অগ্রসর হওয়ার কোন সুযোগ নেই” (রহমান, ২০১১, পৃ. ১৮৪)।

যুগেযুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ

মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী কর্তৃক রচিত গ্রন্থটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা, শিক্ষানীতি ও শিক্ষার ইতিহাসের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, শিক্ষা কমিশনগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা ও রিপোর্ট আলোচিত হয়েছে। বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের শিক্ষার ধারণা পেতে হলে গ্রন্থটি বেশ উপযুক্ত। গ্রন্থের সারমর্ম হিসেবে লেখক উল্লেখ করেন, আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির নামে অনেকগুলো শিক্ষা কমিটি ও কমিশন গঠিত হলেও কোন শিক্ষানীতি বা কমিশনের সুপারিশ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। তাই তিনি মনে করেন, “চিকিৎসক যত বিজ্ঞ হোক না কেন, তার ব্যবস্থাপত্র যত সঠিক হোক না কেন তা যদি যথাযথ অনুসরণ না করা হয় তবে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে না। তাই শিক্ষা কমিশনের নীতি ও সুপারিশ বাস্তবায়িত না হলে পরিবর্তন আশা করা যায় না” (আলী, **১৯৯৯,** পৃ. ৬১৫)।

শেষকথা

ইসলামি শিক্ষা হলো মুসলমানদের জন্য আবশ্যকীয় মৌলিক শিক্ষা। রাসুল (স) এর সময় থেকেই মুসলিমরা ইসলামি শিক্ষার জন্য নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে আসছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিমরা সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনসহ সব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সাথে সাথে একটি নৈতিকমান সম্পন্ন জাতি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ, সর্বজনীন, সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ একটি দেশ গড়া সম্ভব। অন্যান্য শিক্ষার তুলনায় ইসলাম শিক্ষার পরিধি ও বলয় অত্যন্ত ব্যাপক। একটি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এর বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করা জরুরি। এ গবেষণাকর্মটিতে গবেষক সে প্রয়াস চালিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পরিচিতি, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পরিচিতি, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

ইসলাম এর পরিচয়

ইসলাম **إسلام** শব্দটি **سلم** শব্দমূল হতে উদ্ভূত, এটি বাবে **إفعال** এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, শান্তির পথে চলা, আপোষ করা বা বিরোধ পরিহার করা (আল ফরহীদী, ১৪১৪ হি, পৃ. ৮৪৮)। যেমন- আল্লাহ তায়ালার বাণী:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

“স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, অনুগত হও, তিনি (ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অনুগত হলাম” (আল কুরআন: ০২: ১৩১)।

إسلام এর আরো অর্থ রয়েছে: যেমন- সন্ধি ও নিরাপত্তা, শান্তি, আনুগত্য ও হুকুম পালন করা, আত্মসমর্পণ করা, কল্যাণ লাভ করা ইত্যাদি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামি বিশ্বকোষ এ বলা হয়েছে ইবাদত, দ্বীন ও আকীদাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা (ইফা, ২০০৬, পৃ. ৫১২)।

লিসানুল আরব গ্রন্থকার বলেন:

الإسلام والإستسلام الإنقياد

ইসলাম ও ইসতিসলাম অর্থ অনুগত হওয়া (আল ইফরীকী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৪)।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلْ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

“তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও” (আল কুরআন: ৪৯: ১৭)।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় **إسلام** শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন দ্বীন হিসেবে/জীবন বিধান হিসেবে-

মহান আল্লাহ বলেন: **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ** “নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবন বিধান হলো ইসলাম” (আল কুরআন: ০৩: ১৯)।

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ

“যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। পরকালে সে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হবে” (আল কুরআন: ০৩: ৮৫)।

সূরা আল মায়িদায় মহান বলেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً

"আজ আমি তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে (ইসলাম) পূর্ণতা দান করলাম, আর তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম, আর দ্বীন তথা ইসলামকে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করলাম" (আল কুরআন: ০৫: ০৩)।

সূরা বাক্বারাহতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু" (আল কুরআন: ০২: ২০৮)।

পরিভাষায় ইসলাম অর্থ হলো, আল্লাহর আনুগত্য করা বা অনুগত হওয়া এবং তার নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা।

লিসানুল আরব গ্রন্থকার এর মতে:

والاسلام من الشريعة اظهار الخضوع واظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه –

"শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আনুগত্য প্রকাশ করা, প্রকাশ্যভাবে শরীয়তের আহকাম পালন করা এবং নবী করীম (স:) যা যা নিয়ে আগমন করেছেন সে সব আকড়িয়ে ধরা। আর এরই মাধ্যমে তার রক্ত সংরক্ষিত হয় এবং অপছন্দনীয় বস্তু থেকে রক্ষা পায়" (আল ইফরীকী ১৯৯৩, পৃ. ৩৫৪)।

ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে নবি (স) বলেছেন:

الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلواة المفروضة و تصوم رمضان–

"ইসলাম হচ্ছে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে শরীক করবে না, ফরজ নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং রমজানের রোজা রাখবে" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৪৪১৯)।

বার্নাড লুইস এর মতে:

ইসলামের ঐতিহ্যগত অর্থ ধারাবাহিকভাবে নবি ও রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক এ পৃথিবীর জন্য দিক নির্দেশনা হিসেবে জীবন ব্যবস্থা আর মরনোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা প্রদান, আর সাধারণ অর্থে পবিত্র কুরআনের উপদেশ ও অনুশীলনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (স) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে বুঝায় (Lewis , 1992, p. 25). সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স) এর সমস্ত জীবনে প্রদর্শিত বিধান অর্থাৎ রাসুল (স) এর যাবতীয় কাজকর্ম, কথাবার্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদির সামষ্টিক নামই ইসলাম। আর **سلم** শব্দমূল থেকে **فاعل** বা কর্তৃবাচক শব্দ হল **مسلم** অর্থাৎ যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে রাসুল (স) এর প্রতি আনুগত্য করে এবং ইমানের সাতটি শর্তকে বিশ্বাস করে তাদেরকে **مسلم** বা আত্মসমর্পণকারী বলা হয়। আর ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান যেটি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো" (আল কুরআন: ০২: ২০১)। আর দুনিয়ার কর্ম ভালো হলে আখিরাতে ভালো প্রতিদান পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবি হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হলেও তা পূর্ণতা পায় সর্বশেষ নবি ও আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে। মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুলের মাধ্যমে তাঁর যে বিধিবিধান পাঠিয়েছেন তার সমষ্টিকে আমরা ইসলাম বলতে পারি। সর্বজনীন এই ধর্মটি আল্লাহর নিকট মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা। সুতরাং ইসলাম হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত রেখে পরকালীন চিরস্থায়ী শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি অর্জনের পথে চলার নাম।

শিক্ষার পরিচয়

শিক্ষা শব্দটি পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির কাছে একটি অতি পরিচিত প্রত্যয়। মানুষের জীবনবোধ, চেতনা, বিশ্বাস, পার্থিব জীবন পরিচালনা, নৈতিক মূল্যবোধ, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, সামষ্টিক জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য জ্ঞান অর্জন করার নামই শিক্ষা। শিক্ষার কোন একটি বিশেষ ধারণা কোন কালেই সর্বজনস্বীকৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। শিক্ষাবিদদের গবেষণা, অনুসন্ধান, দৃষ্টিভঙ্গি, কৌশল, এবং নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের কারণে শিক্ষার ধারণা হয়েছে বহুমাত্রিক।

শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার ধারণা ও সংজ্ঞা, লক্ষ্য উদ্দেশ্যে ঐক্যমতে পৌছাতে পারেননি। শিক্ষা শব্দটি বহুল প্রচলিত তাই শিক্ষা প্রত্যয়টিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

শিক্ষা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো **تعليم** এর মূল ধাতু হলো **علم**। এটি **باب تفعيل** এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। **تعليم** শব্দের অর্থ হলো শিখিয়ে দেয়া, অবহিত করা, পাঠদান করা ইত্যাদি (রহমান, ২০১৭, পৃ. ২৭২)।

শিক্ষা শব্দের বহুল প্রচলিত ৪টি প্রতিশব্দ হলো:

ক. **تعليم** শব্দের অর্থ হলো শিক্ষা প্রদান করা, শিখিয়ে দেয়া, অবহিত করা, পাঠদান করা ইত্যাদি (রহমান, ২০১৭, পৃ. ২৭২)।

খ. **تاديب** শব্দের অর্থ হলো আচরণ শিক্ষা দেওয়া, শিষ্টতা, ভদ্রতা, সুআচরণ ইত্যাদি।

গ. تدريب শব্দের অর্থ হলো ভালো ও সুন্দর ব্যবহার শিক্ষা দেয়া, অনুশীলন, হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া, অভ্যাস করা ইত্যাদি।

ঘ. تدريس শব্দের অর্থ হলো শিক্ষাদান ও গ্রহণ, শিক্ষা ইত্যাদি (Hans Wehr, 1976, p. 278).

শিক্ষা শব্দের বাংলা আরেকটি প্রতিশব্দ হলো-বিদ্যা। আর বিদ্যা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো- علم এটি একবচন, বহুবচন علوم।

علم শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্ঞান, বুঝা, জানা, অনুধাবন করা ইত্যাদি (রহমান, ২০১৭, পৃ. ৭১৪)।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ইলম শব্দটি নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী:

لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"আমাদের কোন জ্ঞান নেই, আপনি যা শিখিয়েছেন তাছাড়া। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী" (আল কুরআন: ০২: ৩২)।

রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

خيركم من تعلم القران وعلمه –

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে ও শিক্ষা দেয়" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৫০২৭-৫০২৮)।

পবিত্র কুরআনে এরকম অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যেমন-

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন" (আল কুরআন: ০২: ৩১)।

পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াতে এসেছে:

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

"আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন" (আল কুরআন: ২০: ১১৪)।

ইউরোপে যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা অন্যান্য ভাষার মূল হিসেবে গণ্য করা হয়। তেমনি উপমহাদেশের ভাষাসম্ভারে বিশেষত বাংলা ভাষার ভিত্তি হিসেবে সংস্কৃতকে ধরা হয়। বাংলা "শিক্ষা" শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত ধাতু "শাস" থেকে যার অর্থ শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশ দেয়া (মালেক ও অন্যান্য, ২০১২, পৃ. ০২)। আর শিক্ষা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-অভ্যাস, অনুশীলন, চর্চা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্বকরণ, বিদ্যাভ্যাস, অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, উপদেশ, নির্দেশ (বিশ্বাস, ১৯৮৪, পৃ. ৬৩৮)।

আর সংস্কৃত ভাষা বিদ্যা শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'বিদ' থেকে যার অর্থ 'জানা'। বস্তুত জ্ঞান লাভ করা বা জ্ঞাত হওয়া অর্থে 'জানা' বলতে শিক্ষা লাভ বুঝায় (মালেক ও অন্যান্য, ২০১২, পৃ. ০২)।

শিক্ষা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Education. শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে ইংরেজি Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে এসেছে। যার অর্থ to lead out বা to draw out আবার কেউ কেউ বলেছেন Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educere থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যার ভাবার্থ হলো to bring up অথবা to train অথবা to mould। আবার ল্যাটিন শব্দ Educo কে

কেউ কেউ ইংরেজি Education শব্দের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। এখানে E অর্থ out এবং duco অর্থ to lead হিসেবে গণ্য করা হয়েছে (মালেক ও অন্যান্য, ২০১২, পৃ. ০২)।

মূল ল্যাটিন শব্দসমূহের ভিত্তিতে ইংরেজি Education শব্দটির ব্যাপক অর্থ করা যায়। যেমন "কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা"।

সুতরাং সাধারণ অর্থে শিক্ষা বলতে একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য বা যা জানা দরকার তা প্রদান করাই মূলত শিক্ষা।

শিক্ষা এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় শিক্ষাকে মনীষীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

১. ইমাম আল গাযালী (রহ.) বলেন:

كان يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته و بأفعاله في عباده وخلقه –

"আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর নির্দেশনাবলী এবং বান্দা ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভকে ইলম বলা হয়" (আল গাযালী, ১৯৯৩, পৃ. ৪৬)।

২. মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতা বলেন:

العلم هو إدراك الشئ بحقيقته–

"ইলম বা শিক্ষা হল কোন বস্তুকে তার বাস্তব অবস্থার আলোকে অনুধাবন করা"।

৩. নলিনী কান্ডের মতে: "জীবনের ব্যাপারের সহিত মিশিয়া জিনিষকে হাত করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া চালতে চলাতে মনে যেসব সমস্যা, যেসব সমাধান হতে থাকে, মনে যেসব ভাব, যেসব চিন্তা উদয় হয় তাহাদিগকে জীবনের ব্যাপারের উপর ফেলিয়া ফালাইয়া যে নব নব ভাবের, চিন্তার সৃষ্টি হতে থাকে তাহাই শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষার অন্যরূপ হয় না" (গুপ্ত, ১৩০৩ বাং, পৃ. ২)।

৪. প্লেটো বলেছেন: শিক্ষা বলতে শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ ও মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করা বুঝায় (Plato, 1926, p. 65).

৫. দার্শনিক এরিস্টটল বলেছেন: দেহ ও মনের সুপ্ত বিকাশই শিক্ষা (Aristotle, 1946, p. 321-322).

৬. আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানের যুগান্তকারী মতবাদের স্রষ্টা রুশো বলেছেন: জন্ম গ্রহণের সময় মানব শিশু যে জিনিসের অভাববোধ করে এবং পরিপূর্ণ মানুষের পর্যায়ে পৌঁছাতে আমাদের যা দরকার তাই শিক্ষা (Roussesu, 1966, p. 6).

৭. আধুনিক শিক্ষা দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন: আদর্শ চরিত্র বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য এবং এই আদর্শ চরিত্র বিকাশের জন্য তিনি কতিপয় সর্বজনীন গুণ মানুষের মধ্যে বিকাশিত হওয়া বাঞ্চনীয় বলেছেন। গুণগুলো হলো প্রাণশক্তি, সাহস, শৌর্য, সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিজ্ঞান (Russel, 1985, p.40-41). শিক্ষা হল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্যে ইহলোকের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি। আর সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য সুখ লাভ করাই মানুষের শেষ লক্ষ্য।

৮. আল্লামা ইকবালের মতে: মানুষের রূহকে উন্নত করার প্রচেষ্টার নামই শিক্ষা (মাবুদ, ২০১৬, পৃ. ৯)।

৯. World University Encylopedia তে Education এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: In a philosophical sense education in the natural inheritance of every individual. Since he is impreseed and developed for good on evil by all with which he comes in contact, everything he sees, feels, hears and does influencing action and forming tandencies (উদ্দিন, ২০০৫, পৃ. ১৬১).

সাধারণ অর্থে শিক্ষার অর্থ করা যায় অথবা আমরা বলতে পারি, বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষে যেসব কার্য সম্পাদিত হয় যেমন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা যেসব উদ্দেশ্য অর্জিত হয় তাই শিক্ষা। একজন মানুষের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ ও একজন মানুষকে উৎপাদনশীলতা অর্জনে সহায়তা করাকেই শিক্ষা বলা হয়। অতএব, ব্যক্তিকে তার নিজ সম্পর্কে প্রতিবেশী সম্পর্কে এবং পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য শিক্ষার দরকার। তাই কোন দেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সে দেশের বা সমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য প্রতিফলিত হতে হবে।

ইসলামি শিক্ষা

ইসলামি শিক্ষা বলতে মূলত তাওহীদভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়, যতটুকু শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসেবে কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকেও আমরা ইসলাম শিক্ষা বলতে পারি। ইসলাম শিক্ষা মূলত ইসলাম ও শিক্ষা এ দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত। আমরা পূর্বেই ইসলাম ও শিক্ষার আলাদা আলাদা পরিচয় প্রদান করেছি। এখানে একসাথে ইসলাম শিক্ষা কী সেটি উপস্থাপন করব।

সাধারণভাবে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও রাসুল (স) নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থাই হলো ইসলাম শিক্ষা। ইসলাম শিক্ষার পরিচয়ে আমরা বিভিন্ন মত পাই। যেমন- পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون

“আমি মানুষ এবং জীন জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি” (আল কুরআন: ৫১: ৫৬)।

এ আয়াত থেকে আমরা বলতে পারি যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্যই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সেহেতু কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে? কিভাবে করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন তা শিক্ষা করাই ইসলামি শিক্ষা। জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনধারাকে কেবল আল্লাহর দাসত্বের শিক্ষা দেওয়া যায় তাই ইসলাম শিক্ষা। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

“আমি পৃথিবীতে খলিফা প্রেরণ করতে যাচ্ছি” (আল কুরআন: ০২: ৩০)।

এখানে বলা হচ্ছে মানুষকে পৃথিবীতে খলিফার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাই বলা যায় আল্লাহর একজন খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করাই হলো ইসলাম শিক্ষা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, ইসলামি বিধি-বিধান মতে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরীর জন্য যে স্বচ্ছ ও সুস্থ জ্ঞান জানা দরকার তার শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণই হচ্ছে ইসলাম শিক্ষা। যে শিক্ষা আল্লাহর পরিচয়, অধিকার, সৃষ্টিজগৎ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক, মানুষের পরিচয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য, মানুষের কর্মফল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের যোগ্যতা, মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে আদর্শ চরিত্রবান জাতি গড়ে আল্লাহ ও রাসুলের (স) নির্দেশ অনুযায়ী চলার শিক্ষা দেয় তাই ইসলাম শিক্ষা।

ইসলাম শিক্ষা বলতে বুঝতে হবে যে শিক্ষার প্রতিটি বিভাগই কুরআন ও হাদিসভিত্তিক। অর্থাৎ যার কোন একটি দিকও ইসলামি আকিদা বিরোধী নয় এমন শিক্ষার নামই ইসলামি শিক্ষা (খায়ের, ২০০৯, পৃ. ১৮)।

পবিত্র কুরআনে সফলতা লাভের উপায় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“সেই সফল হলো যে নিজেকে পবিত্র করল” (আল কুরআন: ৫১: ০৯)।

এ আয়াত থেকে আমরা বলতে পারি নিজেদের পরিশুদ্ধ করার জন্য যে শিক্ষা বা যে শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ বা পবিত্র করা যায় তাই ইসলাম শিক্ষা ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ

“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য” (আল কুরআন: ০৩: ১১০)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ সত্য ও ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে শিক্ষা মানুষকে মানব সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহসী ভূমিকা পালন করতে শিখায় তাই ইসলাম শিক্ষা।

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন:

إنما بُعثت معلِّمًا

“নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি” (ইবনে মাযাহ, হাদিস নং-২২৯)।

আর সাহাবায়ে কেরাম (রা) তার ছাত্র হিসেবে আল কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান গরিমায় উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। বিশ্বের কাছে নিজেদের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পৃথিবীব্যাপী শান্তির বার্তা পৌছে দেন। যে শিক্ষা দ্বারা রাসুল (স) মুসলিম দার্শনিক, মুসলিম বৈজ্ঞানিক, মুসলিম শাসক, মুসলিম বিচারক, মুসলিম অর্থনীতিবিদ, মুসলিম সেনাপতি, মুসলিম রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি তৈরি করেছিল তাই ইসলামি শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। একটি শিক্ষাব্যবস্থা তখনই শুধু আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে, যখন ঐ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষার্থীর ইমান হবে সুদৃঢ়, চরিত্র হবে সুন্দর, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার ধারণা হবে উন্মুক্ত, সমাজের প্রতি দায়-দায়িত্বের অনুভূতি হবে তীব্র। পরকালে আপন দায়িত্ব পালনের বিষয়ে জবাবদিহিতার ভয় থাকবে অন্তরে সদা জাগ্রত।

ড. আব্দুল ওয়াহিদ বলেন: ইসলামি শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক শিক্ষাদান এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা (ওয়াহিদ, ২০০১, পৃ. ২২)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, যিনি বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের সুখ দুঃখ মিটিয়ে দেয়ার একমাত্র মালিক, তাই তিনি যে শিক্ষা বা হেদায়াত দান করেন তা-ই প্রকৃত পক্ষে মুক্তি লাভের সঠিক পথ আর ঐ শিক্ষাকেই ইসলামি শিক্ষা বলে।

নৈতিকতা

নৈতিকতা শব্দটি নৈতিক শব্দের বিশেষ্য আর নৈতিক শব্দটি নীতি শব্দের বিশেষণ। নীতি হলো ন্যায় অন্যায়, ভালো মন্দের ধারণা (শরীফ ও অন্যান্য, ২০০৭, পৃ. ৩২২)। নীতি ও নৈতিকতা শব্দ দুটিই আপেক্ষিক। কোন নীতি একজনের কাছে গ্রহণযোগ্য তো অন্যজনের কাছে নিন্দনীয়। নৈতিকতা শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো- خلق 'খুলুকুন' এর বহু বচন হলো أخلاق 'আখলাক'। এর শাব্দিক অর্থ স্বভাব, চরিত্র, সচ্চরিত্র, নৈতিকতা, সদাচার, নীতিবোধ ও মানুষের সহজাত স্বভাব ও প্রকৃতি (রহমান, ২০১৭, পৃ. ৩৭৬)।

পবিত্র কুরআনে শব্দটি এসেছে এভাবে:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী" (আল কুরআন: ৬৮: ০৪)।

নৈতিকতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো morality। আর morality শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ moralitas থেকে, যার অর্থ আদব-কায়দা, চরিত্র, ভদ্রতা, সঠিক আচরণ।

আবার ড. শেখ সালমা নার্গিস বলেন, Ethics শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Ethos থেকে এসেছে। এর অর্থ প্রথা (custom) বা প্রচলিত রীতিনীতি (নার্গিস, ২০১৫, পৃ. ১৮)।

Oxford advanced learners dictionary তে বলা হয়েছে, নৈতিকতা হলো ভুল ও শুদ্ধ অথবা ভালো ও মন্দ আচরণ সম্পর্কিত নীতিমালা (Wehmeier, 2003-2004, p. 861).

নৈতিকতার পারিভাষিক সংজ্ঞা

নৈতিকতার পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনীষীগণ বিভিন্ন মন্তব্য করেন। যেমন-

আল মু'জামুল ওয়াসিত প্রণেতা বলেন:

"الخلق: حال للنفس راسخة تصدر عنها الافعال من خير أو شر من غير حاجة الى فكر وروية"

"চরিত্র হচ্ছে মানবাত্মার সুদৃঢ় অবস্থা যেখান থেকে অনায়াসে কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ভালো কিংবা মন্দ কাজ প্রকাশিত হয়" (ইব্রাহীম উনাইস, ১৯৭২, পৃ. ২৫২)।

প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক আল জাহিয বলেন:

الخلق: هو حال النفس بها يفعل الانسان افعاله بلا روية ولااختيار الخلق قد يكون فى بعض الناس غريزة وطبعا، وفى بعضهم لا يكون الا بالرياضة والاجتهاد

"নৈতিকতা হলো আত্মার এমন এক অবস্থা যা দ্বারা মানুষ কোনরূপ চিন্তা গবেষণা ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় ছাড়াই কাজ করতে পারে। কোন কোন মানুষের মধ্যে নৈতিকতা থাকে স্বভাবজাত, আর কারো মধ্যে তা চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সৃষ্টি হয়না" (আল-জাহিয, ১৯৯২, পৃ. ১০)।

মাওলানা আব্দুর রহিম (রহ.) বলেন: যে কাজ বিবেক সম্মত, নৈতিকতা মানুষকে সে কাজে অনুপ্রাণিত করে ও খারাপ কাজ সম্পর্কে সতর্ক করে। সদা জাগ্রত বিবেকের এ শাসনই হচ্ছে নৈতিকতা (রহিম, ২০০৪, পৃ. ২৭০)।

ইমাম আল গাযালি (রহ.) বলেন: নৈতিকতার ভিত্তি হলো তিনটি: কামশক্তি, ক্রোধশক্তি ও জ্ঞানশক্তির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সকল প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতি থেকে বেঁচে থাকা এবং বৈধ পন্থায় উপার্জন করা আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ না করা (আল গাযালী, ২০০৫, পৃ. ১৪)।

সমাজে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কর্মকাণ্ডগুলোই নৈতিকতা। নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের অভ্যন্তরীণ রূপ। যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। সমাজের কাছে মানুষ নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে। মানুষ নৈতিক আচরণ যেমন করে তেমনি মানুষের দ্বারাই অনৈতিক আচরণ প্রকাশ পায়। নৈতিকতা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর নিভর্রশীল হলেও মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মকান্ডের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। কিশোর বয়স হচ্ছে নৈতিক চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম সময়।

নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিকোণ

সৃষ্টির সূচনা থেকেই নৈতিকতা প্রত্যয়টি ব্যবহার হয়ে আসছে। পৃথিবীর এক এক যুগের মানুষের কাছে নৈতিকতার বিষয়টি একেক ধরনের। নৈতিকতা সম্পর্কে ইসলাম সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পেশ করেছে।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ (স) বলেছেন:

أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি উদার হও এবং তাদের চরিত্রকে সুন্দর কর" (ইবনে মাযাহ: হাদীস নং -৩৬৭১)। কেননা চরিত্র হচ্ছে মানুষের অমূল্য সম্পদ। নবি (স) আরো বলেন:

إن من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً

"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আমার নিকট প্রিয় যার নৈতিকতা সর্বোৎকৃষ্ট" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৩৪৮৮)। নৈতিকতার উৎস হলো পবিত্র কুরআন। আল কুরআনের বক্তব্যসমূহ ৩টি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

ক. আকীদাহ সংক্রান্ত বিষয় ।
খ. আখলাক/নৈতিকতা সংক্রান্ত বিষয়।
গ. আহকাম সংক্রান্ত বিষয়।

নৈতিকতার সূত্রপাত হয় হযরত আদম (আ) থেকে। হযরত আদম (আ) কে মহান আল্লাহ জান্নাতেই নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছিলেন। যেমন-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ

"হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং যেখানে যা ইচ্ছা খাও কিন্তু এই গাছের নিকটে যেওনা, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (আল কুরআন: ০২: ৩৫)। এ আয়াত থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় কোন কাজটি ভালো, কোনটি মন্দ সেটি আল্লাহ জান্নাতেই শিক্ষা দিয়েছেন। আর হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) পযর্ন্ত নবীগণ (আ) নৈতিকতার শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যেমন- আমাদের নবি মুহাম্মদ (স) বলেছেন:

انما بعثت لأْتمم حسن الاخلاق –

"আমি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি" (বুখারী: আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং: ১১৯)

সর্বোত্তম নৈতিকতার উদাহরণ হচ্ছেন স্বয়ং নবি (স)। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ (স) এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (আল কুরআন: ৩৩: ২১)। মহানবি (স) এর চরিত্র বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন: **خلقه القران** "কুরআনই তার চরিত্র"।

ইসলামে নৈতিকতা হচ্ছে মানব চরিত্রের এমন এক উন্নত অবস্থা যা তার মধ্যে চিন্তার ব্যাপকতা, পরকালের বিশ্বাস, অন্তরের উদারতা ও জীবনের প্রশস্ততাকে অনিবার্য করে তোলে। আর এগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত জরুরি। জীবন সংগ্রামে নৈতিকতার প্রয়োজন অত্যধিক, যেন অতীতের সকল ব্যর্থতা ও হতাশাকে মুছে দিয়ে ভবিষ্যৎ সাজানোর পরিকল্পনা করে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হতে পারে।

নৈতিক শিক্ষার পরিচয়

নৈতিক শিক্ষা হলো নীতি সম্বন্ধনীয় শিক্ষা। এটি আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় খুবই আবশ্যিক একটি বিষয়। নৈতিক শিক্ষা শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Moral Education. এটিকে শিক্ষাবিদ মুজিবুর রহমান ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

Moral- নৈতিক, ন্যায়নীতি, নীতিবিষয়,
Morality- নৈতিকতা, সদাচারণ, নীতিধর্ম,
Moralistic- নীতিবাদী, নীতিকুশলী,
Moralist- নীতিবিদ, নীতিবিশারদ,
Moralize- হিতোপদেশ দেয়া (রহমান, ২০১১, পৃ. ১৬১)।

আর Education শব্দের অর্থ শিক্ষা, লালন পালন, শাসন করা ইত্যাদি।

নৈতিক শিক্ষা হলো ন্যায়নীতির শিক্ষা বা নীতিবাক্যের লালন পালন করা বা নীতিবিষয়ের পরিচর্যা করা বা নীতিঘটিত বিষয়ের বিদ্যার্জন।

সুতরাং যে শিক্ষার মাধ্যমে শুধু মানুষের ন্যায়নীতি বা নীতি বিষয়ের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয় তাই নৈতিক শিক্ষা।

Venkataiah ব্যাপক অর্থে নৈতিক শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, নৈতিক শিক্ষা বলতে শুধু নীতি ও আদর্শের চর্চা বুঝায় না। আধ্যাত্মিক, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক এবং মূল্যবোধ চর্চা ও বুঝায় (Venkataiah, 1998, p.1-4,)

গবেষক Sarangi নৈতিক শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে:

Moral education is the education which constitute the palmed sequereces of experiences and activities coming under the existing school curriculum for the social, emotional and philosophical development of the child with a view to preparing him as a better citizen of the nation and the world (Sarangi, 1994, P. 169).

নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশু ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে। নৈতিক শিক্ষা সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে, সুনাগরিক তৈরী করে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সৃজনশীলতা ও দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানব কল্যাণের জন্য এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থার নাম হলো ইসলাম শিক্ষা। ইসলাম শিক্ষা হলো সর্বজনীন। রাসুল (স)-এর যুগ থেকেই মানব কল্যাণের এক বিরাট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। তাই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে বলা যায়:

১. ইসলামি সংস্কৃতির কাঠামোতে শিক্ষার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য হচ্ছে নবিদের দায়িত্বের অনুরূপ লোকদের ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তাদেরকে এ দ্বীনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদেরকে পূর্ণ বিকশিত জীবনের জন্য তৈরী করা (আহমদ, ২০০৮, পৃ. ১৩)।

২. ইসলামি শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য লোক তৈরী করা। মানুষ আল্লাহর খলিফা। খেলাফতের এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা দরকার সে জন্য জ্ঞান অর্জনই হবে মূল লক্ষ্য। কেননা মহান আল্লাহ বলেন:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً

“নিশ্চয় আমি জমিনে খলিফা/প্রতিনিধি প্রেরণ করেছি” (আল কুরআন: ০২: ৩০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

“তিনি উম্মিদের (নিরক্ষরদের) মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত” (আল কুরআন: ৬২: ০২)। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি অর্জনের জন্য সমন্বিত চেষ্টা সাধনার যোগ্যতা অর্জন করে জীবনের পূর্ণতা অর্জন করা এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করাই ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব কল্যাণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

৩. স্রষ্টার প্রতি, পিতামাতার প্রতি ও নিজের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও দায়িত্ববান হওয়াই ইসলামি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সামষ্টিক জীবনধারাকে আল কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মোতাবেক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করা।

৪. সৃষ্টি জগতের সকল সৃষ্টি, বস্তু, প্রাণী,পদার্থ, প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহার পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। নৈতিকতাবোধ ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি করা এবং ইসলামি আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা করা। রাসুলুল্লাহ (স) এর আদর্শকে জীবনে প্রতিফলিত করা। বিশ্বে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় নতুন নতুন সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন ও হাদিসের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি করা। ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা হলো সর্বজনীন। ডিগ্রি অর্জন মুখ্য নয় বরং ব্যবহারিক জীবনের মান উন্নয়নই হলো ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য। ইসলামি শিক্ষার লক্ষ্য থাকবে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

৫. নৈতিকমান সম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ

“তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, রুকুকারী এবং সিজদাহকারী। তারা সৎ কাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজে বাধা দানকারী তারা আল্লাহর (আইনের) সীমা রক্ষাকারী। এ সকল মু’মিনদের আপনি সুসংবাদ দিন” (আল কুরআন: ০৯: ১১২)

মহান আল্লাহর ঘোষিত এ সকল গুণ অর্জন করা ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলাই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার লক্ষ্য। মানুষের মধ্যে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ভাবে এমন উন্নত চেতনাবোধ ও আচরণ সৃষ্টিকরা যে শক্তি বলে মানুষ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মূলোৎপাঠন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো আদম সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলা। যে শিক্ষা মানুষকে সৎ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে, পরোপকারী, কল্যাণকামী ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হতে সাহায্য করে সে শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। ইসলামি শিক্ষার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মানবকল্যাণ, ত্যাগ ও বিনয়। ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে তাই তাদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়ায় কোন ক্ষতি সাধিত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

“আল্লাহর দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে” (আল কুরআন: ৩৫: ২৮)

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً

“আর যাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করা হয়েছে তাঁকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে” (আল কুরআন: ০২: ২৬৯)।

উপরোক্ত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে মহান আল্লাহর সৃষ্ট এই দুনিয়ায় তাঁকে ভয় করে তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলার জন্য ইসলামি শিক্ষা অপরিহার্য। আর দুনিয়ায় প্রভূত কল্যাণ লাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায় হলো ইসলামি জ্ঞান ও হিকমত অর্জন করা। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلم –

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য” (সুনানে ইবনে মাজাহ (প্রথম খন্ড), হাদীস নং-২২৪)।

দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য ইসলামি শিক্ষার প্রয়োজন। যেমন- রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين –

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং- ৬৯)।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن صدقة جارية اوعلم ينتفع له اوولد صالح يدعوله–

“মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। যথা- সাদাকা, নেক সন্তান এবং এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়” (সহীহ মুসলীম, হাদিস নং- ৩০৮৪)।

জ্ঞান অন্বেষণ ও বিতরণ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) হতে হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন:

خيركم من تعلم القران وعلمه –

“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ সে যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে” (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৪৮৬৭)।

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن –

“সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের চেয়ে অধিকতর ভাল কোন কিছুই পিতা তার সন্তানকে উপহার হিসেবে দিতে পারে না” (আত তিরমিযী, হাদিস নং- ১৮৭৫)।

নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

ان من احبكم الى واقربكم متى مجسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا –

“তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সর্বোত্তম কিয়ামতের দিন সে হবে আমার প্রিয়পাত্র এবং তোমাদের মধ্যে তার আসন হবে আমার অধিক নিকটবর্তী” (আত তিরমিযি, হাদিস নং-২৯০৬)।

নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে নবি (স) বলেছেন:

ما من شى اثقل فى ميزان المومن يوم القيامة من حسن الخلق –

“কিয়ামতের দিন কোন বান্দার সৎ স্বভাবকে দাঁড়ির এক পাল্লায় স্থাপন করে অন্য সমুদয় আমল অপর পাল্লায় স্থাপন করলে সৎ স্বভাবই অধিক ভারী হবে” (আত তিরমিযি, হাদিস নং-২০০৩)।

ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যেখানে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মানবিক, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার

জন্য ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা জরুরি। এটি আমরা পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহী থেকেই বুঝতে পারি। পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ প্রথম আয়াতই হলো:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন” (আল কুরআন: ৯৬: ০১)।

জ্ঞান হলো ঈর্ষণীয় বস্তু। আর এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন:

لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وِيُعَلِّمُهَا

“দুটি বিষয় ছাড়া ঈর্ষা করা বৈধ নয়। যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন, আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন যা দ্বারা সে মীমাংসা করে এবং শিক্ষা দেয়” (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭৩)। উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহ থেকে বুঝা যায় ইসলামে জ্ঞান অর্জন, জ্ঞান বিতরণ ও সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য হবে। পার্থিব জীবনে উত্তমভাবে জীবন যাপন করা এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করাই হলো একজন মু'মিনের আসল কাজ। আর এ কাজে সব সময় আল্লাহর সাহায্য সাথে থাকে। নৈতিকতা জ্ঞান ছাড়া শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে ড. শেখ সালমা নার্গিস, আমিনুল ইসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা পারমাণবিক বোমা তৈরী করা হয়। সেই বোমা দ্বারা নিরীহ মানুষ হত্যা করা বাঞ্চনীয় কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর পদার্থ বিজ্ঞান দিতে পারে না, সেই উত্তরের জন্য আমাদের মুখোমুখি হতে হয় নৈতিকতা প্রশ্নটির (নার্গিস, ২০১৫, পৃ. ২৭)।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

রাসুল (স) তাঁর সাথিদের একই সাথে আত্মিক, মানবিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি বরং সমন্বয় করেছেন। সবগুলোর সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছেন। মূলত জীবনের সকল দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান উপলদ্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনা বিকশিত করতে পারলেই মানুষ আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। রাসুল (স) তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একদল সত্যপন্থি, আদর্শ সোনার মানুষ তৈরী করেছিলেন। এ শিক্ষা কেবল বৈষয়িক দিক থেকেই যোগ্য করেনা, বরং পরকালীন সাফল্যও এনে দেয়। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভের ফরিয়াদ

মহান আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ দান করো এবং পরকালের কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের বাচাঁও” (আল কুরআন: ০২: ২০১)

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা

ইসলামি শিক্ষার সূচনা হয়েছে জান্নাতেই মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে। মহান আল্লাহ আদম (আ) কে সৃষ্টি করে বলেন:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنْ الظَّالِمِينَ

“আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও কিন্তু এই গাছের নিকটেও যেওনা গেলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে” (আল কুরআন: ০২: ৩৫)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ আদম (আ) কে কোনটি করবে? কোনটি করতে পারবে না তার শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ আদম হাওয়া (আ) এর পক্ষে কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এতে। এখান থেকে বুঝা যায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার সূচনা জান্নাত থেকেই হয়েছে।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ

ইসলামি শিক্ষার প্রথম শিক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। আর প্রথম ছাত্র হলেন হযরত আদম (আ)। এরপর হযরত আদম (আ) এর যোগ্য উত্তরসূরী নবি ও রাসুলগণ।

হযরত আদম (আ) এর সময় থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য নবি ও রাসুলগণের প্রতি আসমানী গ্রন্থ সহিফা ও কিতাব অবতীর্ণের মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা পরিচালিত হয়েছে (ওয়াহিদ, ২০০১, পৃ. ৪৮)। পবিত্র কুরআনে এরকম ২৫ জন নবি ও রাসুলের নাম উল্লেখ রয়েছে। হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে শুরু হয়ে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে। নবি রাসুলগণ শুধু শিক্ষালাভ করেই বসে থাকেননি তারা ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন মহান আল্লাহর নির্দেশে। নবি (আ) গণের শিক্ষাব্যবস্থার ধারা অব্যাহত থাকে খুলাফায়ে রাশেদার যুগ, উমাইয়া যুগ, আব্বাসীয় যুগ অতিক্রম করে আমাদের নিকট পৌছেছে। আমরা এখানে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা উপস্থাপন করব।

হিযরতের পূর্বে মক্কার শিক্ষাব্যবস্থা

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে নবি ও রাসুলগণের আনীত শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণতা লাভ করে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর নবুয়ত প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। হযরত মুহাম্মদ (স) যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন মক্কায় কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই মহানবি (স) মক্কায় পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দিতে লাগলেন ব্যক্তি পর্যায়ে। “সেই সময়ে রাসুলুল্লাহ (স) এর পবিত্র সত্তাই ছিল চলমান শিক্ষাকেন্দ্র” (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৮১)। আর যারা মহানবি (স) এর দাওয়াত গ্রহণ করতেন তারা তার নিকট শিক্ষার্জন করে অন্যদের এ বিষয়ে শিক্ষাদানে কর্মরত থাকতেন। “নবি (স) ব্যক্তিগতভাবে হজ মওসুমে এবং সময় ও সুযোগমতো মানুষকে কুরআন শোনাতেন” (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৬৮)। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কিছু সদস্য চুপিসারে কুরআনের শিক্ষা লাভ করতেন। রাসুলুল্লাহ (স) ছাড়াও আবু বকর সিদ্দীক (রা), খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন শিক্ষক (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৮১)। রাসুলুল্লাহ (স) ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মহান আল্লাহর ঐশী বাণী ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতেন।

মসজিদে আবু বকর (রা): প্রথম তা’লীমী মাদ্রাসা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কার কুরাইশ কাফিররা নব দীক্ষিত মুসলমানদের নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন শুরু করলে অন্য দশজন মুসলিমের মতো হযরত আবু বকর (রা)ও হাবশায় হিজরতের জন্য বের হন। তখন "আল কারা" গোত্রের নেতা ইবনুদ দাগিনা হযরত আবু বকর (রা) কে হিজরত না করার জন্য অনুরোধ করেন এবং কাফিরদের থেকে নিরাপত্তা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে হযরত আবু বকর (রা) নিজ বাড়ির সম্মুখে একটি নামাজের জায়গা নির্বাচন করেন। সেখানে তিনি উম্মুক্তভাবে নামাজ পড়তেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন যা দেখা এবং শোনার জন্য কুরাইশ গোত্রের নারী-পুরুষ, একত্রিত হতো। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) এর এ উদ্যোগকে মক্কার কাফিররা সুনজরে দেখেননি। ফলে তারা আবু বকর (রা) এর উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে যাতে তিনি এ উদ্যোগ বাতিল করেন। কিন্তু আবু বকর (রা) অল্প কয়েকদিন বন্ধ রাখলেও পুনরায় বাড়ির সামনে মসজিদ তৈরী করে সালাত আদায় করেন ও কুরআন তিলাওয়াত অব্যাহত রাখেন। মসজিদে আবু বকর-এ যেমন কোন মু'আল্লিম ও ক্বারী ছিলেন না তেমনি সেখানে কোন শিক্ষার্থীও ছিল না (মাবুদ, **২০১৫**, পৃ. ১৮৪)। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উপ-আনুষ্ঠানিক তা'লীমী মাদ্রাসা। ড. মো. আব্দুস সাত্তার বলেন, "কুরআন পাঠের জন্য এটিই ছিল প্রথম মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে কাফির মুশরিকদের ছেলে মেয়েরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতো" (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৪২)।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের (রা) শিক্ষাকেন্দ্র

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা) ছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের বোন। ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির অনুসারী। তারা দু'জন নিজ গৃহে খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) এর নিকট কুরআন পড়া শিখতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা) এর একটি উক্তি সীরাতে ইবনে হিশামে এসেছে এভাবে:

وعندها خبَّاب بْنُ الْأَرَتِّ مَعَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا طَهَ يقريها إِيَّاهَا

"তাঁদের দু'জনের নিকট খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) ছিলেন। তাঁর নিকট একটি সহীফা (পুস্তিকা) ছিল যেখানে সূরা ত্বহা লিখিত ছিল এবং তিনি তাঁদের দু'জনকে তা পাঠ করাচ্ছিলেন" (ইবনে হিশাম, তা.বি, পৃ. ৩৪৪)। ড. আব্দুল মাবুদ বলেন, "ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের গৃহটি কুরআন শিক্ষার কেন্দ্র এবং শিক্ষালয় বলা যেতে পারে। কারণ এখানে কমপক্ষে দু'জন শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক ছিলেন" (মাবুদ, **২০১৫**, পৃ. ১৮৫)। এতে করে ফাতিমা বিনতে খাত্তাবের (রা) বাড়িটি ইসলামি শিক্ষার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা যায়।

দারুল আরকাম মাদরাসা

হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা) ছিলেন প্রথম সারির ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের একজন। তাঁর বাড়ি ছিল মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। রাসুল (স) নবদীক্ষিত মুসলমানদের দ্বীনের প্রয়োজনীয় তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রা) এর বাড়িতে প্রথম আনুষ্ঠানিক

ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গোড়াপত্তন করেন। এ মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (স)। এখানকার উল্লেখযোগ্য কৃর্তি শিক্ষার্থী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা), হযরত আলী ইবনে আবি তালিবসহ (রা) প্রথম শ্রেণির সাহাবীবৃন্দ (ইবনে হিশাম, তা.বি, পৃ. ২৪৪)। নবুয়তের পঞ্চম বছর মক্কার বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেন। যারা মক্কায় থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা সেখানকার কাফির মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার হন। নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে মহানবি (স) সাহাবীদের নিয়ে দারুল আরকামে আশ্রয় নেন (মিয়া, ২০০৪, পৃ. ২২২)।

ড. আব্দুল মাবুদ ইবনে সা'দের তাবাকাত ও আল হাকিমের আল মুসতাদরিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন-

كان النبى صلى الله عليه وسلم يسكن فيها فى اول الاسلام فيها يدعوا الناس الى الاسلام فاسلم فيها قوم كثير–

“রাসুলুল্লাহ (স) ইসলামের সূচনা পর্বে এই গৃহে অবস্থান করতেন এবং মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। আর এখানে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন” (মাবুদ, **২০১৫**, পৃ. ১৮৬)।

এ মাদরাসার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হযরত ওমর (রা) এ মাদরাসাতেই রাসুল (স) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে মুসলিমগণ প্রকাশ্যে কাবা'র চত্ত্বরে সালাত আদায় শুরু করেন। সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা প্রথম দিকে এ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা নিয়েছেন পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেই এখানে তালিম প্রদানের জন্য মহানবি (স) কর্তৃক মনোনীত হন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রা), ইবনে উম্মে মাকতুম (রা), জাফর ইবনে আবি তালিব (রা) (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৪৩-৪৪)।

এই দারুল আরকামে একাধারে প্রায় একমাস রাসুলুল্লাহ (স) অবস্থান করে গোপনে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত ও দ্বীনী তালীম দিতে থাকেন (মাবুদ, **২০১৫**, পৃ. ১৮৬)। বর্তমানে এটি দারুল খায়যুরান নামে পরিচিত। কাবার বিপরীত পাশে একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হিজরতের পূর্বে মদিনার শিক্ষাব্যবস্থা

মক্কার ভূমি ছিল পাথুরে, আবহাওয়া ছিল রুক্ষ, চতুর্দিকে পাহাড় পর্বতে ঢাকা ছিল পুরো শহর। তাই রুক্ষ আবহাওয়ায় এখানকার অধিবাসীদের মন মেজাজও ছিল রুক্ষ। তাদের দুর্বল বিবেক তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণকেই প্রাধান্য দিত। বংশীয় অহমিকা ও জাত্যভিমান তাদের অন্ধ করে রেখেছিল। এই শহরে ইসলাম কবুলকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দুর্বল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তাই দুর্বল মুসলিমরা মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের সম্মুখীন হতো বেশি। পক্ষান্তরে ইয়াসরিব (মদিনা) ছিল সবুজ বনানি বেষ্টিত নির্মল আবহাওয়ার উর্বর ভূমি। এখানকার অধিবাসীরাও ছিল কোমল স্বভাবের ও নির্মল হৃদয়ের অধিকারী। আর এখানে প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। নবুয়তের দশম বছর হজ মৌসুমে মদিনার খাজরাজ গোত্রের ৬ (ছয়) জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা মদিনায় ফিরে গিয়ে নিজেদের গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। পরবর্তী বছর তাঁরাসহ মোট **১২** জন মক্কার অদূরে আকাবা নামক স্থানে মহানবী (স) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। একে ইসলামের ইতিহাসে আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়।

আকাবা শপথের পর ইয়াসরিবের (মদিনা) নও মুসলিমদের মধ্যে ইসলামি শিক্ষা তথা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতুম ও মুসয়াব ইবনে উমাইর (রা) নামক দু'জন সাহাবীকে মু'আল্লিম

হিসেবে প্রেরণ করার মাধ্যমে মূলত ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামি শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশ ব্যাপক ভূমিকা রাখে (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ১৬)।

রাসুলুল্লাহ (স) মদিনায় হিজরতের পূর্বে মদিনায় তিনটি উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছিল। যেগুলোতে নিয়ম মাফিক দ্বীনি তা'লীম দেওয়া হতো। তা হলোঃ

মসজিদ-ই-বনি যুরাইক মাদরাসা

রাসুলুল্লাহ (স) এর হিজরতের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম মসজিদ ও তা'লীমী মাদরাসা হলো মসজিদ-ই-বনি যুরাইক মাদরাসা। এটি মদিনা নগরীর প্রাণকেন্দ্র 'কাল্ব' নামক স্থানে মসজিদ-ই-বনি যুরাইক মাদরাসা নামে পরিচিত ছিল। এখানকার মুয়াল্লিম ও ইমাম ছিলেন আকাবার প্রথম শপথে ইসলাম গ্রহণকারী বিশিষ্ট আনসার সাহাবী হযরত রাফি ইবনে মালিক জারকী আল আনসারী (রা)। মদিনায় এ মসজিদেই প্রথম নামাজ ও কুরআন পড়া শুরু হয় (আকরাম খাঁ, ১৯৮৭, পৃ. ৪৫১)। ড. হুসাইন হায়কাল বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বনু যুরাইক শাখার অন্তর্ভুক্ত (হায়কাল, ১৯৯৮, পৃ. ২৮১)।

মসজিদে কুবা মাদরাসা

রাসুলুল্লাহ (স) এর হিজরতের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় মাদরাসা হলো মসজিদে কুবা মাদরাসা। এটি মদিনা থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে অবস্থিত। হিজরতের সময় রাসুল (স) এখানে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। আকাবার শপথের পর ইসলাম গ্রহণকারী দুর্বল মুসলিমরা হিজরত করে এখানে আসেন। এখানে অবস্থানরত মুহাজিরদের মধ্যে সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা (রা) ছিলেন কুরআনের সবচেয়ে বড় আলিম। তিনি এই মসজিদে কুবাতে তা'লীম দিতেন ও ইমামতি করতেন (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৯০)। একদিন রাসুল (স) তার কুরআন পড়া শুনে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি (স) বলেন, আল্লাহর শুকরিয়া যে আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে সালিমের মত আলিম ও ক্বারী তৈরী করেছেন। মহানবী (স) সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন তোমরা কুরআন পড়া শিখ চারজনের নিকট হতে। উক্ত চারজন হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালিম মাওলা আবী হুযায়ফা, উবাই ইবনে কা'ব ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৩৫৩১)। মূলত কুবা মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই ছিলেন মুহাজির এবং তাদের সাথে স্থানীয় কিছু মুসলিমও কুরআন শিখতেন।

মাদরাসা-ই-নাকী' আল খাদিমাত

রাসুলুল্লাহ (স) এর হিজরতের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোর মধ্যে তৃতীয় মাদরাসাটি হলো মাদরাসা-ই-নাকী-আল খাদিমাত। এটি মদিনার কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় এক মাইল উত্তরে আসআদ ইবন যূরারার (রা) গৃহে প্রতিষ্ঠিত হয় (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৯২)। এ শিক্ষালয়টি অবস্থানগত দিক দিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় হওয়ার সাথে সাথে ব্যাপকতা ও কল্যাণকামীতার দিক থেকে অন্য দুটি শিক্ষালয় থেকে ছিল ভিন্নধর্মী ও উন্নতমানের (মাবুদ, ২০১৫, পৃ. ১৯৩)। এ শিক্ষালয়ের মুয়াল্লিম ও ইমাম ছিলেন মুসআব ইবনে উমাইর (রা)। তিনি রাসুল (স) কর্তৃক মদিনাবাসীদের কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষাদানের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর ইমামতিতে এখানে প্রথম জুমআর সালাত আদায় করা হয় এবং এখানে প্রায় ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন। মুসআব (রা) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ইসলামি শিক্ষা প্রদান করে মদিনায় ইসলামের প্রসার করতে

থাকেন। তাই মহানবী (স) কর্তৃক তিনি “মুয়াল্লিমুন মশহুর” (বিখ্যাত শিক্ষক) উপাধিতে ভূষিত হন (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ৪৮)। নাকী আল খাদিমাত কেবল শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না, হিজরতের পূর্বে মদিনায় এটি ইসলামের কেন্দ্র ছিল। উল্লেখ্য এ তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও সেই সময়ে মদিনা মুনাওয়ারায় বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে শিক্ষার আসর চালু ছিল। বিশেষত বনু নাজ্জার, বনু আবদিল আশহাল, বনু জুফার, বনু আমর ইবনে আওফ, বনু সালিমসহ বিভিন্ন গোত্রের মসজিদে এই শিক্ষা মজলিসের ব্যবস্থা ছিল (মাবুদ, ২০১৫, পৃ-১৯৭)।

এ শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা ছিলো না। রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা সব সময় পাঠদানের ব্যবস্থা ছিলো। যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় পাঠ গ্রহণ করতে পারতেন। এখানে রাসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশনা অনুসারে কুরআনের তালীম দেওয়া হতো ও দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হত। এভাবে মদিনায় রাসুলুল্লাহ (স) এর আগমনের পূর্বেই মদিনায় ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার জাগরণ সৃষ্টি হয়।

মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী গামীমের তালীমী মাদরাসা

রাসুলুল্লাহ (স) এর পবিত্র সত্তাটিই ছিল ইসলামি শিক্ষার একটি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাকেন্দ্র। রাসুল (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী গামীম নামক স্থানে পৌছলে বুরাইদা ইবনে হাসিব আল আসলামী (রা) রাসুল (স) এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার সাথে আশি ঘরের মানুষের একটি দল ছিল বলে ইবনে সা’দ উল্লেখ করেন। অত:পর তাঁরা সবাই রাসুলুল্লাহ (স) এর সাথে ইশার সালাত আদায় করেন। এখানে রাসুল (স) তাদের সারারাত সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কিছু আয়াত তালীম দেন (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ১৯৯)। এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় রাসুল (স) এর সফরকালীন সময়েও কুরআনের তালীম অব্যাহত ছিল।

রাসুলুল্লাহ (স) এর হিজরতের পর মদিনার শিক্ষাব্যবস্থা

রাসুলুল্লাহ (স) এর মদিনায় হিজরতের ২ বছর পূর্বেই কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, “মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হিজরতকালীন আনুমানিক পাচঁশতাধিক নারী-পুরুষ ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন” (হামিদুল্লাহ, ২০০১, পৃ. ৩৭)। ফলে রাসুল (স) এর মদিনায় হিজরতের পরেই মসজিদে নববী নির্মিত হয়। আর মদিনার ছোট বড় সকল শিক্ষাকেন্দ্র মসজিদে নববীর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়।

প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র মসজিদে নববী

রাসুল (স) এর মদিনা হিজরতের পর নির্মিত মসজিদে নববী হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদরাসা। মসজিদে নববীর সাথেই ছিলো মহানবি (স) এর আবাসন ব্যবস্থা। ফলে মহানবি (স) মদিনার অনুকূল পরিবেশে দিনরাত অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত ও নওমুসলিমদের ইসলাম শিক্ষা দিতে থাকেন। এ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান ছিলেন স্বয়ং মহানবি (স)। তাছাড়া আবু বকর (রা), উবাই ইবনে কা’ব (রা), উবাদা ইবনে আস সামিত (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম ও এই শিক্ষালয়ের মুক্বরী ও মুআল্লিম ছিলেন (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ১৬৯)। এই মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কিরাম সব সময় মহানবি (স) এর সান্নিধ্যে থাকার বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে অবস্থান করতেন। এ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের স্ত্রী

সন্তান ও পরিবার পরিজনদের দ্বীনের তালিম দিতেন। এখানে প্রায় সকলস্তরের শিক্ষার্থী ছিলো আনসার, মুহাজির, স্থানীয়, বহিরাগত, মর্যাদাবান, অভিজাত গোত্রীয় নেতা, রাজা-বাদশাহ, জ্ঞানী, মুর্খ, শহুরে, মরুচারী বেদুঈন, আরবী, আজমী, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু সকলে বসতেন (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ২০৯)।

রাসুল (স) সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেন। তিনি এমনভাবে তাকাতেন যে সবাই মনে করতেন যে নবি (স) আমাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি সকলের অবস্থা ও পরিবেশ বুঝে তা'লীম দিতেন।

রাসুল (স) এর শিক্ষার্থীদের মধ্যে একদল শিক্ষার্থী ছিল দুর্বল হতদরিদ্র। যাদের থাকার কোন জায়গা ছিল না। রাসুল (স) তাদের মসজিদে নববীর একপাশে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এদের কাজ ছিলো সারা দিন রাত জ্ঞান চর্চা, যিকির-আযকার ইত্যাদি। এরা সবসময় মহানবি (স) এর সান্নিধ্য পেতেন। এদের বলা হতো আসহাবে সুফফা। আসহাবে সুফফার পানাহারের ব্যবস্থা করতেন স্বয়ং নবি (স) ও মদিনার স্বচ্ছল আনসার সাহাবীগণ। "সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা) ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য। তিনি ছিলেন আসহাবে সুফফার মুখপাত্র। তিনি তাদের পানাহারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করতেন" (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ২১০)। হযরত আবু হুরায়রা (রা) এর বর্ণনা মতে, আসহাবে সুফফার শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৭০ জন যারা সর্বদা শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতেন (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ২০৫)। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, অধিকাংশ সময় আমরা ষাট (৬০) জনের মত মানুষ রাসুলুল্লাহ (স) এর মজলিসে থাকতাম। অনেক সময় এ সংখ্যা বেড়ে যেতো। বিশেষ করে বহিরাগত শিক্ষার্থী দলের আগমনে সংখ্যা বেড়ে যেত। বুজায়লা প্রতিনিধি দলে ১৫০ জন, নাখা প্রতিনিধি দলে ২০০ জন এবং মুযায়না প্রতিনিধি দলে ৪০০ জন সদস্য ছিলেন (মাবুদ, **২০১৫,** পৃ. ২০৫)।

এভাবে বিভিন্ন প্রতিনিধি দলে বিভিন্ন সংখ্যক ছিলো। মাঝে মাঝে রাসুল (স) এর মজলিসে এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী উপস্থিত হতেন যে অনেকে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আবার অনেককে ফিরে যেতে হতো। দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবি (স) তাঁদের উদ্দেশ্যে মনোমুগ্ধকর বক্তব্য পেশ করতেন। সাহাবায়ে কিরামগণের সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিলো রাসুল (স) কে দেখা। তিনি (স) ও তাদের দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাতেন। এ সময় একটি আয়াত নাযিল হয়:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

"আপনি সেই সব লোকদের সাথে থাকুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের রবকে স্মরণ করে, তারা তাদের রবের সন্তুষ্টি কামনা করে" (আল কুরআন: ১৮: ২৮)।

মদিনার এ শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যসূচি ছিল আল কুরআন। রাসুল (স) আল কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে সামাজিক ন্যায়নীতি, অর্থনৈতিক লেনদেনের নিয়ম-কানুন, উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, তাহযীব-তমাদ্দুন ইত্যাদি শিক্ষা দিতেন। রাসুল (স) সাহাবীদের ভাষা শিক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা) ফার্সি, হিব্রু, হাবশী ও রোমান ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে রাসুল (স) এর সেক্রেটারীও বলা হয়। ঐতিহাসিকগণ এ শিক্ষাকেন্দ্রকে "জনশিক্ষা কেন্দ্র" হিসেবেও আখ্যায়িত করেন। কারণ এখানে মদিনার আনসার, মুহাজির এবং তাদের সন্তানদের যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা দেয়া হতো

তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামরিক শিক্ষাসহ নৈতিক চরিত্রগঠন এবং ঐশী বাণী লিপিবদ্ধ ও কুরআন হিফযের শিক্ষা দেয়া হতো (উদ্দীন, ২০০৫, পৃ. ৪৫)।

এ শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাকেন্দ্রের ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। পি.কে. হিট্টি ঐতিহাসিক ডিউস এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন: কুরআন একখানি গ্রন্থ যার সাহায্যে আরবগণ মহান আলেকজান্ডারের চেয়ে বিশালতর, রোমের চেয়ে ব্যাপকতর রাজ্য অধিকারভুক্ত করেছিল, তারা দশ বছরে যা সম্পাদন করেছিল, রোমের তা একশ বছর সময় লেগেছিল। কেবল এই গ্রন্থের সাহায্যেই সমগ্র সেমিটিক জাতির মধ্যে তারাই নৃপতি হিসেবে ইউরোপে এসেছিল যখন ফিনিসিয়ান বণিক হিসাবে ইহুদীগণ উদ্বাস্তু বন্দি হিসেবে এসেছিল (হিট্টি, ১৯৯৯, পৃ. ১৩)।

বস্তুত রাসুল (স) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে যে জাতি গড়ে উঠেছিল তারা পরবর্তীতে বিশ্বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর তার বিস্তার হয়েছিল ইসলামের প্রথম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাত মসজিদ নববী শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই। ফলে মদিনার ঘরে ঘরে দ্বীনের চর্চা থেকে শুরু করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায় ইসলামের সুমহান শিক্ষা।

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৬৩২ খ্রি.-৬৬১ খ্রি)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) এর নির্দেশিত পথ যথাযথভাবে অনুসরণ করেন খুলাফায়ে রাশেদীন। খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে বহু সংখ্যক যোগ্য মানুষের প্রয়োজন দেখা দেয় ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য। তাই তাঁরা রাসুল (স) এর রেখে যাওয়া পদ্ধতিতে আরো সংযোজন করে ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষাকে আরো বেগবান করেন। রাসুল (স) খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেন, "খিলাফত ত্রিশ বছর থাকবে। এরপর মুলুকিয়াতের অধীনে মুসলিম বিশ্ব শাসিত হবে"।

তাই খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিস্তৃতি ছিল ৬৩২ খ্রি. থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত। খুলাফায়ে রাশেদীনের চার জন খলিফা-ই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা হলেন:

ক. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) (৬৩২-৬৩৪খ্রি.)
খ. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) (৬৩৪- ৬৪৪খ্রি.)
গ. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) (৬৪৪-৬৫৬খ্রি.)
ঘ. হযরত আলী ইবন আবি তালিব (রা) (৬৫৬- ৬৬১খ্রি.)

খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় ইসলামি সাম্রাজ্য বিশ্বের অর্ধেক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইসলামি শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। খুলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলিফা-ই ছিলেন রাসুল (স) এর নিজ হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্যতম। এ চারজন খলিফা-ই ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ পণ্ডিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ছিলেন প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর অকৃত্রিম বন্ধু ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবীদের অন্যতম। রাসুল (স) এর ইন্তেকালের পর ৬৩২ খ্রি. তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মনোনীত হন। তিনি মাত্র ২৭ মাস খিলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী ইসলামের খিলাফত পরিচালনা করেন। যদিও তাঁর খিলাফতের সময় খুবই স্বল্প

আর এই সময়ে নানা ধরনের কঠিন পরিস্থিতি তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়। বিশেষ করে ভণ্ড নবিদের উদ্ভব, যাকাত অস্বীকারকারী ও স্বধর্ম ত্যাগী বা মুরতাদদের উৎপাত বেড়ে যাওয়া তাঁকে এ কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় বিচক্ষণতার সাথে। এছাড়া ইসলামি শিক্ষার বিকাশেও তাঁর অবদান কম নয়। রাসুল (স) এর যুগে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ হলেও তা একসাথে গ্রন্থাবদ্ধ বা সংকলন করা হয়নি। তা ছিল বিচ্ছিন্নভাবে গাছের ঢাল, চামড়া, হাড়, পাথর ইত্যাদিতে লিখিত। আর যেসব সাহাবীদের (রা) পুরো কুরআন মুখস্ত ছিল এমন ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলে হযরত উমর (রা) এর পরামর্শে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন আবু বকর (রা)। আর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেন রাসুল (স) এর সেক্রেটারী খ্যাত প্রখ্যাত ওহী লেখক হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা) এর নেতৃত্বে গঠিত একটি শক্তিশালী ওহী লেখক কমিটির উপর। এ কমিটি বহু পরিশ্রম ও সাধনার পর পবিত্র কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করে খলিফা আবু বকর (রা) এর নিকট হস্তান্তর করেন। ইসলামি শিক্ষার বিকাশে এটি ছিল আবু বকর (রা) এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এছাড়া আবু বকর (রা) রাসুলুল্লাহ (স) এর মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার আরও প্রসার করেন। পবিত্র কুরআন ও দ্বীনিশিক্ষা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৫৭)।
হযরত আবু বকর (রা)-ই প্রথম বায়তুলমাল থেকে সকল শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদের ভাতা প্রদান করেন। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্যও তিনি বায়তুলমাল থেকে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ

হযরত ওমর (রা) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) ইন্তেকালের পর ইসলামি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১০ বছর ইসলামি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথম খলিফা আবু বকর (রা) এর মতো আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর আমলে ইসলামি খিলাফত বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। রাজ্য বিস্তার ছাড়াও ওমর (রা) শাসনব্যবস্থায় নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তাঁর আমলে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, পুলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করেছিলেন। জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধি-বিধান রচনা ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর শাসনামলে বিশ্বের যেখানেই ইসলামের বাণী পৌছেছে সেখানেই তিনি ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। শিক্ষা বিস্তারে হযরত ওমর (রা) অসংখ্য মসজিদ ও বিদ্যালয় স্থাপন করেন। খলিফা ওমর (রা) এর শাসনামলেই শুধু আরবে ৪০০০ (চার হাজার) মসজিদ গড়ে ওঠে (উদ্দীন, ২০১৭, পৃ. ৮১)। তিনি বিজিত এলাকার সবগুলো মসজিদে কুরআন মজিদের দারস প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এ জন্য তিনি মুতাওয়াল্লী ও ক্বারী নিযুক্ত করে তাদের জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করে দেন। তিনি আরব ও আজমে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বাইতুলমাল থেকে বহু অর্থ ব্যয় করেন (কামাল, ২০০৪, পৃ. ২৬)। তিনি যাযাবর বেদুঈনদের জন্য কুরআন মজিদের তালীম বাধ্যতামূলক করেন। লোকেরা যাতে সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক ইরাব সহকারে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে পারেন সেজন্য তিনি আরবী সাহিত্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে বাধ্যতামূলক করে ফরমান জারী করেন (আলী, ১৯৭৬, পৃ. ১৬৫)।

ওমর (রা) এর শাসনামলের বিশাল সাম্রাজ্যের সকল স্থানে শিক্ষার আলো পৌছে যায়। তিনি শিশু শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিশুদের পাঠদানের সাথে সাথে লিখন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এ ছাড়া সাতার, তীর-বর্শা নিক্ষেপ ও ঘোড়া দৌড় শিক্ষাদানেরও নির্দেশ জারি করেন।

হযরত উসমান (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের তৃতীয় খলিফা। তিনি ৬৪৪ খ্রি. দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর শাহাদাত বরণের পর ইসলামি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ১২ বছর তিনি দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো তিনিও আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (স) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁর খিলাফত কালে ইসলাম প্রায় পৃথিবীর অর্ধেক অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ছিল। আরব, অনারবসহ বিভিন্ন ভাষার মানুষ। তাই অনারব অঞ্চলসমূহ ও কিছু কিছু আরব অঞ্চলে কুরআন তিলাওয়াতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা) এর আমলে সংকলিত পবিত্র কুরআনের কপিটি নিয়ে যায়েদ বিন সাবিত (রা) নেতৃত্বে এক ক্বিরাতের/তিলাওয়াতের কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। সাম্রাজ্যের সকল বড় বড় শহরগুলোতে এক কপি করে পাঠিয়ে দেন। আর বাকী সব পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন যাতে চিরদিন মুসলমানগণ এক রিওয়াতের কুরআন মজিদ পাঠ করতে পারেন। এভাবে তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করেন ও বনী ইসরাঈলীদের মতো কিতাব বিকৃতির হাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করেন। তাই হযরত উসমান (রা) কে “জামিউল কুরআন” বলা হয়। এছাড়া তিনি কুরআনিক শিক্ষার বিস্তারে পূর্বসূরীদের অনুসরণে তাঁর সাম্রাজ্যের অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। কুরআন-হাদিসের জ্ঞানে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন করেন (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৫৯)।

তিনি মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা প্রভৃতি স্থানে কুরআনের দারস দানের জন্য নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেন এবং এসব শিক্ষাকেন্দ্রে যথেষ্ট সংখ্যক সাহাবীদের শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত করেন। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সাম্রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো। আর এ সব অনুষ্ঠানে আরবের দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা দলে দলে অংশগ্রহণ করতেন এবং সেখানে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক অতি সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা দেয়া হতো (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৫৯)। উসমান (রা) খিলাফতকালে কুরআন মজিদ ছাড়া আরো যেসব বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো তা হলো গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, কাব্যচর্চা, ভূগোল ইত্যাদি (বারী, ২০১১, পৃ. ৩৪৮)।

হযরত আলী (রা) এর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ

হযরত আলী (রা) ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা। তিনি ৬৫৬ খ্রি. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) এর শাহাদাত বরণের পর ইসলামি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৬৫৬ খ্রি. থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় ৬ (ছয়) বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর শাসনামল গৃহবিবাদে পূর্ণ থাকলেও ইসলামি শিক্ষার বিকাশে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। রাসুল (স) তার সম্পর্কে বলেন:

“আমি হলাম জ্ঞানের নগরী আর আলী হলো তার দরজা” (রফিক, ২০১৩, পৃ. ১৯০)।

ধর্মীয় জটিল ব্যাপারগুলোতে হযরত ওমর (রা) আলী (রা) এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে সাব্যস্ত করতেন। তাই আলী (রা) এর শাসনামলে জ্ঞানের চর্চা আরো বেশি হয়। তিনিই প্রথম বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আরবী ব্যাকরণ প্রণয়নে সচেষ্ট হন। তাঁর শাসনামলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অনারব লোকগণ আরবী ব্যাকরণ না জানার কারণে কুরআন তিলাওয়াতে ভুল করতে শুরু করলে তার শিষ্য আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (রহ.) কে আরবী ব্যাকরণের নীতিমালা সংকলন করার নির্দেশ দেন। তিনি মদিনার মসজিদে দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, হাদিস, ইতিহাস, আরবী ব্যাকরণ, কাব্য এবং ইতিহাসের উপর সাপ্তাহিক বক্তৃতা প্রদান করতেন (আলমগীর, ২০০৬, পৃ. ২৩)। পরবর্তীতে আলী (রা) খিলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে কুফায় স্থানান্তর করেন। কারণ এখানে এক হাজারের অধিক সাহাবী বাস করতেন। যাদের মধ্যে বদরি সাহাবীও ছিলো ২৪ জন। এ সকল সম্মানীয় সাহাবীর অবস্থানের কারণে কুফা জ্ঞানের শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

হযরত আলী (রা) নিজে ছিলেন একজন উঁচু স্তরের কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্য সংকলন দিওয়ানে আলী (রা) সাহিত্য প্রেমিদের কাছে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। মদিনায় কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বসরা ও কুফায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি ইসলামি আইন, আরবী ব্যাকরণ, আরবী ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, হস্তলিপি, আবৃত্তি ও কাব্য চর্চায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৬০)। শিক্ষার ব্যাপারে আলী (রা) কিছু উক্তি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন-

ক. বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভালো।
খ. বই জ্ঞানীর উদ্যান বিশেষ।
গ. বিত্তকে তুমি পাহারা দাও, বিদ্যা তোমাকে পাহারা দেয়।
ঘ. অজ্ঞানতা মানুষের ঘৃণ্য শত্রু।
ঙ. বিত্তের চেয়ে শিক্ষা মানব জীবনের অলংকার স্বরূপ।
চ. বিত্তের চেয়ে শিক্ষায় পারদর্শী মানুষ সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৬০)।

পরিশেষে বলা যায়, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষার পরিধি বৃদ্ধি পায়। রাসুল (স) এর প্রায় লক্ষাধিক সাহাবী (রা) এর মধ্যে মাত্র দশ হাজারের কাছাকাছি সাহাবার কবর পাওয়া যায় মক্কা ও মদিনায়। বাকীরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর বাণী ও রাসুল (স) এর হাদিস পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিতে। কেননা নবি (স) বলেছেন: "তোমরা আমার একটি আয়াত হলেও পৌছিয়ে দাও" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৩২৭৪)।

তাই সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) মহানবি (স) এর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ ছড়িয়ে দিতে দেশ-বিদেশ সফর করেন। এতে তাদের কোন ক্লান্তি ছিল না।

১. মদিনায় হযরত আয়েশা (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আবু হুরায়রা (রা), যায়দ বিন সাবিত (রা)।
২. মক্কায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)।
৩. কুফায় হযরত আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), আনাস ইবনে মালিক (রা)।
৪. বসরায় আবু মুসা আল আশয়ারী (রা)।
৫. সিরিয়ায় আবু সাঈদ খুদরী (রা)।

৬. মিসরে আবু দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবী শিক্ষাদানে নিজেদের উৎসর্গ করেন (আলমগীর, ২০০৬, পৃ. ২৩)।

উমাইয়া যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৬৬১-৭৫০ খ্রি.)

খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা) এর শাহাদাতের মাধ্যমে ৬৬১ খ্রি. ইসলামি খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর ইসলামি সাম্রাজ্যের খিলাফত গ্রহণ করেন হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)। তিনি ছিলেন কুরাইশদের বিখ্যাত উমাইয়া বংশের। উমাইয়াগণ (৬৬১খ্রি.-৭৫০খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় ৯০ বছর ইসলামি সাম্রাজ্য শাসন করেন। এ সময়ে মোট ১৪ জন উমাইয়া শাসক খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলেও এদের মধ্যে যোগ্য খলিফা ছিলেন মাত্র কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা), আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এবং তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও পঞ্চম খলিফা খ্যাত হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ।

উমাইয়াদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রাজ্য বিস্তার প্রাধান্য পেলেও তাদের শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে পবিত্র কুরআনের তাফসীর (ব্যাখ্যা), হাদিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যহত ছিল (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ৬১)। খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও খলিফা ওয়ালিদ (প্রথম) ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় শাসক প্রতিনিধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ নিজেই প্রথম জীবনে একজন মক্তব শিক্ষক ছিলেন। উমাইয়া আমলে শিক্ষাব্যবস্থার দুটো রূপ পাওয়া যায়।

১. খলিফা ও অভিজাত শ্রেণির ছেলে মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা।

২. সাধারণ লোকদের সন্তান-সন্তুতিদের শিক্ষাব্যবস্থা।

খলিফা ও অভিজাত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো মূলত গৃহভিত্তিক। পিতা ও গৃহশিক্ষক পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিকে সন্তানদের লেখাপড়ার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করতেন। এ পাঠ্যক্রমের বিশেষ দৃষ্টি ছিল উচ্চ মর্যাদাবান সাহসিকতাপূর্ণ ও রণকৌশলে নিপুণ শাসক তৈরী করা। জনসাধারণের ছেলে মেয়েরা মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে লেখাপড়া করত (আলমগীর, ২০০৬, পৃ. ২৬)।

সে যুগে মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, দামিস্ক ও মিশর প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। ৫ম উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান দামেস্কে একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৯০ খ্রি, তিনি একটি বিরাট রাজকীয় গ্রন্থাগারও স্থাপন করেন। সেখানে সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের লেখা মূল্যবান গ্রন্থাবলি সংগৃহীত হয়। এ সময় খলিফা আব্দুল মালিক আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করেন। ফলে পুরো সাম্রাজ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। উমাইয়াদের ৬ষ্ঠ খলিফা ওয়ালিদ (প্রথম) এর রাজত্বে শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি সাম্রাজ্যের বহু স্কুল ও মাদরাসা নির্মাণ করেন।

তাঁরই পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পবিত্র কুরআনে নুকতা ও হরকত সংযোজন করে কুরআন শিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। কারণ এর পূর্বে পবিত্র কুরআনে কোন নুকতা ও হরকত না থাকায়

অনারবদের কুরআন পঠন-পাঠনে সমস্যা দেখা দিত। উমাইয়াদের ৮ম খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন প্রজাবৎসল, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি মুসলিম জাহানের খিলাফত লাভ করেই ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। তিনি-ই প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের নির্দেশ দেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের নির্দেশ দেন যে, রাসুলুল্লাহ (স) এর হাদিসের প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দাও এবং সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু করো (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৬৩)।

রাসুল (স) এর যুগ থেকে ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এর শাসনের আগ পর্যন্ত শিক্ষকতাকে কেউ জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। মুয়াল্লিমগণ কোন না কোন পেশায় নিয়োজিত থেকে কুরআন, হাদিস ও দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের তালীম দিতেন। কিন্তু খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ.) একটি ফরমান জারি করেন যে, যারা পার্থিব সম্পর্ক বর্জন করে হাদীস ও ফিকহ এর চর্চা এবং গবেষণার জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন, আর্থিক সাহায্য হিসেবে বাইতুলমাল থেকে তাদের মাসিক একশত দীনার দেওয়া হবে (রফিক, ২০১৩, পৃ. ১৯৪)। ফলে মেধাবী ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ দুনিয়া বিমুখ হয়ে পুরোপুরি দ্বীনের জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এর আরো একটি কীর্তি হলো তিনি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের আরো একটি নির্দেশনা দেন এরকম যে, প্রশাসকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় মসজিদসমূহে নিজের এবং আলিমদের দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার ঘটাবেন। কেননা আলোচনা ছাড়া রাসুলুল্লাহ (স) এর বাণী বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৬৩)।

উমাইয়া শাসকগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে আহমদ সর্বপ্রথম “কিতাবুল আইন” নামক একটি আরবি অভিধান প্রণয়ন করেন। তাঁর শিষ্য সিবাওয়াই “আল কিতাব” নামে প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখেন। যেটি এখনো পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধ। এ যুগে হাসান বসরী (রহ.) (৭২৪খ্রি.), ইবনে শিহাব আল যুহরী (৭৪২খ্রি.), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আমির ইবনে সারাইন আনসারী প্রমুখ উলামাগণ কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের চর্চা করে আরবের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করেন। হাসান আল বসরী বসরায় একটি ধর্ম-দর্শন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এছাড়া ইমাম হুসাইন (রা) এর পৌত্র জাফর আল সাদিকও এ যুগের একজন বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ছিলেন।

খলিফা প্রথম ইয়াজিদের পুত্র খালিদ গ্রিক ও কপটিক ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ, চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক এবং ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলীর আরবী অনুবাদ করেন। উমাইয়া খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সে যুগে মুসলমানদের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। এ সময়ই চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থাদি আরবিতে অনুবাদের রাজকীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। চিকিৎসক মাসার যাওয়াহ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালির চিকিৎসা গ্রন্থ আরবিতে অনুবাদ করেন (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৬৬)।

আব্বাসীয় যুগে ইসলামি শিক্ষার বিকাশ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ হিসেবে প্রসিদ্ধ আব্বাসীয় শাসনামলে শুরু হয় ইসলামি শিক্ষার তৃতীয় যুগ। আবুল আব্বাস আস-সাফফার হাত ধরেই ৭৫০ খ্রি. উমাইয়া খিলাফতের অবসানের পর আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজবংশ প্রায় (৭৫০-১২৫৮) খ্রি. পর্যন্ত ৫০৮ বছর ইসলামি খিলাফতের

অধিকারী ছিলেন। এ সময় ৩৭ জন আব্বাসীয় শাসক খিলাফত পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন শাসক। বাকী শাসকগণ নিজেদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতার পরিচয় দেন। তারা ছিলেন নামে মাত্র খলিফা। ফলে খিলাফত ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। প্রথমেই তাঁদের শক্তি খর্ব করে তাঁদের নিজেদের সেনাবাহিনী। আব্বাসীয় যুগের শিক্ষাব্যবস্থা উমাইয়া যুগের শিক্ষাব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। এ সময় খলিফাগণ তাঁদের সামরিক বিজয়াভিজানের পরিবর্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বেশি আত্মনিয়োগ করেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আমলেই মূলত ইসলামি শিক্ষা একটি সিস্টেম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর জ্ঞানচর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি, কৃষ্টি, সভ্যতার যে বীজ বপন করেন তা তাঁর উত্তরসূরী হারুন-উর-রশীদের দ্বারা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে মামুনের রাজত্বে সুস্বাদু ও সুবৃহৎ মহীরূহে পরিণত হয় (উদ্দীন, ২০১৭, পৃ. ৮৫)। আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ই প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ ও মাযহাবী ইমামদের আবির্ভাব ঘটে। চার মাযহাবের চার ইমাম হলেন:

ক. ইমাম আযাম আবু হানীফা নোমান ইবনে সাবিত (রহ.) (৬৯৮-৭৩৮ খ্রি.)।
খ. ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) (৭১১-৭৯৫ খ্রি.)।
গ. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহ.) (৭৬৭-৮২০ খ্রি.)।
ঘ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) (৭৮০-৮৫৭ খ্রি.)।

আর এসব মনীষীর পরপরই আবির্ভূত হন হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার ইমামগণ। যারা হাদিস শাস্ত্রের অধ্যয়নে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলামি শিক্ষায় এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। হাদিস শাস্ত্রের ছয়জন ইমাম হলেন:

ক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (রহ.) (৮১০-৮৭০খ্রি.)।
খ. ইমাম মুসলিম (রহ.) (৮১৭-৮৬৫খ্রি.)।
গ. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) (৮১৭-৮৮৮খ্রি.)।
ঘ. ইমাম তিরমিযি (রহ.) (৮২৪-৮৮৬খ্রি.)।
ঙ. ইমাম নাসাঈ (রহ.) (৮৩০-৯১৫খ্রি.)।
চ. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.) (৮২৪-৮৮৬খ্রি.) (রহীম, ২০১৯, পৃ. ৪৪)।

এছাড়া আব্বাসীয় যুগে আরো যেসকল মনীষীদের আবির্ভাব হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: চিকিৎসাবিদদের মধ্যে আলী আল রাযী, ইবনে সিনা প্রমুখ। দার্শনিকদের মধ্যে আল কিন্দী, আল ফারাবী, ইমাম আল গাযালী, আবুল আ'লা আল-মায়াররী, আবু হায়্যান আত তাওহীদ, আল রাওয়ানদি প্রমুখ। জ্যোতির্বিদ আবুল আব্বাস আহমদ আল ফারগানি, আল-বাত্তানি, আল বিরুনী, উমর আল খাইয়াম। গণিতবিদ আল খাওয়ারিজমী, রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, প্রাণীবিজ্ঞানী আল জাহির, ভূগোলবিদ ইয়াকূত, ঐতিহাসিক আত তাবারী, আল-মাসউদী প্রমুখ।

উমাইয়া শাসনামল থেকে শিক্ষালয় হিসেবে মসজিদ, খানকাহ বা কারো অব্যবহৃত বাসগৃহ বা গৃহের চত্ত্বরকে নির্বাচন করা হতো। তারই ধারাবাহিকতায় আব্বাসীয় যুগেও শিক্ষালয় হিসেবে এসব জায়গা ব্যবহৃত হতো। এছাড়া উলামায়ে কিরামের সাধারণ বাসগৃহ, বিদ্যোৎসাহী ধনীক শ্রেণি, সরকারী কর্মকর্তাদের গৃহ চত্ত্বর প্রভৃতি ছিল মাদরাসার শ্রেণিকক্ষ। আব্বাসীয় আমলে মদিনা,কুফা, বসরাসহ বিভিন্ন

স্থান জ্ঞান চর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। এর মধ্যে কুফায় ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) এর মাদরাসা ও মদিনায় ইমাম মালিক (রহ.) এর মাদরাসা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মাদরাসায় সুদূর আফগানিস্তান, দামিশক, সিরিয়া ও হিমস শহরসহ বিভিন্ন স্থান থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ভীড় জমাতো। আর ইমাম মালিক (রহ.) এর মাদরাসায় একদিকে মদিনা থেকে বুখারা সমরকন্দ পর্যন্ত অন্যদিকে তিউনিসিয়া থেকে শুরু করে কায়রো ও স্পেনের কর্ডোভা থেকে শিক্ষার্থীরা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সমবেত হতো (সাত্তার, ২০০৪, পৃ. ৭৩)। আব্বাসীয় আমলে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে ইলমে দ্বীনের গতানুগতিক শিক্ষাধারায় পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মসজিদ, খানকাহ বা কারো অব্যবহৃত বাসগৃহের চত্ত্বর ইত্যাদিতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মাদরাসা শিক্ষার ভৌত উন্নয়নের জন্য সে যুগে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ১৯)।

একই সাথে মাদ্‌রাসার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে স্থায়ী করণার্থে মাদ্‌রাসা শিক্ষার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন-

ক. আব্বাসীয় যুগে ইসলামি শিক্ষাধারায় কিছু নতুন পদ্ধতির সংযোজন ঘটে। যদিও সে যুগে মসজিদসমূহে শিক্ষা-দীক্ষার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তথাপি ইসলামি শিক্ষার গুণগত ও পরিবেশগত মান উন্নয়নের জন্য মাদ্‌রাসা ভবন নির্মাণের নিয়ম চালু হয়।

খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য পৃথক আবাসিক ভবন তৈরী করা হয়।

গ. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের দায়িত্ব ও যোগ্যতা অনুসারে তাদের বেতন-ভাতা ও পাঠদানের স্তর বিন্যাস করা হয়।

ঘ. ছাত্রদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা নিয়মিত করা হয়। শিক্ষার উপকরণসহ তাদের থাকা-খাওয়ার সাথে পোশাক-পরিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হয় (আলী, ১৯৯২, পৃ. ২৮)।

আব্বাসীয় আমলে ইসলামি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিবেশের উন্নয়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এ ক্ষেত্রে তাদের বিদ্যোৎসাহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

ক. মাদরাসা নির্মাণ ও মাদ্‌রাসার জন্য অনুদান দিতে পারা সে যুগে ধর্মপরায়ণতার একটি নিদশর্নরূপে প্রকাশ পায়। ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণ পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে মাদ্‌রাসা এবং ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। সাথে সাথে মাদ্‌রাসা নির্মাণ করাকে পার্থিব সম্মান ও মর্যাদার বিষয়রূপে গণ্য হয়। যার ফলে আমীর-উমরা এবং অভিজাত শ্রেণির লোকেরা মাদ্‌রাসা ভবন নির্মাণে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ৬৭)।

খ. আমীর-উমরা ও ধার্মিক মুসলমান ও অভিজাত শ্রেণির অনুদানের ফলে বিশিষ্ট আলিম ও শিক্ষকগণ সচ্ছলতার সাথে অধ্যাপনা করার সুযোগ পান। শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি লাভ করে নিশ্চিন্তে দ্বীনি জ্ঞানার্জনের জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

গ. বিভিন্ন মাযহাবের পৃথক পৃথক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ. মুসলিম সাম্রাজ্যের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিতে অধ্যাপনা পেশাটি যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়েছিল। ফলে শিক্ষিত শাসক শ্রেণির লোকেরা নিজেদের সীমাহীন ব্যস্ততা সত্ত্বেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য কিছুটা সময় হলেও ব্যয় করেন। তাঁরা নির্দ্বিধায় ইলমের দারসে বসে যেতেন অথবা নিজে দারসের আয়োজন করে সাধারণ লোকদের পাঠদানের সুযোগ করে দিতেন।

৬. আব্বাসীয় আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় রচনা ও সংকলন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। শিক্ষকগণ নিজেদের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠদান করতেন। সে সময় পাঠ্যসূচি ও প্রবর্তন করা হয়। প্রতিটি বিষয়ের যে সকল গ্রন্থ বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য সেগুলোই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।

মূলত আব্বাসীয় যুগে শিক্ষার মান অনুসারে প্রথম শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়। এতে সাধারণজ্ঞান স্থান পায়। এ সময় শিক্ষাধারাকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করা হয়।

যথা: ১. প্রাথমিক ২. মাধ্যমিক ৩. উচ্চ শিক্ষা (আলী ও আরা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০)।

১. প্রাথমিক স্তর

প্রাথমিক স্তরে অক্ষরজ্ঞান, লিখন, পঠন ও পর্যায়ক্রমে ব্যাকরণ, হাদিস, প্রাথমিক গণিত, কিছু ভাবমূলক কবিতা প্রভৃতি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ যুগের প্রাথমিক শিক্ষায় মুখস্তের উপর বেশি জোর দেয়া হতো।

২. মাধ্যমিক স্তর

মাধ্যমিক স্তরের মাদ্‌রাসাসমূহে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক পড়ানো হতো। এ স্তরে বুঝে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হতো।

৩. উচ্চশিক্ষা স্তর

উচ্চশিক্ষা স্তরে নির্দিষ্ট কোন পাঠ্যসূচি ছিল না। তবে কুরআনের তাফসীর, হাদিসের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা, আইন বা ফিকহ শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ছন্দ ও সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ানো হতো। তবে এ ক্ষেত্রে অধ্যাপকের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হত (আলী ও আরা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০)।

আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র

জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় যুগে ইসলামি শিক্ষানুরাগী খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠে অসংখ্য মাদ্‌রাসা ও ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র। যেমন-

ক. মাদরাসা-ই বায়হাকিয়া: এটি আব্বাসীয় যুগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে উঠা সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিখ্যাত নিযামিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই এ মাদ্‌রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এটি নিশাপুরের বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাওলানা সুলাইমান নদভী তার "খিয়াম" পুস্তকে নিশাপুরে প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসাসমূহের মধ্যে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। এ মাদরাসাটি ইমাম আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে বুরাক (মৃ-৪০৬ হি.) এর জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (আলী ও আরা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০)।

খ. মাদ্‌রাসা-ই নিযামিয়া: আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো মাদ্‌রাসা-ই নিযামিয়া। এটি সেলজুক সুলতান আলফে আরসালান এবং মালিক শাহ এর প্রধানমন্ত্রী নিযামুল মুলক আত তুসী'র প্রচেষ্ঠায় গড়ে উঠে। তাঁর প্রকৃত নাম খাজা হাসান। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। তিনি ৪৫৭হি./১০৬৫ খ্রি.বাগদাদে এ মাদ্‌রাসা নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং ১০৬৭ খ্রি. এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ৪৫৯হি./১০৬৭খ্রি. ১০ যিলক্বদ শনিবার খুব ঝাঁকজমকের সাথে এ মাদ্‌রাসার উদ্বোধন করা হয়। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় প্রায় দু'লক্ষ দীনার। এ মাদ্‌রাসার প্রধান ছিলেন আল্লামা আবু ইসহাক সিরাজী। এ মাদ্‌রাসার উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীরা হলেন- ইমাম আবু হামীদ গাযালী, ইমাম তাবারী,

ইবনুল খাতীব তাবরীযী, বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.), আবুল হাসান ফকীহ প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক হিসেবে যাদের নাম জানা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আবু হামিদ গাযালী, আবুল মুয়ালী, কুতুবুদ্দীন শাফেয়ী প্রমুখ। এখানে শিক্ষকদের উচ্চহারে বেতন দেয়া হতো এবং সমাজে তাদের মর্যাদা ছিলো সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক যুগের আলিমদের কাছে নিযামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার চেয়ে গৌরবের কিছুই ছিলো না।

এ মাদ্রাসায় বিভিন্ন বিভাগ ছিল। শ্রেণি অনুসারে প্রতি বিভাগে প্রায় ৬ হাজার ছাত্র ছিল। এখানে উচ্চবিত্ত ও সাধারণ লোকের সন্তানেরা পাশাপাশি বসে শিক্ষা গ্রহণ করতো। ছাত্রদের কোন প্রকার বেতন দিতে হতো না। বরং গরিব নিঃস্ব শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হতো। নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল ব্যক্তির নিকট একটি মডেল মাদ্রাসা হিসেবে সমাদৃত ছিল (সাত্তার, ২০০৪,পৃ. ৮২)। নিযামিয়া মাদ্রাসার অধীনে একটি বড় পাঠাগার ছিল যা সরাসরি নিযামুল মুলকের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত পাঠাগারের দায়িত্বে ছিলেন তদানীন্তন যুগের বিখ্যাত আলিমগণ। যেমন-

১. আল্লামা যাকারিয়া তাবরিযী
২. কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল ইসফাহানী
৩. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আবিওয়াফী
৪. ইয়াহিয়া ইবনে আলী
৫. আলী ইবনে আহমদ আল-বিকরী প্রমুখ।

মুসলিম বিশ্বে দরস-ই নিযামীয়া নামে যে পাঠ্যসূচি প্রচলিত আছে তা এই মাদ্রাসার পাঠ্যসূচির পরিমার্জিত রূপ।

গ. মাদ্রাসা আল মুনতাসিরিয়াঃ আব্বাসীয় খলিফা আল মুনতাসিরিয়া ৮৬১খ্রি. দজলা নদীর তীরে একটি বৃহদাকার মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। খলিফার নামানুসারে এই মাদ্রাসার নামকরণ করা হয় মাদ্রাসা আল মুনতাসিরিয়া। মাদরাসা ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মাণে দীর্ঘ ছয় বছর সময় ব্যয় হয়। এ মাদ্রাসায় সকল মাযহাবের আলেমদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মাদ্রাসা খোলার সাথে সাথে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এখানে শিক্ষকদের উচ্চহারে বেতন দেয়া হতো এবং ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, কাগজ-কলম ইত্যাদি মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেয়া হতো। আব্বাসীয় আমলে দীর্ঘদিন কালের সাক্ষী হিসেবে এ মাদরাসা বিদ্যমান ছিল।

ঘ. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আব্বাসীয় যুগে ফাতেমীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা আল-মুইযের সেনাপতি জওহর ৯৭২খ্রি. মিশরের কায়রোতে আল আযহার মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে বিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। মুসলিম জাহানের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞান পিপাসুরা একত্র হতেন। এখানে ইলমুল কুরআন, ইলমুল হাদিস, আইন শাস্ত্র, ব্যাকরণ, গণিত, অলংকার শাস্ত্র, কাব্য ও তর্কশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হতো। এখানে শিক্ষকরা কোন বেতন নিতেন না। আর শিক্ষার্থীদেরও কোন প্রকার বেতন দিতে হতো না। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ইবনুল হাইসাম (৯৬৫-১০৩৯ খ্রি.), আব্দুল লতিফ আল বাগদাদী ও আবু ইয়াকুব কাযী আল খন্দক এ

প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত শিক্ষক ছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত সারাবিশ্বে এটি জ্ঞানদ্বীপ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ঙ. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ আব্বাসীয় সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে গিয়ে উমাইয়াগণ স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপ যখন জ্ঞানের দীনতায় ভুগছিল তখন সেখানে মুসলমানরা জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়েছিলেন। স্পেনে উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে ৭৮৮ খ্রি. কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন ও ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো হতো। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশের কারণে কর্ডোভাকে "পণ্ডিতপ্রসূ" বলা হতো। এটি ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও মুসলিম স্পেনে বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

চ. বায়তুল হিকমাঃ আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদ ইরাকের বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র খলিফা আল মামুন এটি সমৃদ্ধ করেন। এটি ছিল একাধারে গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনুবাদ কেন্দ্র। এখানে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা ও ভূগোলসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ আল-খাওয়ারিযমী ছিলেন এর গ্রন্থাগারিক। আব্বাসীয় যুগে আরো যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিলো তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ

ক. আবু ইসহাক ইসফাহানীর মাদ্‌রাসা।
খ. আল মুস্তানসিরিয়া মাদ্‌রাসা।
গ. মাদ্‌রাসা-ই সাইয়্যেদিয়া।
ঘ. মাদ্‌রাসা-ই আবু বকর আল ফাওয়ারেক।
ঙ. তুগরীল বেগের মাদ্‌রাসা।
চ. নুরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.) এর মাদ্‌রাসা ইত্যাদি।

এছাড়াও আব্বাসীয় আমলে নিযামিয়া মাদ্‌রাসার আদলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে অসংখ্য মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। আমীর-উমরা, অভিজাত শ্রেণিসহ সকলেই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য এক প্রকার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তাই মুসলিম শাসনামলে আব্বাসীয় আমলকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

শিক্ষাকে সর্বজনীন করার জন্য খিলাফতের সর্বত্র ইসলামি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আব্বাসীয় খলিফাগণ সাম্রাজ্যব্যাপী অসংখ্য মসজিদ, মকতব, স্কুল ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধনী গরিব সকল শ্রেণির মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উম্মুক্ত ছিল। খলিফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদ কলেজ, খলিফা মুনতাসির প্রতিষ্ঠিত মুস্তানসিরীয়া মাদ্‌রাসা ও নিযামুল মুলকের নিযামিয়া মাদ্‌রাসা তৎকালীন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর অন্যতম ছিল। ঐসব মাদ্‌রাসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে শত শত ছাত্রের সমাগম হতো (ইসলাম, ২০১৩, পৃ. ৮১)।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

৩য় অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি জনবহুল দেশ। এর রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। যার আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। ভূমির আয়তন অনুসারে বিশ্বের ৯৫ তম দেশ। বাংলাদেশ অসংখ্য নদ-নদীবেষ্টিত নিম্ন উচ্চতার ব-দ্বীপ এলাকা। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ২০°.৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°.৩৮′ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°.০১′ থেকে ৯২°.৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। বাংলাদেশের ৩ দিক ভারত দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয় প্রদেশ। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম প্রদেশ। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আর দক্ষিণ পূর্ব কোণে মায়ানমারের কিয়দাংশ।

নামকরণ

মুসলিমরাই সর্বপ্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে “বাঙালা” নামে অভিহিত করেন। বাংলার আদি নাম ছিল “বঙ্গ” (করিম, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা. ১১)। বঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম তার বিখ্যাত “রিয়াদুস সালাতীন” গ্রন্থে যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন তা প্রায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। রিয়াদুস সালাতীনে তিনি উল্লেখ করেন যে, হযরত নূহ (আ) এর সময় যে মহাপ্লাবন হয়েছিল তাতে তাঁর গুটি কয়েক মুসলিম অনুসারী ছাড়া পৃথিবীর সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়। এ মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ (আ) এর পুত্রগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। নূহ (আ) এর এক পুত্র “হাম”। জানা যায়, হাম পৃথিবীর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। হাম এর ছিল ছয় পুত্র সন্তান। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল “হিন্দ”। যে সকল এলাকায় বসতি স্থাপন করেন তাদের স্ব-স্ব নামানুসারে সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। সে হিসাবে হিন্দ যেখানে বসবাস করত তার নাম হলো “হিন্দুস্থান”। অপরদিকে হিন্দের ছিল চারপুত্র যাদের দ্বিতীয় জনের নাম ছিল “বঙ”। আর বঙ এর বংশধরদের আবাসস্থলই “বঙ্গ” নামে পরিচিত। আর “বঙ্গ” বা বং এর সাথে আল যুক্ত করেই বাঙ্গালা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

“বঙ্গ” বা বং এর সাথে কেন “আল” যুক্ত করা হলো এর একটি চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বাংলা ভাষায় “আল” শব্দের অর্থ হলো বাঁধ। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা বন্যার পানি যাতে বাগানে বা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারদিকে ১০ গজ উচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড “আল” বা বাঁধ নির্মাণ করতেন। এ থেকেই “বাঙ্গালা” বা বাঙ্গালাহ নামের উৎপত্তি (সলীম, ১৯৭৮, পৃ, ৫০-৫১)।

স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলা তথা বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে জনবসতি শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভিনদেশী শাসক দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। কখনো মোগল-পাঠান, কখনো বণিক শ্রেণি, দস্যু-তস্কর, কখনো বা ইংরেজ এবং সর্বশেষ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা শাসিত হয়েছে। তাদের কেউ এতদঅঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের কথা ভাবতে রাজি ছিল না। তারা শুধু চেয়েছিল কিভাবে এই অঞ্চলের

মানুষদের শোষণ করে অর্থ উপার্জন করা যায় এবং এই অর্থ দিয়ে তাদের নিজেদের দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। ফলে তাদের দ্বারা এই অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালীরা সব সময় তাদের অধিকার আদায়ে আপোষহীন ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে শাসকদের শোষণের প্রতিবাদ করে অধিকার আদায় করে নিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ড স্বাধীনতা লাভ করেছে।

এই মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর বাঙ্গালীর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হন। অসংখ্য মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারান। বিশাল ত্যাগ-তিতিক্ষার পর সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা এই বাংলাদেশর জনগণ স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে। আমরা পেয়েছি স্বাধীন মুক্তভূমি, স্বাধীন বাংলাদেশ। এরপর থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতিসহ সকল পর্যায়ে উন্নতি সাধনের বিরামহীন পথচলা অব্যাহত রয়েছে।

জনসংখ্যা

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন (জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২, পৃ. ৫)। এটি বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১১১৯ জন (জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২, পৃ. ১২)। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২২% (জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২, পৃ. ৭)। জাতিগতভাবে এখানকার ৯৮% মানুষ বাঙ্গালী আর ২% বিহারী বংশোদ্ভুত ও অন্যান্য। রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ৯১.৪% ইসলাম, ৭.৯৫% হিন্দু, ০.৬১% বৌদ্ধ, ০.৩০% খ্রিস্টান এবং ০.১২% অন্যান্য ধর্ম পালন করে (জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২, পৃ. ১৬)। ধর্মীয় দিক দিয়ে এটি বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মোট জনসংখ্যার ৩১.৫১% শহরে এবং ৬৮.৪৯% গ্রামে বাস করে। অধিবাসীদের অধিকাংশ কৃষি নির্ভর। সে অনুযায়ী অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো কৃষি। জুলাই-২০২২ ইং এ প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে বর্তমানে বাংলদেশের মাথাপিছু আয় ২৮২৪ মার্কিন ডলার।

প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশে মোট ৮টি বিভাগ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। আর চট্টগ্রাম বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে মোট ৬৪টি জেলা ও ৪৯২টি উপজেলা এবং ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন রয়েছে (www.bangladesh.gov.bd).

শিক্ষা

বাংলাদেশে শিক্ষা একটি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। বর্তমানে দেশে ৭+ (বয়স) এর মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬%। এর মধ্যে পুরুষ ৭৬.৫৬% এবং ৭২.৮২% মহিলা (জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২, পৃ. ১৭)। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত (১৯৭১-২০১০) প্রায় ৬টি শিক্ষা

কমিশন/কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কোন কমিশন/কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে বাংলাদেশে বিচিত্র ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চলমান। যেমন- সরকারী ব্যবস্থাপনা, বেসরকারী ব্যবস্থাপনা, এনজিও কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি। এখানে শিক্ষাস্তর হলো- প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। এখানে শিখনের ভাষাও একেক ব্যবস্থাপনায় একেক ধরনের। যেমন- বাংলা মাধ্যম, ইংরেজী মাধ্যম এবং আরবি মাধ্যম। এমনকি জাতীয় কারিকুলামও সবাই মেনে চলে না। যার ফলে এখানে একটি গোলমেলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাজ করছে (উদ্দীন, ২০১৪)।

বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনা

প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর অমিয় বাণী- بلغوا عني ولو اية অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত বা বাণীও হয়। রাসুল (স) এর এ বাণী অনুসরণ ও বাস্তবায়নে রাসুলুল্লাহ (স) এর প্রিয় সাহাবীগণ তাঁরই জীবদ্দশায় দ্বীন ইসলামের বাণী নিয়ে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। সুদূর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে দ্বীন ইসলামের বাণী। তারই ধারাবাহিকতায় খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে (৬৩৪-৪৪খ্রি.) ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে।

হিজরী প্রথম শতাব্দীতে (৭ম খ্রি.) হযরত ওমর (রা) এর খিলাফতকালে কয়েকজন মুসলিম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। বিভিন্ন সময়ে সাহাবীদের একের পর এক ৫টি দল বাংলাদেশে আসেন (মহিউদ্দিন, ১৯৯৬.পৃ. ৩১)। এরকম একদল সাধক উলামার নেতৃত্বে এদেশের মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের হাতে ঈমান গ্রহণ করতে থাকেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো শিক্ষা দিতেন। তাই আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে, যখনই ইসলামের সুমহান বাণী বাংলায় এসে পৌঁছেছে ঠিক তখন থেকে এখানে ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এদেশে ইসলামি শিক্ষার সূচনাকাল থেকেই নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজ অবধি টিকে আছে। শাসকগোষ্ঠীর পটপরিবর্তনের বিভিন্নতার কারণে কখনো ইসলামি শিক্ষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে আবার কখনো বা বাধাগ্রস্তও হয়েছে। তবে কখনো একবারে স্তিমিত হয়ে যায়নি। মুসলিম শাসকদের মধ্যে এমনও অনেক শাসক, বাদশা বা নবাব ছিলেন যারা ইসলামি চিন্তা চেতনা ধারণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। ফলে ইতিহাসে তাঁরা কেবল শাসকই বিবেচিত হননি, তাঁরা ইসলামের দাঈ বা মুবাল্লিগ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। বিবেচিত হয়েছেন ইসলামি শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য মুসলিম শাসকগণ দেশের মোট ভূমির এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত লাখেরাজ করে দিয়েছিলেন (উদ্দিন, ২০০৫, পৃ. ৩৩)। তাই যেখানেই মুসলমানদের বসবাস চলছে সেখানেই কোন না কোনভাবে ইসলামি শিক্ষা চলমান ছিল এবং এখনো আছে। তবে এ উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা বিশেষভাবে শুরু হয় উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনামলে ৭১২ খ্রি./৯৩ হিজরীতে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁর সঙ্গে ৫০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য স্থায়ীভাবে ছিলেন। যাঁদের মধ্যে বহু আলিম, হাফিজ, ক্বারী ও ফকীহ ছিলেন, যারা এই বিজিত অঞ্চলে পবিত্র কুরআন মজিদ ও হাদিসের জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন।

এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক আরব-মুসলিম এ ভূখণ্ডে আগমন করেছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাঁদের সবার জন্য মসজিদ ও চার হাজার অভিবাসীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন (উদ্দীন, ২০০৭, পৃ. ৯১)। এর প্রায় দীর্ঘ সময় পর ১২০৩ খ্রি. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামি শিক্ষার সূচনা হয়।

বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ সালে বৃটিশদের হাতে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ প্রায় ৫৫৪ বছর এদেশ শাসন করেন। এসময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই দ্বীন ইসলামের বাণী পৌছে যায় বাংলার মানুষের দ্বারে দ্বারে। আর এসবের সূচনাকারী ছিলেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী।

ইসলামি শিক্ষার অবদানেই এদেশে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে, যারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা সূচনার পর দ্রুত বিকশিত হয়ে আবার কালের আবর্তনে হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস এর ব্যতিক্রম। এখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে গতি হারিয়েছে কিন্তু মূল অস্তিত্ব হারিয়ে যায়নি (উদ্দীন, ২০০৫, পৃ. ৩৫)।

ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলার বিভিন্ন সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থা

সুলতানী আমলে ইসলামি শিক্ষা

৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্দুরাজা দাহিরের পরাজয় ও মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয় ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পবিত্র কুরআনে শিক্ষাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা হওয়ায় মুসলিম শাসকগণ প্রজাদের শিক্ষা দেওয়াকে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন মনে করতেন। শিক্ষাচর্চায় মুসলিমরা এত বেশি উৎকর্ষ লাভ করে যে, সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আরবি ভাষায় কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ, হাদিস, ফিকহ, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে আর কোন যুগে তত পরিমাণ হয়নি। ইসলাম ধর্ম ও শিক্ষা একটি অপরটির পরিপূরক হিসাবে অগ্রগণ্য হতো। তাই মুসলিম রাজ্যসমূহে শিক্ষককে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হতো। আর এ শিক্ষাব্যবস্থার কর্ণধার ছিলেন সুলতানেরা। গজনী বংশ, ঘোরী বংশ, দাশ বংশ, তুঘলক বংশসহ বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে ভারতে যে ইসলামি শিক্ষার বুনিয়াদ সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হয়েছিল তা ইতিহাসে সুলতানী যুগের শিক্ষাব্যবস্থা বলে খ্যাত। সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬খ্রি.) পর্যন্ত প্রায় ৩০০ বছরের বেশি কিছুকাল স্থায়ী ছিল।

মুসলিম শাসকগণ সর্ব উপায়ে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষার প্রসারে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপন করেন। মুসলিম আমলে শিক্ষার স্তর ছিল তিনটি। যথা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা। প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত সবস্তরের শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। তাছাড়া গরিব অসহায়দের জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থাও ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী ও গরিবদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার সুযোগ ছিল না। এসময় মুসলিম শাসকদের ছত্রছায়ায় ও

সযত্নে লালিত ও বিকশিত হয়েছে ইসলামি ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। তাই নিঃসন্দেহে সুলতানী আমল ভারতবর্ষে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা ও অগ্রযাত্রার ভিত্তি ছিল বলা যায়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইলতুৎমিশ, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলক, আলাউদ্দীন খিলজী, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

সুলতান মাহমুদ (১০০০-১০২৬ খ্রি.)

সুলতান মাহমুদ শিক্ষা ও শিক্ষিতের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। তিনি প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পরিচালনার জন্য বহু মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি উন্নতমানের জাদুঘর এবং সুসজ্জিত পাঠাগার নির্মাণ করেন। সুলতান মাহমুদের গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের নমুনায় বাগদাদে নিযামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় (ঢালী, ২০১৩, পৃ:৭৯)। এছাড়া গজনীতে তিনি Clestial bride বা স্বর্গীয় বধু নামে একটি অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হতো।

তিনি নিজে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও ইতিহাসের পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর দরবারে সব সময় কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকদের সমাবেশ ঘটত। তিনি প্রায় চার শতাধিক কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ. ১৩৪)। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, বিখ্যাত কবি ফেরদৌসী, আল বেরুনী প্রমুখ। কবি ফেরদৌসীর শাহনামা ও আল বেরুনীর *কিতাব আল হিন্দ* ও *কানুন আল মাসুদীর* রচনায় সুলতান মাহমুদের সহযোগী অবদান অনস্বীকার্য। এভাবে তিনি গজনীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন।

সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী (১১৭৪-১২০৬ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম এক অবিস্মরণীয় নাম। গজনী, ঘোর ও দিল্লীর অধিপতি এই সুলতান ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘোরী নামে সমধিক পরিচিত। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান ও প্রজাহিতৈষী শাসক। ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে মুহাম্মদ ঘোরীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আজমীরসহ অনেক শহরে বড় বড় মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য দিল্লীতে ১১৯২-৯৩ খ্রি. বিখ্যাত "কুওয়াতুল ইসলাম" নামক মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিগৃহীত সমাজের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। দাসদাসীদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি তাঁর কয়েকজন ক্রীতদাসকে সু-শিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। যারা পরবর্তীতে দিল্লীর যোগ্য সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেক, ইলতুৎমিশ এবং গিয়াস উদ্দীন বলবন। ক্রীতদাসের উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক এস. এম জাফর মন্তব্য করেন, ভারতীয় রাজা- বাদশাহদের মধ্যে মুহাম্মদ ঘোরীই ছিলেন সর্বপ্রথম শাসক যিনি শিক্ষা বিস্তারকে নিজ দায়িত্ব বলে মনে করতেন (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ. ২৯-৩০)।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (১২০৪ খ্রি.)

সর্বপ্রথম মুসলিম বিজেতা হিসাবে বাংলায় প্রবেশ করেন ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। তিনি একজন দ্বীনদার শাসক ছিলেন। তিনি নিজে কয়েকটি মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

তার পদাংক অনুসরণ করে আঞ্চলিক শাসকগণও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ.১৩৪)।

কুতুবুদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.)

সুলতান মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম ক্রীতদাস ও জামাতা কুতুবুদ্দীন আইবেক ১২০৬ সালে দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতুবুদ্দীন কেবল প্রজারঞ্জক শাসকই ছিলেন না; বরং শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে তাঁর অবদান ছিল অসমান্য। তিনি নিজে ছিলেন জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত। আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। তাঁর দরবারে জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাদর ছিল উল্লেখ করার মত। কুতুবুদ্দীন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ ও তৎসংলগ্ন মক্তব ও মাদরাসা নির্মাণ করেন। মক্তব ছিল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে সূরা, কিরাত, অক্ষর জ্ঞান ও লিখন-পঠন শিক্ষা দেয়া হতো। আর মাদরাসা ছিল উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখানে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষা দেয়া হতো। আর রাজপ্রসাদে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল (আলিম, ১৯৬৯, পৃ. ৪৩-৪৪)। তার প্রতিষ্ঠিত স্থাপনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আজমীরে আড়াই দিনকা ঝোপড়া (মাবুদ, ২০১৬, পৃ. ৬৭)।ৎ

সুলতান ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬ খ্রি.)

সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবেকের যোগ্য উত্তরসূরী ও দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি ছিলেন ধার্মিক, শিল্পানুরাগী ও বিচক্ষণ শাসক। তাঁর শাসনামলে গোটা দিল্লি তৎকালীন ভারতের ইসলামি শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজ্যে তিনি বহু মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী গুণী, কবি সাহিত্যিক ও ফকির দরবেশের মিলনমেলা হতো তাঁর দরবারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমীর খসরু ও ফখরুল মুলক ওসমানী। তিনি দিল্লির বিখ্যাত কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজও সমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি তাঁর দুই যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যান। তাঁর কন্যা সুলতানা রাজিয়া ও পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদ। এরা দু'জনই মুসলিম ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে (ঢালী, ২০১৩, পৃ: ৮২)।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রি.)

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন ইলতুৎমিশের “চল্লিশজন ক্রীতদাস” এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বীয় প্রতিভার জোরে তিনি সুলতানের বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠেন এবং পরবর্তীতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ও তাঁর পূর্বসূরীদের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবার এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সুলতান বলবনের মত তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণ ও বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন (আলীম, ১৯৬৯, পৃ. ৪৬)।

জালাল উদ্দীন ফিরোজ খিলজী (১২৯০-১২৯৬ খ্রি.)

জালাল উদ্দীন ফিরোজ খিলজী একজন ধর্মপ্রাণ, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, উদারচিত্ত, বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তিনি খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর দরবারে জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমীর খসরু, খাজা হাসান, আমীর আরসামা, কাজী মুগীস ও তাজউদ্দীন প্রমুখ (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ.৬১-৬২)।

আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩০৬ খ্রি.)

সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী মুসলিম ভারতের ইতিহাসে এক দ্বিগ্বিজয়ী নাম। তিনি স্বীয় পিতা জালাল উদ্দীন খিলজীকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন নিজে অশিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল (আলীম, ১৯৬৯,পৃ. ৬৯)। ঐতিহাসিক ফিরিশতা বলেন: তিনি সুলতান পদ লাভের পর ফারসী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারে প্রথম দিকে তিনি নেতিবাচক ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক অবদান রাখেন। তিনি জ্ঞানী-গুণীদের যথেষ্ঠ সমাদর করতেন। তাঁর দরবারে সাহিত্য বিভাগে ৪৫ জন উচ্চতর ডিগ্রিধারী পণ্ডিত ছিলেন। যারা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ছিলেন। এদের মধ্যে আমীর খসরুর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর আমলে কবি, পণ্ডিত ও খ্যাতিমান শিক্ষকদের ভাতা দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদানে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। সুলতান তাঁর শাসনামলে বহু মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, এতিমখানা, গ্রন্থশালা ও বড় বড় প্রসাদ নির্মাণ করেন (আলীম, ১৯৬৯,পৃ. ৬৪)। তাঁর আমলে দিল্লী মুসলিম শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হলো “আল্লাই দরওয়াজা”।

গিয়াস উদ্দীন তুগলক (১৩২০-১৩২৫ খ্রি.)

তুগলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসুদ্দীন তুগলক বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, নম্র, উদার ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। সাহিত্য সেবকগণ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তাঁর আমলেই বিদ্বান ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল (ইসহাক, ১৯৯৩, পৃ. ১৩৪)।

মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশে সুলতানদের মধ্যে সৃষ্টির এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল মুহাম্মদ বিন তুগলক। তিনি ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। কলা ও বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল অভাবনীয়। তিনি একাধারে দার্শনিক, গণিতবিদ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। কুরআন, হাদিস, গণিত, ভাষাতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, গ্রীক ও মুসলিম দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। মাহদী হুসাইন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, কোন রচনাবিদ তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস করতেন না (উদ্দীন, ২০০৫, পৃ. ৭১)। শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান ছিল অনন্য। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিল্লীতে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার রাজ্যত্বকালে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা ১৩৩৩ খ্রি. ভারতবর্ষে আগমন করেন। তার প্রতি সুলতানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি

তাঁকে কাজীর পদে অধিষ্ঠিত করেন (চৌধুরী, ১৯৯৪, পৃ. ৮৮-৯০)। ইবনে বতুতা তাঁর দরবারে নয় বছর কাজী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)

সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক নিজে একজন পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে "ফতুহাতে ফিরোজশাহী" নামে তাঁর শাসনামলের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সকল শ্রেণির মানুষের জন্য শিক্ষা বিশেষ করে ইসলামি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। তার শাসনামলে প্রায় ১৮০০০ ক্রীতদাস শিক্ষা লাভ করে।

শিক্ষার প্রসারের জন্য অকৃপণ হাতে দান করতেন। তাঁর আমলে তিনি প্রায় ৩০টি কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো "ফিরোজশাহী মাদ্রাসা"। এখানে বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত অধ্যাপনা করতেন। এদের মধ্যে জালালউদ্দীন রুমি ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ফিরোজশাহী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন (আলীম, ১৯৬৯,পৃ. ১০২-১০৩)। ফিরোজশাহ তুগলকের আমলেই বারানী, আফিফ, আইন-উল-মুলক প্রমুখ ঐতিহাসিক তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। মুসলিম ভারতে শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে এস. এম জাফর মন্তব্য করেনঃ Education during the reign of feroz Tuglag made a mighty advance, because the Sultan was an extenuate educationist who strove jealousy for propagation (তালিব, ১৯৯৪, পৃ.২১)।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.)

শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকাল বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানী আমলের এক গৌরবোজ্জ্বল সময়। এ সময়কালকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামি শিক্ষার স্বর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হবেনা। হোসেন শাহের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং শাসন দক্ষতার ফলে জনগণের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, উদারচিত্ত, বিচক্ষণ, সুদক্ষশাসক এবং শিক্ষানুরাগী, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর আমলে বিদ্বান ও আলেম শ্রেণির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের সব মসজিদে মক্তব চালু হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও সরাইখানা স্থাপিত হয়। মালদহ ও পাণ্ডুয়াতে বিরাট মাদরাসা স্থাপন করেন। "কুতুবুল আলম" নামের একজন আলেমের কবরের পাশে তিনি একটি মসজিদ, একটি মাদরাসা ও একটি হাসপাতাল নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে শিক্ষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। হোসেন শাহের সুশাসনে সমৃদ্ধ বাঙ্গালী জনসাধারণ তাকে "নৃপতি তিলক" ও "জগত ভূষণ" এই দুইটি উপাধীতে সম্মানিত করেছিলেন (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ. ১৬৬)। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন সুলতানী আমলে বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসক। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির খাঁন নুসরাত শাহ উপাধী ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এছাড়া সুলতানী আমলের আরও কয়েকটি বংশের সুলতানগণ ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখেন। এদের মধ্যে লোদী বংশের সিকান্দার লোদী নিজেই একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তিনি ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি একজন ধার্মিক জ্ঞানী, উদার ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইলিয়াছ শাহী বংশের সিকান্দার শাহও ছিলেন শিল্প

সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক । তার আমলে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মিত হয়। যেটি বিশালতার জন্য সমগ্র ভারতে পরিচিতি লাভ করেছিল। এছাড়া আখ-ই সিরাজউদ্দীন মসজিদ, কাটায়ালী দরওয়াজা সিকান্দার শাহের আমলেই নির্মিত হয়েছিল।

বাহমানী সুলতানদের মধ্যে মুহাম্মদ শাহ ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও বিদ্যোৎসাহী। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে মুসলিম বিজয়ের পর মুসলমান শাসক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

মুঘল আমলে ইসলামি শিক্ষা

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৫২৬খ্রি. লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদী পানিপথের ১ম যুদ্ধে কাবুলের আমির বাবরের হাতে পরাজিত হলে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে মুঘলদের আগমনের সাথে সাথে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল মুঘল সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। মুঘল সাম্রজ্যের বিস্তৃতি ছিল বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান পর্যন্ত। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর। মুঘল সম্রাট, যুবরাজ, অভিজাত ব্যক্তি ও রাজকর্মচারীগণ উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। মুঘল রাজ দরবারে জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল ছিল। ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান সমাদৃত।

সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর নিজেই ছিলেন একজন প্রতিভাবান কবি। তিনি আরবি, ফার্সি, তুর্কি ভাষা এবং কবিতা রচনায় অনন্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তিনি তুর্কি ভাষায় "*তুযুক-ই বাবর*" নামে আত্মজীবনী লিখেন যা ছিল সহজ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় লেখা এক অনবদ্য রচনা। লেখক ও কবি বাবর তুর্কি ভাষায় আইন ও ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া তিনি সংগীত, হস্তলিপি ও চিত্রাংকন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বহু মক্তব ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। নির্মাণ ও গঠনমূলক কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি "শুহরত-ই আম" নামক গণপূর্ত বিভাগ গঠন করেন। তাঁর শাসনামলে দিল্লী শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং এর উন্নয়নে যে অবদান রেখে গেছেন তা অতুলনীয়।

সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.)

সম্রাট নাসির উদ্দীন হুমায়ুন তাঁর পিতা সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট হুমায়ুনের বিদ্যানুরাগ সর্বজনবিদিত। তিনি ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি। আরবি, ফার্সি ও তুর্কি ভাষায় তাঁর দখল ছিল অতুলনীয়। এছাড়া গণিত, ভূগোল, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তিনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার তিনি পণ্ডিতদের বৈঠকে হাজির হতেন।

সম্রাট হুমায়ুনের শাসনামলে ইসলামি শিক্ষার অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটে। তিনি অসংখ্য মসজিদ, মক্তব ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে মাদ্‌রাসায় যেসব গ্লোব ব্যবহৃত হতো সম্রাট হুমায়ুন-ই তা এদেশে প্রচলন করেন। হুমায়ুন দিল্লীতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে ইসলামি দর্শন চর্চার সুযোগ ছিল। শেরশাহ এ মাদরাসাতেই শিক্ষালাভ করেন। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা ও খানকাহ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় প্রজাসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার প্রতিও যথেষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশে নারীদের শিক্ষার জন্য তিনি ইরান, তুরান, সমরকন্দ ও বোখারা থেকে গৃহশিক্ষিকা নিয়ে আসেন যাদেরকে “আতুন” বলা হতো (আলীম, ১৯৬৯, পৃ. ১৯১)।

শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.

ভারতের ইতিহাসে শেরশাহের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও বিচক্ষণ শাসক অত্যন্ত বিরল। মুঘল আমলে তিনি মাত্র পাঁচ বছর শাসন পরিচালনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পাঁচ বছরে শাসন সুসংহত করার পাশাপাশি ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি নিজেও ছিলেন জৈনপুরের এক মাদরাসার শিক্ষার্থী। শেরশাহ ব্যক্তি জীবনে প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত ফার্সি কবি শেখ সাদী রচিত ‘গুলিস্তা” ও “বোস্তা” তাঁর মুখস্ত ছিল। আলিম ও শায়খদের সাথে মাদরাসা ও খানকায় তাঁর যাতায়াত ছিল। ইসলামি শিক্ষার প্রসারে তিনি বহু মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা,টোল ও পাঠশালা নির্মাণ করেন (চৌধুরী, ১৯৭৯, পৃ. ২৩৮)। মসজিদের পাশে আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁর নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাতিয়ালার “শেরশাহী মাদরাসা” খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি মসজিদ ও মাদরাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য ওয়াকফ প্রথা চালু করে একটি ফাণ্ড গঠন করেছিলেন। এই ফাণ্ড থেকে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাত সম্রাট জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ আকবর। ইতিহাসে তিনি আকবর দ্যা গ্রেট বা মহামতি আকবর হিসাবে পরিচিত। তিনি নিজে নিরক্ষর হিসাবে কথিত হলেও তার প্রখর স্মৃতিশক্তি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অসীম বীরত্ব ও সাহসের দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের স্থান অলংকৃত করেছেন।

তাঁর শাসনামলে স্থানে স্থানে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বিত্ত সম্পত্তিও দান করেছিলেন। গরীব ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেন এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে তিনি পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির যে পদ্ধতি চালু করেছিলেন তা আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে প্রায়ই মিলে যায়। তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে পাঠের আসরে থেকে পড়া শেষ করতে হতো। দিনব্যাপী পাঠ অনুশীলন অব্যাহত থাকত। তাঁর আমলে শিশু স্তরের পাঠদান পদ্ধতিকে স্বার্থকভাবে কার্যকর করার জন্য চারটি ধাপ অনুসরণ করা হতো। যেমন-

ক. বর্ণমালা শিক্ষা

খ. যুক্তাক্ষর

গ. শ্লোক বা দ্বিচরণ শ্লোক

ঘ. পূর্বপাঠের পুনরাবৃত্তি।

এ পদ্ধতিতে ভাষাশিক্ষা খুবই কার্যকরী ছিল এবং শিশুরা খুব সহজে ভাষা আয়ত্ব করতে পারতো। সম্রাট আকবরের শিক্ষা সংস্কারে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন তাঁর সভাসদের সদস্য আবুল ফজল। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দুনিয়াবী বাস্তব প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সম্রাট আকবরের দরবারে প্রায় দুইশত কবির সমাগম ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল “ফৈজী”।

আকবরের শাসনামলের রচনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী”। সম্রাট আকবরের উচ্চভিলাষী কর্মসূচির অন্যতম একটি ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা, যাতে প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক মৌখিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। এভাবে মুঘল আমলে ভারতে শিক্ষার মান সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ১৩)। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে আকবরের এতসব কীর্তি বিতর্কিত দ্বীন-ই-ইলাহী নামে নতুন ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের ফলে ইতিহাসে যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। সম্রাট আকবরের তথাকথিত উদারনীতির নামে যে ধর্মীয় সংস্কার শুরু করেছিল তার কারণে ইসলামধর্ম স্বকীয়তা হারাতে বসেছিল। কিন্তু তৎকালীন সময়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) এর আগমনের ফলে আকবরের এসব ভ্রান্তনীতি চুরমার হয়ে যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে আবার ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর তার পুত্র সেলিম নুর উদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী না হলেও শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ফারসি, তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। এছাড়া গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান ও নীতিকথায় পারদর্শী ছিলেন। যেসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়ে পশু পাখির আবাস ভূমিতে পরিণত হয়েছিল সেরকম অনেক প্রতিষ্ঠান তিনি সংস্কার করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কলগুঞ্জনে মুখরিত করেন। তাঁর আমলে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব নির্মাণ ও এতে কুরআন ও হাদিস শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন যে, তাঁর রাজ্যের সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তি লা-ওয়ারিশ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সমুদয় সম্পত্তি সরকারের মালিকানাধীন হয়ে মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ব্যয় হবে। সম্রাটের এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে বুঝা যায় তিনি শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)

শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ভারতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় নাম হলো সম্রাট শাহজাহান। আড়ম্বরপ্রিয় ও জাঁকজমকের জন্য তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষতায় তিনি তার

পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী শাসক। তিনি বিখ্যাত "দারুল বাকা" নামক মাদরাসা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন। ১৬৫৮ সালে তিনি দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণে একটি রাজকীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন কোন মাদরাসা স্থাপনের খবর পেলে তিনি সাথে সাথে নিজ তহবিল থেকে বৃত্তি মঞ্জুর করতেন। তাঁর আমলে যেসব স্থাপনা বিশ্বখ্যাতি এনে দিয়েছিলো তার মধ্যে তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওয়ান-ই আম, জাম-ই-মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (আলীম, ১৯৬৯, পৃ. ২৬৭)।

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেব চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সম্রাট আলমগীর হিসাবেও পরিচিত। তিনি তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানের পর মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি "জিন্দাপীর" হিসাবেও পরিচিত। তিনি নিজে পবিত্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেন। কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত ও নিজ হাতে টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর শাসনামলে ইসলামি শিক্ষা ও শুদ্ধ জীবনাচার বা নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল। ইসলামি আইন ও শিক্ষা বিস্তারে তার অসামান্য অবদান রয়েছে। তাঁর শাসনামলে রাজ্যের দিকে দিকে অসংখ্য মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। যোগ্য বিদ্বান ব্যক্তিদের জায়গীর প্রদান করেন। দূরবর্তী প্রদেশসমূহের প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ প্রেরণ করেন যেন জনসাধারণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেন। তাঁর আমলে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। তাঁর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ও মোল্লা নিযামের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছিল মুসলিম আমলের সর্ববৃহৎ আইন সংকলন "ফতোয়া-ই-আলমগীরী" (আলীম, ১৯৬৯, পৃ. ২৮৩)। আইনজীবী ও বিচারকরা অদ্যাবধি মুসলিম আইনের উৎস হিসাবে এ গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া তাঁরই উৎসাহে কাশ্মীরে মোল্লা শফি উদ্দীন "তাফসীর-ই-কবীর" আরবি থেকে ফারসীতে অনুবাদ করেন।

এক কথায় বলতে গেলে মুসলিম আমলে ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে যে সকল সুলতান ও সম্রাট অবদান রেখেছেন সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভারতীয় উপমহাদেশে তথা বাংলায় ইসলামি শিক্ষার যুগবিভাগ ও পাঠ্যসূচি (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)

কয়েক শতাব্দীকালের দীর্ঘ শাসনামলে মুসলমান শাসকগণ তাদের স্বজাতীর জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন যাতে মুসলিমরা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতেই সফলকাম হতে পারে। মুসলমানরা এদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি সেখানে যে শিক্ষাসূচি প্রচলন করেন তা সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে। প্রায় সাড়ে ছয়শত বছরের মুসলিম শাসনে ভারতবর্ষে ইসলামি শিক্ষা তথা মাদ্রাসা শিক্ষাই ছিল একক জাতীয় শিক্ষা। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বৃটিশ পূর্বযুগ পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহে যে পাঠ্যসূচি ছিল আবুল হাসান আলী নদভী তাকে

যুগের ক্রমানুসারে পাঁচভাগে ভাগ করেছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থসমূহের নামও উল্লেখ করেছেন (নদভী, ১৯৩৬, পৃ. ৮৯)।

প্রথম যুগ

ভারতে ইসলামি শিক্ষার প্রথম যুগের বিস্তৃতি ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর। এ সুদীর্ঘ সময়ে নাহু, সরফ, বালাগাত, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, কালাম, মানতিক, তাসাউফ, তাফসীর, হাদিস ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা সুধী সমাজের কাছে সম্মান লাভের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতো। এ যুগে যেসব বিষয় ও গ্রন্থ পাঠ্যসূচিতে ছিল তা হলোঃ

নাহুঃ মিসবাহ, কাফিয়া।

ফিকহঃ হিদায়া, শরহে বেকায়া।

উসূলে ফিকহঃ মানার ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, উসূলে বায়যাভী ও এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

তাফসীরঃ তাফসীরে বায়যাভী এবং কাশশাফ, নাকদুন নুসুস, লুম'আত এবং ফুসুলুল হিকাম ইত্যাদি।

মানতিকঃ শরহে শামসিয়াহ।

হাদিসঃ মাশারিকুল আনওয়ার, মাসাবীহুস সুন্নাহ।

আল-কালামঃ শরহে সাহায়িফ, তাহমীদ-ই আবুশ শাকুর সালেমী।

সাহিত্যঃ মাকামতে হারীরী।

এ যুগে ফিকহ ও উসুলে ফিক্হ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করা ছিল সম্মানের মাপকাঠি। কারণ তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ ভারতে এসেছিলেন গজনী ও ঘুর অঞ্চল থেকে। তাই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে তাদের রুচির প্রতিফলন ঘটেছিল। এ কারণে ফিকহশাস্ত্রে শিক্ষাদান ও চর্চা খুবই গুরুত্ব লাভ করেছিল। হাদিসচর্চার প্রতি তেমন কোন উৎসাহ ছিল না। হাদিস বিষয়ে মাশারিকুল আনওয়ার অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট মনে করা হতো। তখন কেউ যদি মাসাবীহ পড়ার সুযোগ পেলে তাকে হাদিস শাস্ত্রের ইমাম হিসাবে গণ্য করা হতো।

দ্বিতীয় যুগ

ভারতে ইসলামি শিক্ষার দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। শায়খ আব্দুল্লাহ ও শায়খ আযীযুল্লাহর হাত ধরে এ যুগের পাঠ্যসূচি আরো উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। ভারতের আনাচে-কানাচে তাদের জ্ঞানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আর পূর্বের তুলনায় এ যুগে পাণ্ডিত্য লাভের মাপকাঠি আরো উন্নত করা হয়। এ যুগের পাঠ্যক্রম ছিল প্রথম যুগের অনুরুপ। তবে পূর্বের পাঠ্যক্রমের সাথে কাজী আয়্যুদ রচিত মাতালি, মাওয়াক্বিফ এবং সাকাফি রচিত মিফতাহুল উলুম নতুন করে যুক্ত করা হয়। এছাড়া পর্যায়ক্রমে শরহে মাতালি, শরহে মাওয়াকিফ, মুতাওয়াল, মুখতাসারুল মায়ানী, তালভীহ, শরহে আকাইদ আন নাসাফী, শরহে বেকায়া ও শরহে জামী যুক্ত করা হয় পাঠ্যসূচিতে। এ যুগের সর্বশেষ ও প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি হাদিসের উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন মক্কা ও মদিনার প্রখ্যাত শায়েখদের নিকট। সেখান থেকে হাদিসের উপর ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে দেশে

ফিরে এসে তা প্রচারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তবে তিনি আশানুরূপ সাফল্য পাননি (উদ্দীন, ২০০১, পৃ. ৭৯)।

তৃতীয় যুগ

ভারতে ইসলামি শিক্ষার তৃতীয় যুগ বিস্তৃত ছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দ্বিতীয় যুগে পাঠ্যসূচিতে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল তা পূর্ণতা পায় শাহ ফাতহুল্লাহ সিরাজী উপমহাদেশে আসার পর। তিনি সম্রাট আকবরের আমলে উপমহাদেশে এসে পূর্ববর্তী পাঠ্যসূচির উন্নতি সাধন করে অতিরিক্ত গ্রন্থাবলী যোগ করেন। এর দ্বারা ইসলামি শিক্ষা তথা আরবি ও ফারসি শিক্ষার অনেক উন্নতি হয়। মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুনত্ব ও পুনর্জীবন লাভ করে। এ যুগের সর্বশেষ ও সবচেয়ে খ্যাতিমান আলিম ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি তাঁর আত্মজীবনী “আল জুযউল লতীফ” গ্রন্থে সে যুগের প্রচলিত পাঠ্যসূচির যে বর্ণনা উল্লেখ করেন তা হলো:

নাহু: কাফিয়া, শরহে জামি।

মানতিক: শরহে শামসিয়া, শরহে মাতালি।

দর্শন: শরহে হিদায়াতুল হিকমত।

কালাম: শরহে আকাইদুন নাসাফী, শরহে মাওয়াক্কিফ হিকমত।

ফিকহ: হুস্‌সামী, তাওযীহ, তাওযীহে তালভীহ এর কিছু অংশ।

বালাগাত: মুখতাসারুল মায়ানী, মুতাওয়্যাল।

জ্যোতির্বিদ্যা ও অংক: সংক্ষিপ্তাকারের কিছু বই।

চিকিৎসা শাস্ত্র: মুওজাযুল কানুন।

হাদিস: মিশকাতুল মাসাবিহ (সম্পূর্ণ), শামায়েল তিরমিযী (সম্পূর্ণ), সহীহ বুখারী (কিছু অংশ)।

তাফসীর: তাফসিরে মাদারিক, তাফসিরে বায়জাভী ইত্যাদি।

তাসাউফ: শরহে রুবাইয়াত-ই-জামী, মুকাদ্দামায়ে শরহে লুমআত, আওয়ারিফ, রাসায়েলে নকশবন্দিয়াহ ইত্যাদি (উদ্দীন, ২০০১, পৃ. ৮০)।

উপরোল্লিখিত পাঠ্যক্রমে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) নিজে অধ্যয়ন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি মদিনায় গমন করেন। সেখানে বেশ কয়েক বছর অবস্থান করে মদিনার প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ আবু তাহের মাদানীর নিকট হাদিসের উপর উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৭৩২ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে হাদিস শাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার ও শিক্ষাদানে আত্মোৎসর্গ করেন। এ সময়ে উপমহাদেশে সিহাহ সিত্তার পঠন পাঠন ব্যাপক আকারে শুরু হয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) এর বংশধর ও ছাত্ররা হাদিস ও তাফসীরচর্চায় এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) যে নতুন সিলেবাস ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেন তা জনপ্রিয়তা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কারণ মুসলিম শাসনের পতনোম্মুখ সময়ে এসে এটি প্রবর্তন করা হয়েছিল। এ সময়ে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতো স্থানান্তরিত হয়। লক্ষ্ণৌতে মোল্লা কুতুবুদ্দীন ও তার পুত্র মোল্লা

নিযামুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রগুলো জেগে উঠে। এ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে মানতিক ও হিকমাতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো বেশি আর এর স্বাদ জনগণকে পেয়ে বসেছিল। ফলে আরবী, ফারসি, সাহিত্য ও হাদিস চর্চা আশানুরূপ সফলতা পায়নি (উদ্দীন, ২০০৫, পৃ. ৮১)।

চতুর্থ যুগ

এ উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার চতুর্থ যুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহালুভীর (মৃত্যু ১১৬১হি.) হাত ধরে। তিনি এমন দৃঢ়তার সাথে মজবুতভাবে এ পাঠ্যসূচির ভিত্তি রচনা করেন যা কয়েক শতাব্দী অতীত হওয়া সত্ত্বেও আজও এর সংকীর্ণতা দেখা দেয়নি। মোল্লা নিযামুদ্দীন ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ:) এর সমসাময়িক। শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রণীত পাঠ্যসূচির ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে মোল্লা নিযামুদ্দিন যে দরসে নিযামিয়ার রূপরেখা প্রবর্তন করেন তা হলো:

নাহু: নাহুমীর, শরহে মিয়াতু আমেল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়া, শরহে জামি।

সরফ: মিযান, মুনশায়েব, সরফেমীর, ফুসুলে আকবরী, পাঞ্জেগঞ্জ, কাফিয়াহ।

মানতিক: সুগরা, কুবরা, ইসাগুজী, তামজীব, শরহে তাহযীব, কুতুবী, সুল্লমুল উলুম।

হিকমত: মায়বুযী, শামসে বাযিগাহ।

অংক: খোলাসাতুল হিসাব, তাশরীহুল আফলাক, রিসালায়ে কোশিযিয়াহ, শরহে চগমানি (১ম অধ্যায়), তাহরীরে আকলিদাস (১ম মাকালাত)।

বালাগাত: মুখতাসারুল মায়ানী, মুতাওয়্যাল।

ফিকহ: শরহে বেকায়াহ (১ম ২খন্ড), হিদায়াহ (শেষ ২খন্ড)।

উসূলে ফিকহ: নূরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালভীহ।

কালাম: শরহে আকাইদুন নাসাফী, শরহে আকায়িদে জালালী, মীর যাহিদ, শরহে মাওয়াক্বিফ।

তাফসীর: তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে বায়যাবী।

হাদিস: মিশকাতুল মাসাবীহ (উদ্দীন, ২০০১, পৃষ্ঠা. ৮১)।

এ পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ফলে উপমহাদেশের আরবী ও ইসলাম শিক্ষায় ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ পাঠ্যসূচির বিশেষত্ব ছিল শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও মুতালায়ার শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি করা। কোন শিক্ষার্থী এই নিয়মে ভালোভাবে ছাত্রজীবন শেষ করতে পারলে পরবর্তীতে সে যে কোন বিষয়ের উপর নিজে নিজে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারতো। কেননা এ পাঠ্যসূচিতে পাঠ্যগ্রন্থের উপর জোর না দিয়ে পাঠ্যগ্রন্থকে শিক্ষার উপলক্ষ্য করে মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়ে পড়ানো হতো। এ পাঠ্যসূচি চালু হওয়ার পর উপমহাদেশে বাগদাদের দারসে নিযামিয়ার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

পঞ্চম যুগ

মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শিক্ষার পঞ্চম যুগ বিস্তৃত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। এ যুগ ছিল মুসলিম শাসনের চূড়ান্ত পতনের যুগ। তাই এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থায়ও এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসময় মুসলিম শিক্ষা ও শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ যুগে যে পাঠ্যসূচি প্রচলিত ছিল তা মূলত লক্ষ্ণৌর দরসে নিযামিয়ার পরিবর্তিতরূপ। এ পাঠ্যসূচিতে যেসব গ্রন্থ পড়ানো হতো তা হলোঃ

সরফঃ মিযান, মুনশায়িব, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদাহ, দস্তরুল মুবতাদী, সরফে মীর, ইলমুস সীগাহ, ফুসুলে আকবরী এবং শাফিয়াহ।

নাহুঃ নাহুমীর, মিয়াতু আমেল, শরহে মিয়াতু আমেল, হিদায়াতুন নাহু, কাফিয়াহ এবং শরহে জামী।

বালাগাতঃ মুখতাসারুল মাআনী (সম্পূর্ণ) এবং মুতাওয়্যাল।

সাহিত্যঃ সাবউ মুআল্লাকাহ, নাফতাহুল ইয়ামান, দীওয়ানু মুতানাব্বী, মাকামাতে হারীরী এবং হামাসাহ।

ফিকহঃ শরহে বেকায়াহ (১ম ২খন্ড), হিদায়াহ (শেষ ২খন্ড), উসূলে ফিকহ, নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালভীহ এবং মুসাল্লামুস সুবুত।

মানতিকঃ সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, কালা-আকুলু, মানতিক, তাহযীব, শরহে তাহযীব, কুতুবী, মীর কুতুবী, মোল্লা হাসান, হামদুল্লাহ, কাযী মোবারক, মীর যাহীদ, গোলাম ইয়াহইয়ার লিখিত মীর যাহিদ এর টীকা, মোল্লা জালাল, বাহরুল উলুম, শরহে সুল্লুম এবং মোল্লা মুবিন।

হিকমতঃ মাইবুযী, সদরা এবং শামসে বাযিগাহ।

কালামঃ শরহে আকাইদে নাসাফী, খিয়ালী, মীর যাহিদ এবং উমূরে আম্মাহ।

অংকঃ তাহরীরে আকলিদাস (১ম মাকালা), খোলাসাতুল হিসাব, তাসবীহ, শরহে তাসবীহ এবং শরহে চগমানী।

ফারায়িযঃ শরীফাহ

মুনযারাহঃ রশীদিয়াহ।

তাফসীরঃ জালালাইন, বায়যাভী (সূরা বাকারাহ)।

উসূলে হাদিসঃ শরহে নুখবাতুল ফিকর।

হাদিসঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুয়াত্তা, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ (উদ্দীন, ২০০১, পৃ. ৮২-৮৩)।

এ যুগে মূলত তাফসীর ও হাদিসের গ্রন্থগুলো পাঠ্যসূচিতে থাকলেও তা গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা হতো না। তাফসীরে জালালাইন (সংক্ষিপ্ত) ও তাফসিরে বায়যাভীর মাত্র কিছু অংশ (আড়াই পারা) পড়ানো হতো। সাহিত্য ও হাদিস পাঠ্যসূচিতে থাকলেও তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠদান হতো না। তা শিক্ষার্থীদের নিজ উদ্যোগে পড়তে হতো। এ যুগে মানতিকের জন্য নির্ধারিত (প্রায় ১৫টি) গ্রন্থ খুবই গুরুত্বের সাথে পাঠদান করা হতো। এ যুগের পাঠ্যসূচিতে ইতিহাস, ভূগোল ও কুরআনের মূলনীতি বিষয়ে কোন গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এছাড়া পাঠ্যসূচিতে যেসব গ্রন্থ চালু ছিল এর মধ্যে হাদিস ও আরবী সাহিত্যের গ্রন্থগুলোকে সিলেবাস বর্হিভূত মনে করা হতো (উদ্দীন, ২০০১, পৃ. ৮০)। এছাড়া এ যুগে তখন উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন শুরু হওয়ায় ইসলামি শিক্ষা নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। যা বৃটিশ আমলে ইসলামি শিক্ষা অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম শাসনামলের কতিপয় মাদ্‌রাসা

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে অসংখ্য মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন মক্তব, মাদ্‌রাসা ও ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। যার দ্বারা পুরো উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি শিক্ষার বিকাশ হয়েছিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের আনাচে-কানাচে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসার পরিচয় উপস্থাপন করা হলোঃ

বখতিয়ার খিলজীর মাদরাসা

বাংলাদেশে ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করেন বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। আর তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামি শিক্ষার সূচনা হয়। বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশ অধিকার করার পর তার রাজধানী নদীয়া থেকে রংপুরে স্থানান্তর করেন। রংপুরে তিনি রাজধানী শহরের গোড়াপত্তন করে সেখানে মসজিদ, মাদরাসা এবং খানকাহ স্থাপন করেন (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৫)।

লক্ষণাবতী ও গৌড়ের মাদরাসা

সুলতান গিয়াসউদ্দীন (প্রথম) ১২১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রি. পযর্ন্ত প্রায় ১৫ বছর বাংলাদেশ শাসন করেন। সুলতান বাংলার মুসলিমদের জন্য একটি সুরম্য মসজিদ, একটি মাদরাসা এবং লক্ষণাবতীতে প্রবাসীদের জন্য একটি সরাইখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে এসব স্থাপত্যের মধ্যে মাদরাসা ভবনটির ভগ্নাংশ রয়েছে (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৬)।

হোসাইন শাহের মাদরাসা

বাংলার শাসনকর্তা হোসাইন শাহ ও তার পুত্র নসরত শাহের সাথে বাংলার হোসাইনী বংশের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তারা দুজনই বাংলার আনাচে-কানাচে বহু মাদরাসা, মক্তব এবং খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। গৌড়ের সাগরদিঘীর উত্তরাংশে চতুষ্কোণ বিশিষ্ট একটি মাদরাসা ভবন এখনো সেই স্মৃতি চিহ্ন বহন করছে। এটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ মাদরাসা ছিল। গৌড়ের অন্যান্য প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে এটি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জৌলুসপূর্ণ মাদরাসা। এই মাদরাসা ভবনের দেয়ালে প্রাপ্ত শিলালিপিতে হোসাইন শাহের নাম উৎকীর্ণ করা আছে (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৬)। এই আলীশান মাদরাসা সুলতান হোসাইন শাহ আল মালিকুল হোসাইনী ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন।

ঢাকার মাদরাসা

সম্রাট আলমগীরের মামা আমীরুল উমরা শায়েস্তা খান সম্রাট শাহজাহান ও আলমগীরের আমলে বিশিষ্ট আমীর ছিলেন। তিনি ১৬৬৪ খ্রি. হতে ১৬৮০ খ্রি. পর্যন্ত ঢাকার সুবেদার ছিলেন। তিনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানেই তার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করেছেন। ঢাকার সুবেদার থাকাকালীন তিনি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদ্‌রাসা এবং মসজিদ স্থাপন করেন। বর্তমানে নদীর তীরে একটি ভগ্নঘাট ও একটি মসজিদ তার চিহ্ন বহন করছে (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৭)। এ মাদরাসা মূলত আত্মশুদ্ধি ও সাধারণ ধর্মীয়

শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া ঢাকাতে এই ধরনের আরো মাদরাসা ও মসজিদ স্থাপিত হয়েছিল বলে বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ আছে।

মুর্শিদাবাদের মাদরাসা

মুসলিম শাসনামলে বাংলার নবাব আলীবর্দি খান একজন বিদ্যোৎসাহী শাসক ছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি আযিমাবাদের (পাটনা) আলিম-ফাযিল ও শিক্ষাবিদদের মুর্শিদাবাদে আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি বরাদ্দ করেন। তাঁর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে আসেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মীর মোহাম্মদ আলী, হোসাইন খান ও হাজী মোহাম্মদ খান। এদের মধ্যে মীর মোহাম্মদ আলীর একটি বিশাল লাইব্রেরী ছিল যেখানে প্রায় দুই হাজার গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। সেকালে দুই হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করা ছিল এক দুরূহ কাজ। এর দ্বারা তাঁর জ্ঞান তৃষ্ণার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব জাফর মুর্শিদ আলী খান মুর্শিদাবাদে “কাটারা মাদরাসা” প্রতিষ্ঠা করেন। এটি এখনো অক্ষত অবস্থায় তার পূর্ব গৌরবের ঘোষণা করছে (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৯)।

বোহর মাদরাসা

বর্ধমান জেলার একটি গ্রামের নাম ছিল বোহর। এই বোহরের প্রখ্যাত জমিদার ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন মুন্‌শী সদর উদ্দীন। তিনি নিজে জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানীগুণীদের যথেষ্ট কদর করতেন। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত আলিম মাওলানা আবদুল আলী তাঁর আমন্ত্রণে বোহর আসেন। জমিদার মুনশী সদর উদ্দীন মাওলানার জন্য একটি স্বতন্ত্র মাদরাসা স্থাপন করেন। এই মাদরাসায় তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর মাসিক বেতন ধার্য ছিল চারশত টাকা। মাওলানার সাথে লক্ষ্ণৌ থেকে একশত জন ছাত্র বোহর আসেন। যাদের প্রত্যেকের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বর্ধমানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সৈয়দ গোলাম মোস্তফা এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি স্বদেশ বীরভূমের মুফতি হয়েছিলেন। কালক্রমে বোহর মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। এই মাদরাসার বিশাল লাইব্রেরী ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং সমুদয় কিতাবপত্র ও হস্তলিখিত অসংখ্য পান্ডুলিপি কলিকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীতে স্থানান্তর করা হয়। ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির বোহর বিভাগ অদ্যাবধি এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ২৯)।

মুসলিম শাসনামলেই ভারতে প্রথম মাদরাসাভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হয়। মুসলিম সমাজে প্রতিটি শিশু চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে উপনীত হলে তাকে সর্বোত্তম পোশাক পরিয়ে পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্য স্বজনদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের সূচনা করা হতো। এ দিনে শিশুকে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করানোর চেষ্টা করা হতো। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ সূচনাকারী ছাত্ররা বালি ও ধূলার উপর লেখার অভ্যাস করত। এরপর তারা মেঝেতে খড়িমাটি নিয়ে লেখার চেষ্টা করত। এভাবে ক্রমান্বয়ে তালপাতা, কলাপাতা ইত্যাদিতে লেখত। বাঁশের কঞ্চি, পাখি, ময়ুর, হাঁসের পালক ও নলখাগড়ার টুকরা ইত্যাদি কলম হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বাংলায় মুসলমান যুগে প্রথম কাগজের ব্যবহার শুরু হয় (মাসুম, ২০০৮ খ্রি, পৃ. ১২)। গৌরবময় মুসলিম শাসনামলে মুসলমানরা তাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যতালিকা প্রবর্তনে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফতের (৭৫০-১২৫৮খ্রি.)

শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। মাদরাসার সিলেবাস ও পাঠ্যক্রমের দুটি ভাগ ছিল। যেমন- একটি হলো আল উলুমুন নাকলিয়া। এটি হলো কুরআন-হাদিস সংক্রান্ত জ্ঞান, শরিয়তের বিধি-বিধান, হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞান। এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনরুপ যুক্তি বা প্রশ্ন উত্থাপন চলে না। আল্লাহ তায়ালা এবং রাসুল (স) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তা নিয়ে যুক্তির প্রশ্নই আসে না।

অন্যটি হলো আল-উলুমুল আকলিয়া। এটি হলো রাষ্ট্র পরিচালনা, গৃহ নির্মাণ, চাষাবাদ, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সামরিক জ্ঞান, খনিজ সম্পদ উৎপাদন, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে স্বাধীন চিন্তা গবেষণার দ্বারা নতুন জ্ঞানের প্রবর্তন করা।

ভারতীয় উপমহাদেশের তদানীন্তন ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আমরা যা বুঝলাম সেটি হলো ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত উপমহাদেশের সাধারণ শিক্ষা ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মীয় অনুশাসনে নাগরিকদের চরিত্র ও মানসিকতা গঠনই ছিল তৎকালীন শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগের সেতুবন্ধন ছিল প্রবল। শিক্ষক যেমন ছাত্রের চরিত্র গঠন ও শিক্ষাদানে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তেমনি শিক্ষার্থীরা ও শিক্ষকদের অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন।

বৃটিশ আমলে ইসলামি শিক্ষা

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে এক প্রহসনের যুদ্ধে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন ঘটে বৃটিশদের হাতে। বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় ভাগীরথি নদীর পূর্ব তীরে। ইংরেজরা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনভার গ্রহণ করে। এরপূর্বে প্রায় সাতশত বছর মুসলিম শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশ শিক্ষা, সাহিত্য ও সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এদেশে মুসলিম যুগের শিক্ষাব্যবস্থা যে যথেষ্ট উন্নত ছিল এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এদেশের মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন মিটিয়েছিল এই শিক্ষাব্যবস্থা। সে সময় অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোটেও পশ্চাৎপদ ছিল না। ১২ আগস্ট ১৭৬৫ সালে (দিল্লীর নাম মাত্র বাদশাহ) শাহ আলম বাংলার দেওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা) ইংরেজদের হাতে দিতে বাধ্য হয়। ফলে ইংরেজ শাসনের চূড়ান্ত উত্থান ঘটে। সমগ্র পাক-ভারত, বাংলাদেশ জুড়ে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দীর্ঘ দুইশত বছরের বৃটিশ শাসন এদেশের মৌলিক শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেকটা পঙ্গু করে রেখেছিল।

মুসলিম শাসনামলে দেশের নগর, শহর ও গ্রামে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার জন্য অসংখ্য মক্তব, মাদরাসা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে সর্বপ্রথম অনুসন্ধান চালান উইলিয়াম এডাম। তিনি (১৮৩৫-১৮৩৮) সালে তার অনুসন্ধান শেষ করেন। আর এটিই বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষা সম্পর্কে একমাত্র পূর্ণ ও নির্ভুল বিবরণ। তিনি মোট ৩টি রির্পোট ইংরেজ সরকারের নিকট পেশ করেন। এর মধ্যে ১৮৩৫ সালের জুলাই মাসে ১ম যে রির্পোট পেশ করেন তাতে তিনি দেখিয়েছেন মুসলিম আমলে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ স্কুল ছিল। প্রতি ৪০০ জনের জন্য গড়ে একটি স্কুল ও প্রায় প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি করে স্কুল ছিল (রব, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯)। লর্ড মেকলে বলে গেছেন বাংলাদেশে ৮০ হাজার বিদ্যালয় ছিল (বেগম, ২০০১, পৃ. ২৩)। এই সব রির্পোট ও তথ্য থেকে বুঝা যায় তৎকালে বাংলার গ্রামে গ্রামে একটি নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ছিল যা সরকারী সাহায্য ছাড়াই এদেশে কোমলমতি

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার দায়িত্ব বহন করেছিল। যা প্রাক-বৃটিশ যুগে অগ্রসর শিক্ষাব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মুসলিম শাসনামলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একমুখি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। সেখানে ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হতো। যেমনঃ অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি।

বৃটিশ শাসনের শুরুতে সর্বপ্রথম মিশনারীদের হাত ধরে এদেশে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। খৃস্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে শিক্ষা বিস্তার শুরু করেন। মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি খৃস্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো। পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করা হয়। যেটা বর্তমানে আমাদের নিকট আধুনিক শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। বৃটিশদের হাত ধরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই বর্তমান প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বিভক্তি শুরু হয়।

সে সময় বৃটিশদের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসকদের সাহায্যার্থে একটি নতুন শ্রেণি সৃষ্টি করা। ফলে দেশে সীমাবদ্ধ শিক্ষা বিস্তারের ফলে ছোট একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে যারা বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা এদেশে শাসনের নামে লুণ্ঠন, বাণিজ্যের নামে শোষণ চালাতে থাকে। ধ্বংস করে দেয় মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও শাসন কাঠামো (রব, ১৯৯৯, পৃ. ৫০)। এখানে আমরা ধারাবাহিকভাবে বৃটিশ আমলে সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি শিক্ষার ইতিহাস

মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টা

১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর বহু বছর এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি উদাসীন ছিল। ইউরোপের সমসাময়িক রীতি অনুযায়ী বাণিজ্য জাহাজের সাথে মিশনারীদের আগমন ঘটে। নাবিকদের ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রাখা এবং নতুন ভূখণ্ডে খৃস্টানধর্ম প্রচার করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু শিক্ষার প্রসার ছাড়া ধর্ম প্রচার সম্ভব নয়। তাই তারা কোথাও চেষ্টা করেছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধর্ম প্রচার করতে, আবার কোথাও ধর্মান্তরিতদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ১১)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পূর্বেই ধর্ম প্রচার ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে মিশনারীরা কলকাতা ও এর আশেপাশে অনেকগুলো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশনারীরা প্রথম দিকে দেশজ শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করেননি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর তারা ক্রমশ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগিজরা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্তুগিজ মিশনারীরা অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার বিষয় ছিল- ল্যাটিন ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সঙ্গীত ইত্যাদি (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ১৩)। মিশনারী স্কুলগুলোতে খৃস্টান ছাত্রদের পাশাপাশি অখৃস্টান ছাত্ররাও পড়ার সুযোগ পেত। পাদ্রীরা বিনামূল্যে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বই-পুস্তক দিয়ে অখৃস্টান ছাত্রদের প্রভাবিত ও প্রলোভিত করত (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ১৪)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করলে মিশনারীরা ধর্ম প্রচারে বাধা প্রাপ্ত হয়।

বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রসারে কোন বাধার সম্মুখীন হননি।

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক সর্বপ্রথম এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী ভাষা শিক্ষা, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বই লিখে ছাপার ব্যবস্থা করা হয় (ঢালী, ২০১৩, পৃ. ১০৭)। ১৯১৭ সালে ফ্রেজার কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র বাংলা-ভারত-পাকিস্তানে মিশনারী পরিচালিত ১০৪৬১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ৯২৫৯ টি প্রাথমিক স্কুল, ৪২ টি কলেজ, ৪৮৩ টি মাধ্যমিক স্কুল, ৭৫ টি ট্রেনিং স্কুল ও ২২২ টি অন্যান্য স্কুল। আবার ১৯৩৬-৩৭ সালে গৃহীত তথ্যানুযায়ী মিশনারী পরিচালিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ১৪৩৪১ টি (মোমিন উল্লাহ, ১৯৮০, পৃ. ৩৬৩)।

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

১২ আগস্ট ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করলেও মুসলমানদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু মুসলমানদের উপর নানান ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন শুরু হয়। যার ফলে মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনে বেসরকারি উদ্যোগে যে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল তা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এ অবস্থায় এক সময় রাজকার্য সম্পাদনের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব হতে পারে ভেবে বিচক্ষণ ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দেশের প্রশাসনিক এবং বিচারব্যবস্থার সার্বিক প্রয়োজনে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে "কলকাতা আলিয়া মাদরাসা" প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদরাসার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয় শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী ও নিযামিয়ার প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের শিষ্য "মোল্লা মাজদুদ্দীনকে"। জনসাধারণের কাছে তিনি মৌলভী মদন নামে পরিচিত ছিলেন (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ৩৪)। কলকাতা আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস এর ৭ জুন ১৭৮১ খ্রি. বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর কাছে প্রদত্ত একটি বিবরণ সংরক্ষিত আছে। বিবরণটি নিম্নরূপ:

> "১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং আমাকে অনুরোধ করে যে, প্রেসিডেন্সীতে মোল্লা মাজদুদ্দীন নামক জনৈক ব্যক্তিকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রাখিবার জন্য আমি যেন সচেষ্ট হই, যাহাতে এখানকার মুসলমান ছাত্ররা প্রচলিত ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এই প্রতিনিধি দল আমাকে অবহিত করে যে, এই ব্যক্তি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ বুৎপত্তি সম্পন্ন এই ধরনের গুণীলোক সচরাচর পাওয়া যায় না" (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ৩৫)।

১৭৮০ সালে মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর ১৭৯০ সাল পর্যন্ত ১০ বছর কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় দরসে নিযামিয়ার পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর যেতে না যেতেই ১৭৯১ সালে মাদরাসা পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে মোল্লা মাজদুদ্দীনকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে ইংরেজ অধ্যক্ষ নিয়োগ দেওয়া হয় এবং দরসে নিযামিয়ার শিক্ষাধারা পরিবর্তন করে মাদরাসার পাঠ্যসূচি থেকে তাফসীর ও হাদিস বাদ দেওয়া হয়। এতে ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

পরবর্তীতে ১১৮ বছর পর ১৯০৮ সালে কলকাতা মাদরাসায় তাফসীর ও হাদিস চালু করা হয় এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে “টাইটেল” নাম দেয়া হয় (সাত্তার, ১৯৮০, পৃ. ৪৩)। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ১৪৭ বছর পর ১৯২৭ সালে প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ হিসাবে শামসুল উলামা কামাল উদ্দীন আহমদকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যক্ষ ড. স্প্রেন্টার হতে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন পর্যন্ত মোট ২৫ জন ইংরেজ অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেন (আলম, ২০০২, পৃ. ০৪)। লক্ষ্ণৌর অধিবাসী দরসে নিযামিয়ার প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীন ছাহালুভীর শিষ্য মোল্লা মাজদুদ্দীন কলকাতা মাদরসায় তাঁরই উস্তাদ প্রণীত শিক্ষাক্রম-ই চালু করেন। যেটি তৎকালে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঠ্যসূচি হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল। এই সিলেবাসের কতিপয় অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল:

১. প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত দু-একটি পুস্তক।
২. প্রত্যেক বিষয়ের অত্যন্ত সুলিখিত এবং অনবদ্য একটি পুস্তক।
৩. তর্কশাস্ত্র (মানতিক) এবং দর্শনশাস্ত্র (ফালসাফা) এর প্রাধান্য।
৪. হাদিস গ্রন্থগুলোর মধ্যে কেবল মিশকাত শরীফ।
৫. সাহিত্য পুস্তকের স্বল্পতা।

একজন মধ্যম মানের মেধাবী শিক্ষার্থী মাত্র ষোল-সতের বছরের মধ্যে এ সিলেবাস শেষ করে ফেলতে পারে।

নিম্নে মোল্লা মাজদুদ্দীন প্রণীত কলকাতা আলিয়া মাদরাসার সিলেবাস উল্লেখ করা হলো:
১. সরফ: মিযান মুনশাঈব, সরফ-ই-মীর, পাঞ্জেগঞ্জ, যুবদা, ফুসুলে আকবরী ও শাফিয়া।
২. নাহু: নাহুমীর, শরহে মিয়াতে আমিল, হেদায়াতুন নাহু, কাফিয়া ও শরহে জামী।
৩. মানতিক: ছোগরা, কোবরা, ইসাগুযি, শরহে তাহযীব, কিবতী মা’মীর ও সুল্লামুল উলূম।
৪. হিকমত: মায়বুযী, শামছে বাজেগা, ছদরা।
৫. অংক: খোলাসাতুল হিসাব, তাহরিকে আকলিদাস (মাকালায়ে উলা), তাশরিহুল আখলাক, রেসালায়ে কুশজিয়া ও শরহে চগমুনী (১)।
৬. বালাগাত: মুখতাসারুল মা’আনী, মোতাওয়্যাল।
৭. ফিকহ: শরহে বেকায়া, হেদায়া (আখিরাইন) ও আওয়ালাইন।
৮. উসূলে ফিকহ: নূরুল আনওয়ার, তাওজীহ, তালবীহ ও মুছাল্লামুছ ছুবূত।
৯. কালাম: শরহে আকাইদুন নাসাফী, শরহে আকাইদে জালালী, মীর জাহেদ ও মীর মাওয়াকিফ।
১০. তাফসীর: জালালাইন ও বায়জাবী।
১১. হাদিস: মিশকাত (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ৪৬-৪৭)।

১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস এর প্রাথমিক নির্দেশে শিয়ালদা রেল স্টেশনের পাশে ভাড়া বাড়িতে কলকাতা আলিয়া মাদরাসার কার্যক্রম শুরু হলেও মোল্লা মাজদুদ্দীনের কর্মতৎপরতা ও আগ্রহ দেখে ওয়ারেন হেস্টিংস নিজস্ব তহবিল থেকে বৌদ্ধ পুকুর নামক স্থানে একখণ্ড জমি ক্রয় করে মাদরাসার জন্য একটি ভবন নির্মাণ করে মাদরাসার স্থায়ী রূপ দান করেন।

প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিমাসে ছয় টাকা থেকে পনের টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হতো। তাছাড়া ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের সময় খরচাদির জন্যও গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন ছিল (সাত্তার, ২০১৫, পৃ. ৫০)। কিন্তু এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাদের রাজকার্যের কিছু কর্মচারী তৈরী করা।

লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন ইংরেজরা দেখেন যে দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ সম্পত্তি খাজনাবিহীন এবং সেই সম্পত্তিগুলোর আয় দিয়ে মুসলমানদের মসজিদ, মাদরাসা, মক্তবসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় একটা স্থায়ী পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। এছাড়া ১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকার সকল লাখেরাজ সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে এগুলোর সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অজুহাতে সকল নিষ্কর জমির দানপত্রের উপযুক্ত প্রমাণ দাখিলের জন্য এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের অধিকাংশই এ সকল দানপত্র যথাসময়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ইংরেজ সরকার নানা আইন প্রবর্তন, বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন মিথ্যা মামলা সাজিয়ে, মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত একের পর এক লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ২২)। ফলে মুসলমানদের প্রায় জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে যায়। কোম্পানী সরকারের এই ষড়যন্ত্রের ফলে অগনিত মাদ্রাসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কেননা প্রধানত ঐ সকল নিস্কন্টক জমির আয়ের উপর ভিত্তি করে মাদ্রাসাসমূহ পরিচালিত হত (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ৪২৩)

ভারতের প্রথম শিক্ষানীতি ঘোষণা

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে বৃটিশ পার্লামেন্টের একটি অ্যাক্ট অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে শিক্ষা বিস্তারে ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোম্পানীর ডিরেক্টরবৃন্দ ৩ জুন ১৮১৪ সালে গভর্নর জেনারেলকে ভারতের শিক্ষা খাতে উক্ত ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই নির্দেশনায় স্বভাবতই মুসলমানদের শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ করার কোন উল্লেখ ছিল না। মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজদের এই উদাসীনতা ইচ্ছাকৃত। কেননা তারা স্থানীয় মুসলমানদের তাদের শত্রু মনে করত এবং স্থানীয় হিন্দুদের তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী মনে করত। ১৮১৩ সালের সনদ আইনে অস্পষ্টতার কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন সহজসাধ্য হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার বীজ বপিত হয়।

তৎকালীন বৃটিশ ভারতে যে সকল বৃটিশ কর্মকর্তা শিক্ষার সাথে জড়িত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে অকেজো, প্রাণহীন ও অচল বলে মনে করতেন এবং এ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতেন। এদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

বাতিল করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ফলে ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিংক ও তার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হবে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং এ লক্ষ্যে সরকারি শিক্ষা বাজেটের সব টাকা খরচ করতে হবে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্যেই (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫)। ফলে ১৮৩৫ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করে আইন পাশ করা হয় এবং ১৮৩৭ সালে ১ এপ্রিল থেকে সরকারীভাবে ইংরেজির ব্যবহার শুরু হয়।

আর ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই উপমহাদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে মর্যাদা প্রদান করা হয় (সাত্তার, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ৭৪)। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজদের এ নীতি এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষত ইসলামি শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মন মানসিকতার পরিবর্তন ও বিপ্লবী চেতনা দমন। আর এ ক্ষেত্রে ইংরেজরা যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে মনে হয়।

১৮৩৫ সালে পাক ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ প্রবর্তিত ১ম শিক্ষানীতির পর্যালোচনা

- এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে Down Filtaration Theory বা নিম্নগামী পরিস্রবন নীতি বা চুঁইয়ে নামা নীতি অবলম্বন করা হয় তাতে এদেশের মুষ্টিমেয় কতিপয় অভিজাত ব্যক্তিদের শিক্ষিত করার মাধ্যমে ইংরেজদের অনুগত দাস তৈরী করা হয়। যার ফলে এদেশের অধিকাংশ জনগণ শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়।
- এদেশের আপামর জনসাধারণের ঐতিহ্যে লালিত ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাতে হিন্দুরা মেনে নিলেও মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজি ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি সব দিক দিয়ে অধঃপতিত হয়।
- ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষার অভাবে এদেশের সমাজে অত্যাচার অনাচার চরম আকারে পৌঁছে।
- "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" এ সত্যটি ইংরেজরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তাই তারা মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে মুসলমানরা যাতে আর কখনো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে ব্যবস্থা করেছে।
- বৃটিশ (Divide and Rule) "ভাগ কর শাসন কর" নীতি আশ্চর্যজনক ও সার্থকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সেক্যুলার ও ধর্মভিত্তিক দুইভাগে বিভক্ত করা ছাড়াও বাংলার ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে খন্ড বিখন্ড করেছে। এ শিক্ষানীতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র।
- এ শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সাহায্য বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়। এ দেশের ভাষাগুলোও অবহেলিত হয়। এ পর্যন্ত দেশীয় ভাষার যে উন্নয়ন শুরু হয়েছিল তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

- এ শিক্ষাব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে লর্ড মেকলে নিজেই মন্তব্য করেন যে, “আমরা এমন সব পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকি (বোর্ড কর্তৃপক্ষ) উহার মূল্য যেমন কম তেমনি কাজও অত্যন্ত বাজে আর আমরা কৃত্রিম ও মিথ্যা অনুপ্রেরণা, মিথ্যা ইতিহাস, অবান্তর বিজ্ঞান, অকেজো দর্শন এবং ভ্রষ্ঠ মতবাদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি” (সাত্তার, ২০১৫,পৃষ্ঠা. ৭৪)। ফলে ভারতে এক হযবরল শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। যা জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে কোন ভূমিকাই রাখেনি। বরং যুগ যুগ ধরে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ রেখেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

বৃটিশ সরকার প্রথমবারের মত ১৮৫৪ সালে উড ডেসপ্যাচের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই ডেচপ্যাচে বিদ্যমান দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের জন্য বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে গ্রান্ট-ইন-এইড এর ব্যবস্থা ছিল: শর্তগুলো হলো-

১. স্কুলগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রদান করবে।

২. স্কুলগুলোর জন্য স্থানীয় উত্তম পরিচালন ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্কুলগুলো সরকারি পরিদর্শন ও সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি মেনে চলবে এবং

৪. স্কুলগুলো সচ্ছলভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কিছু কিছু বেতন আদায় করবে (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৯)।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী চক্রান্ত। আজও এদেশে এর প্রভাব লক্ষণীয়।

ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন-১৮৮২ খ্রি.

পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো হান্টার কমিশন। লর্ড রিপনের নির্দেশে ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এদেশের শিক্ষার অগ্রগতি ও শিক্ষানীতি নির্ধারণের জন্য স্যার উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে এ কমিশন গঠন করেন। সভাপতির নামানুসারে এ কমিশন হান্টার কমিশন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এ কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন ধারা, ধরণ ও স্তরভিত্তিক বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করেন। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, বিশেষ শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি। নিচে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

ধর্মশিক্ষা: ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে কমিশন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের সুপারিশ করে। সরকারি স্কুল ও কলেজে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করতো সেখানেই সরকারি অনুদান মঞ্জুর করা হতো। তবে নৈতিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করার জন্য কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়:

ক. সকল ধর্মের সাধারণ নীতির ওপর পাঠ্যপুস্তক রচনার পরামর্শ দেয়া হয়।

খ. প্রতিটি কলেজে নাগরিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অন্তত একজন অধ্যাপক নিয়োগের সুপারিশ করা হয় (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৯৫-৯৬)।

মুসলিম শিক্ষা উপদেষ্টা (হর্নেল কমিটি)-১৯১৪-১৯১৫ খ্রি.

১৯১৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় যেটি হর্নেল কমিটি নামে পরিচিত। এ কমিটি মুসলমানদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারের নিকট যেসব প্রস্তাব পেশ করেন তা হলো:

১. জেলা বোর্ডের শিক্ষা কমিটি, অর্থ কমিটি এবং শিক্ষা পরিদর্শক বিভাগে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের নৈতিক ও ধর্মশিক্ষা প্রদান

৩. ধর্মশিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা

৪. বিদ্যালয়ে পাঠদানকালীন সময়ে প্রতি শুক্রবারে এক ঘন্টা এবং সপ্তাহের অন্য দিনে ১/২ ঘন্টা করে প্রার্থনার জন্য বিরতি

৫. পাঠ্যপুস্তক কমিটিতে প্রয়োজনীয় হারে মুসলিম সদস্য সংযুক্তকরণ

৬. মুসলিম লেখকদের রচিত বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে প্রচলন

৭. সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ

৮. যে সকল অঞ্চলে মাতৃভাষা বাংলা সেখানে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান এবং যেখানে উর্দু মাতৃভাষা (যেমন, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে) হিসেবে প্রচলিত সেসব স্থানে উর্দুর মাধ্যমে শিক্ষাদান। তবে কুরআন অধ্যয়নের সুবিধার্থে উর্দু ভাষায় প্রাথমিক ধর্ম তত্ত্বগুলো সাধারণভাবে সকল বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করা (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ১৫৪)। বাংলা সরকার মুসলমানদের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হর্নেল কমিটির সুপারিশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন এবং অধিকাংশই বাস্তবায়ন করেন।

মুসলিম এডুকেশন এডভাইজারি (মোমিন) কমিটি (১৯৩১-৩৪ খ্রি.)

বাংলার জনগণের উন্নতি সাধনকল্পে কি নীতি অবলম্বন করা যায় এ সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ করার জন্য ১৯৩১ খ্রি. এর ৩ ফেব্রুয়ারি খান বাহাদুর মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল মোমিনের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি মোমিন কমিটি হিসেবে পরিচিত। এ কমিটি মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে যেসকল সুপারিশ পেশ করেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ:

১. হিন্দু-মুসলিম মিশ্রিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষক থাকবে সেখানে অবশ্যই একজন মুসলিম থাকবে।

২. যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষুন্ন হতে পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন কোন ধর্মীয় প্রতীকের প্রদর্শন বা ধ্বনির ব্যবহার বন্ধের জন্য বিধি প্রণয়ন করা উচিত।

৩. প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য আরও উপযোগী করে তোলা এবং প্রতি বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪. স্থানীয় সংস্থার শিক্ষা কমিটিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতাভুক্ত স্কুলসমূহে মুসলিম সমাজের যথাযথ প্রতিনিধি থাকা উচিত।

৫. মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ছাত্ররা মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে ওঠে।

৬. জেলা স্কুল বোর্ডের অন্তত অর্ধেক সদস্য মুসলমান থাকা উচিত (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ১৭০)। সরকার মোমেন কমিটির বিবরণ ও সুপারিশ বিশেষভাবে বিবেচনা করে এবং ঐ রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশ করে। কমিটির প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একজন বিশেষ শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

বৃটিশ বাংলায় সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষা অর্ন্তভুক্তকরণ

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি সরকার গঠন করলে এ.কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পান। সারা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় এক নব জাগরণ শুরু হয়। তিনি মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য মক্তবগুলোকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তরের উদ্যোগ নেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বেশ কিছু মক্তবকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজান। ১৯৩৮ সালে প্রাথমিকের নতুন পাঠ্যসূচি প্রকাশ করেন। এতে সকল ধর্মের শিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অর্ন্তভুক্ত করা হয় (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ১৭৪)।

১ জানুয়ারি ১৯৪১ সালে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয় (মাসুম, ২০০৮, পৃ. ১৭৭)। ফলে মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আর কোন বৈষম্য থাকল না। মুসলমানদের দাবির মুখে আধুনিক পাঠ্যসূচির পাশাপাশি ধর্মীয়শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। দীর্ঘ বৃটিশ শাসনামলে প্রথমবারের মত পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয়শিক্ষা অর্ন্তভুক্ত হয়। মুসলিম প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের জন্য ফজলুল হক সরকার মুসলমানদের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন।

পাকিস্তান আমলে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত বৃটিশ শাসনের কবল থেকে স্বাধীন হয়ে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। তখন পাকিস্তান সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের জন্য সত্যিকার অর্থে একটি আদর্শ ইসলামি প্রজাতন্ত্র তৈরী করা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) মুসলমানরা আশান্বিত হয়। মুসলমানরা প্রত্যাশা করেছিল নতুন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে তাদের হারানো ঐতিহ্য ও শৌর্য ফিরে আসবে। আর এ লক্ষ্যে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ ২৫ বছর পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তারা এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়।

ফলে দেশের নাম ও শাসক পরিবর্তন হলেও এদেশের পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ প্রায় সব কিছুতেই বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থার একটি ছাপ থেকে গিয়েছিল। পাকিস্তান শাসনামলে শিক্ষাব্যবস্থার কোন সংস্কারই জাতীর আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঐতিহ্যের পরিপূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। যে

কারণে দীর্ঘ ২৫ বছরের অসামঞ্জস্য শিক্ষাব্যবস্থা ও পশ্চিম পকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শীতার ফলে “জয় বাংলা” ও “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” শ্লোগানে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে পাকিস্তান (পশ্চিম পাকিস্তান) ও বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) নাম ধারণ করে। এ সময় গঠিত কমিশনগুলো ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে যেসব সুপারিশ ও মন্তব্য সরকারের কাছে পেশ করেছিল সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

শিক্ষা বিস্তারে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বৃটিশ অপশাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে করাচীতে একটি শিক্ষা অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এতে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশনে ইংরেজদের প্রবর্তিত ত্রুটিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংগতি রেখে একটি সময়োপযোগী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। অর্থের সংকুলান হলে পর্যায়ক্রমে আট বছর করা হবে।

২. শিক্ষার মাধ্যম কি হবে তা নির্ধারণ করবে প্রাদেশিক সরকার।

৩. মুসলমান ছেলে মেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪. অমুসলিম ছেলে মেয়েদের জন্য তাদের চাহিদা অনুসারে ধর্মশিক্ষা চালু করতে।

৫. মাদ্রাসাগুলোকে সংস্কারপূর্বক প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গতিধারায় চালু করতে হবে (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ২৫০)।

শিক্ষাক্রম

১৯৫২ সালে একটি সংশোধিত পাঁচ বছরের কোর্স সম্বলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন সংশোধিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি চালু করা হয়। উক্ত শিক্ষাক্রমে অর্ন্তভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

১. মাতৃভাষা
২. গণিত
৩. সমাজপাঠ (ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি)
৪. প্রাথমিক বিজ্ঞান
৫. কলা ও হস্তশিল্প
৬. শারীরবিদ্যা
৭. খেলাধুলা ও সংগীত
৮. ধর্মশিক্ষা
৯. উর্দু (চতুর্থ শ্রেণি হতে) (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩)।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-১৯৫৯ খ্রি. (এস.এম. শরীফ কমিশন) (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৩০২-৩০৪)

পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষার সুসংবদ্ধ ও সুষম উন্নয়নের স্বার্থে উপনিবেশিক আমলের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনে ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সচিব এস.এম শরীফকে এ কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ কমিশন শরীফ কমিশন নামে

পরিচিত। ৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ সালে ১১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশনের কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। তিনি আধুনিক সুযোগ সুবিধার সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করার আহ্বান জানান। এ কমিশনের অনেকগুলো লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যেমন-

১. সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা বর্তমান থাকতে হবে।

২. শিক্ষাব্যবস্থাকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সংহতি ও শক্তি ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং ইসলামিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এই কমিশন দীর্ঘদিন ধরে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রশ্নমালা প্রেরণের মাধ্যমে বহুসংখ্যক শিক্ষাবিদ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসার, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করেন। উক্ত পরামর্শগুলোর ব্যাপক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে সরকারের নিকট একটি রির্পোট পেশ করেন। সাধারণ শিক্ষাধারায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শরীফ কমিশনের সুপারিশসমূহ:

১. প্রথম শ্রেণি হতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা মুসলমান ছাত্রদের জন্য আবশ্যক করা হয়। যার সিলেবাস হলো:

ক. সকল ছাত্র পবিত্র কুরআন শরীফ পাঠ করা শিখবে।

খ. কালিমা, নামাজে ব্যবহৃত সুরাসমূহ শিক্ষা করাসহ আরো কিছু আয়াত মুখস্থ করা সকল মুসলিম ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়।

গ. আকর্ষণীয় ও সহজ সরল ভাষায় পবিত্র কুরআন মজিদ, মুহাম্মদ (স) এর জীবনী, ইসলামের ইতিহাস, শিক্ষা ও সাহিত্য হতে গৃহীত উপাখ্যান ও উপদেশপূর্ণ গল্প ইসলামিয়াত সম্পর্কিত বিষয়াদী পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হবে।

ঘ. পবিত্র কুরআনের সামাজিক সৎকর্ম ও সাধুতা বিষয়ক আয়াতসমূহ অর্থসহ পাঠ্যভুক্ত করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

২. নবম-দশম শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করে ঐচ্ছিক হিসাবে রাখা হয়।

৩. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের অবশ্যই ইসলামিয়াত পাঠদানের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেনিং এ ইসলামিয়াত অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

৪. একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ধর্মীয় শিক্ষা ইসলামিক স্টাডিজ এর অঙ্গীভূত হবে এবং তা ঐচ্ছিক হিসাবে থাকবে।

৫. ইসলামকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সহকারে বিশ্লেষণের যোগ্যতা অর্জন ও আধুনিক জীবনের সমস্যা সমাধানে যথাযথ ইসলামি জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে।

৬. শিক্ষার্থীদের কুরআন মজিদ, হাদিস, ইসলামি আইন, মুসলিম ইতিহাস ও দর্শন সিলেবাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শিক্ষা দিতে হবে।

৭. প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

৮. এ দেশের বেশিরভাগ জনগণই মুসলমান। এ কারণে ইসলামধর্ম শিক্ষা এদেশে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তাই পাকিস্তানকে তার বিবেক ও আত্মার কাছে পরিচ্ছন্ন থাকতে হলে তাকে ইসলাম এবং ইসলামি নীতি ও আদর্শকে প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

উল্লেখ্য অন্যান্য কমিশনের মতোই শরীফ কমিশনের মাত্র কয়েকটি সুপারিশ বাস্তবায়ন হলেও বেশিরভাগ সুপারিশ আলোর মুখ দেখেনি। তবে এটা বলা যায় যে জ্ঞানের ইসলামীকরণে শরীফ কমিশন অন্যান্য কমিশনের তুলনায় বেশি ভূমিকা রেখেছে।

পাকিস্তানের নতুন শিক্ষানীতি-১৯৬৯ খ্রি. (এয়ার মার্শাল এম. নূর খান কমিশন) (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৩২৯)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষার উন্নয়নে যত কমিটি, কমিশন গঠন করা হয়েছে সবগুলোই জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। বেকারত্বের হারও বেড়েছে বহুগুণে। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে জনমনে নানা ধরনের অশান্তি বিরাজ করছে। তাই এ অবস্থার উন্নয়নে ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এম. নূর খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি নিউ এডুকেশন পলিসি বা নূর খান শিক্ষা কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশন ইসলামের ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সকলের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশমালা পেশ করেন। ইসলামি শিক্ষার ব্যাপারে যেসব সুপারিশ পেশ করেন তা হলো:

১. মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং তা হবে ইসলামি ভাবধারার চাহিদার আলোকে।

২. সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামিক স্টাডিজ বাধ্যতামূলক থাকবে। পরবর্তী স্তরগুলোতে ঐচ্ছিক হিসাবে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামি বিষয়ে গবেষণার সুযোগ তৈরী করতে হবে।

৩. সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে মাদরাসা শিক্ষা অঙ্গীভূত হবে এবং এর সর্বস্তরের সাথে সাধারণ শিক্ষার স্তরভিত্তিক সমতা বিধান করতে হবে। যাতে মাদরাসা শিক্ষিতরা সাধারণ শিক্ষিতদের মতো সমসুযোগ সুবিধা ও চাকুরী লাভের সুযোগ পায়।

ইসলামি শিক্ষায় এ কয়েকটি সুপারিশ ছাড়া নূর খান কমিশনের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান বা সুপারিশ ইসলামের পক্ষে ছিলনা। বস্তুত ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান তৈরীর কোন পদক্ষেপ এই শিক্ষানীতিতেও নেয়া হয়নি। আর পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পাকিস্তান আমল থেকেই ইসলাম বিরোধীদের কূটকৌশল সমর্থনে সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। আর ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক সংস্কার কাগজে কলমেই রয়ে যায়।

পাকিস্তান সরকারের নতুন কমিটি শিক্ষানীতি-১৯৭০ খ্রি. (শামসুল হক কমিটি)

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা নিরসন, শিক্ষার্থীদের সমস্যা দূরীকরণ ও জাতীয় চাহিদার আলোকে শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক বিষয়ে নিবিড় পর্যালোচনার লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে জনাব শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের সুপারিশের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ পেশ করেন।

সুপারিশমালা (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৩৪১-৪২)

১. ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের চাহিদা অনুসারে পুনর্বিন্যাস করা দরকার, যাতে ইসলামের শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের মাঝে এমনভাবে প্রতিফলিত করতে হবে যাতে তা অনুপ্রেরণার উৎস ও চালিকা শক্তি হিসেবে দেশের একতা, সংহতি ও উন্নতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেজন্য যথাযোগ্য একটি কারিকুলাম কমিটি গঠন করা দরকার যার তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম তৈরি করা যায়। অন্যান্য ধর্মের শিক্ষার্থীরা যেন স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

২. উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিষয়ের বুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করে।

৩. নির্বাচিত কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট ফর ইসলামিক স্টাডিজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে পাঠদান, গবেষণা ও প্রকাশনার সুযোগ থাকবে।

এ শিক্ষানীতির সুপারিশমালা পেশ করার পর বাস্তবায়নের সুযোগই পাওয়া যায়নি। কারণ তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব। দেশ বিভাগের পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন গঠিত হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি।

বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৪ বছরের অপশাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে বাংলাদেশের জনগণ। ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে শুরু হওয়া এক অসম যুদ্ধ চলে দীর্ঘ নয় মাস। এই নয় মাসে বাঙালী জাতি তার সর্বস্ব দিয়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনে। বাংলার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার অমীয় সুধা পান করে। সদ্য স্বাধীন দেশটি ছিল ধ্বংসস্তুপ সদৃশ। পাকিস্তানীরা সব কিছু শেষ করে দিয়ে যায়। দেশ পুনর্গঠনে নেমে পড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নিলেন শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৭২ খ্রি. (কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন)

১৯৭২ সালের ২৫ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে এক প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনী বক্তব্যে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, দেশের সীমিত সম্পদের কথা বিবেচনায় রেখে কমিশন শিক্ষার এমন এক দীর্ঘ মেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করবেন যা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক ও সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনে সাহায্য করবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ খুদাকে এ কমিশনের সভাপতি করা হয়। সভাপতির নামানুসারে এটি "কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন" নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে রদবদলসহ পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন মিলে ২৩ জন সদস্য এ কমিশনের জন্য নিবেদিত ছিলেন। এ শিক্ষা কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সংবিধানের চার মূলনীতির আলোকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা।

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এ চার মূলনীতিসহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, বিজ্ঞানমনস্ক জাতিগঠন ও মানবতাবাদী এক বিশ্বনাগরিক তৈরির অঙ্গীকার ছিল এ শিক্ষাব্যবস্থার। এ লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলী চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানাবিধ সংস্থা, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও পেশাজীবী ও প্রশাসকগণের নিকট প্রশ্নমালা প্রেরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মতামতগুলো ব্যাপক বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের স্মারকলিপি, নিবন্ধ ও সমালোচনাও রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়। এছাড়া ভারত সরকারের আমন্ত্রণে কমিশনের সভাপতির নেতৃত্বে কমিশনের সদস্যরা ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে মাসব্যাপী ভারত সফর করেন। এ সফরে তাঁরা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দীর্ঘ প্রায় ২ বছর পর্যালোচনা করার পর জাতীয় শিক্ষা পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে কমিশন সুচিন্তিত সুপারিশমালা ৩০ মে ১৯৭৪ সালে রিপোর্ট আকারে সরকারের কাছে পেশ করেন।

এ কমিশনের সুপারিশগুলো শিক্ষাব্যবস্থার গতিশীলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও এ কমিশনে ধর্মশিক্ষা তথা ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। যেমন-সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক শাখায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে ললিতকলা প্রাধান্য পেয়েছে সর্বস্তরে। উচ্চ মাধ্যমিক শাখায়ও ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে।

এছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্‌রাসা শিক্ষার কোন আলোচনা-ই স্থান পায়নি। মাদ্‌রাসা শিক্ষা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মতামতও পেশ করেনি। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা শিক্ষা কমিশনের কোন অংশেই ফুটে উঠেনি। বরং শিল্পকলা চর্চা ও উৎকর্ষতার নামে অশ্লীল রুচি ও অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনী ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে সচেতন অভিভাবকদের মাঝে অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলমানদের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে টোল শিক্ষার সাথে তুলনা করে খাটো করা হয়েছে। মাদ্‌রাসা শিক্ষা শিশু শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা হলেও এ কমিশনে সুকৌশলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে (আলমগীর, ২০০৬, পৃ. ২৫৪)। সুতরাং দেশীয় আচার, জাতীয় আদর্শ ও সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট-১৯৭৬ খ্রি.

স্বাধীনতার অব্যাবহিত পরে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও সামগ্রিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৭৪ সালে কুদরত-এ-খুদা কমিশন শিক্ষার যে সুপারিশ পেশ করেন তা পুংখানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপযুক্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কার্যক্রম শুরু করেন। দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন স্তর ও বিষয়ের নির্বাচিত ১০টি উপ-কমিটি ও ২৭টি বিষয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২১০০ পৃষ্ঠার ৭ খণ্ডের দীর্ঘ রিপোর্ট পেশ করেন। সরকারও সেগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিটির সুপারিশ উল্লেখ করা হলোঃ

সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক শাখায় মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, পরিবেশ শিক্ষা, ইংরেজি, মিউজিক, শারীরিক শিক্ষা, আর্টস এণ্ড ক্রাফট্স এর পাশাপাশি আবশ্যিক হিসেবে ধর্মশিক্ষা রাখা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ডে ১.৩০ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের ১০ শতাংশ। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ডে ১.৭৫ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের ৮.৮৬ শতাংশ (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭৭)। সাধারণ শিক্ষার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (৬ষ্ঠ-৮ম) শ্রেণিতে মাতৃভাষা বাংলা, গণিত, ইংরেজি, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক হিসেবে রাখা হয়। সাপ্তাহিক ২ পিরিয়ডে ১.৩০ ঘণ্টা ধর্মশিক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখা হয় যা সাপ্তাহিক মোট পিরিয়ডের মাত্র ৫ শতাংশ (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭৭)।

- সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক শাখায় ইসলাম ধর্মসহ সকল ধর্মীয় বিষয়কে ৭৫ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক বিষয় রাখা হয়। এই ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য সাপ্তাহিক ৩ পিরিয়ড বরাদ্দ রাখা হয়।
- প্রাথমিক থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত ধর্মশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক রাখা হলেও পাঠদানের সময় যথেষ্ট হয়নি। ধর্মের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের মত কমপক্ষে সাপ্তাহিক ৬ পিরিয়ড সময় বরাদ্দ রাখা উচিত ছিলো। আর মাধ্যমিক শাখায় ধর্মশিক্ষাকে ঐচ্ছিক হিসেবে রেখে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন-১৯৮৮ খ্রি. (মফিজ উদ্দীন কমিশন) (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৫১৮-৫২৭)

দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে একটি আধুনিক ও কল্যাণকর শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৮/১০/এস,-৮/৮৬/২৭৬/১৫০ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সভাপতি করা হয় প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন আহমদকে। সভাপতির নামানুসারে এই কমিশন “মফিজ উদ্দীন কমিশন” নামে পরিচিত।

এই কমিশন সুপারিশমালা প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া ইতোপূর্বে বাংলাদেশ আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্টসমূহের সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন সুপারিশ গ্রহণ করা যায় তা বিবেচনার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি ও চিকিৎসাসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ়, সময় উপযোগী উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য সুপারিশমালা পেশ করার জন্য কমিশন কাজ শুরু করে এবং ২৪-০৭-১৯৮৭ সালে রিপোর্ট পেশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কমিশন গঠনের পর ০৯-০৫-১৯৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় একটি স্টিয়ারিং কমিটি, ১২টি অনুধ্যান কমিটি ও দুটি শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে দেশের শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সুধী সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেন। এছাড়া পত্র-পত্রিকা, নিবন্ধ, সমালোচনা ও স্মারক লিপিতে যে মূল্যবান মতামত প্রকাশিত হয় তা সাদরে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এছাড়া ইউনেস্কোর সৌজন্যে শিক্ষা কমিশনের দুই সদস্যের একটি টিম ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন ও জাপান সফর করে সে দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা এ কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

সুপারিশমালা

সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে অর্জিত শিক্ষা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি, কর্ম অভিজ্ঞতা ইত্যাদির পাশাপাশি ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ খ্রি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি বাস্তব গণমুখী ও যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৪/০১/১৯৯৭ইং তারিখে প্রশা-১/বিবিধ:৫/৯৬/১৫৫ নং স্মারকে এক অফিস আদেশ জারি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর এম.শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৪ সালে প্রস্তুতকৃত ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনকে গভীরভাবে পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সেই প্রতিবেদনের প্রস্তাবসমূহকে যুগোপযোগী করে দেশের সর্বপ্রকার ও সর্বস্তরের শিক্ষা সমস্যা চিহ্নিত করে বাস্তবভিত্তিক একটি সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। এ কার্য সম্পাদনের জন্য কমিটিকে ৩০ এপ্রিল ১৯৯৭ পর্যন্ত সময় বেধে দেয়া হয়। কমিটির লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও কাজের সুবিধার জন্য ১৯টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সাব-কমিটিগুলোর মধ্যে একটি ছিল ৬ সদস্যের ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সাব-কমিটি। এ সাব-কমিটি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা অংশে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। যা নিম্নরূপ (আলী, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮৪):

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিকতার প্রয়োগের মানসিকতা ও চরিত্র গঠন। বর্তমানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্মীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশমালা:

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৩. সালাত, সাওম, যাকাত ও হজের তাৎপর্য বর্ণনাসহ যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু কেন্দ্র করে প্রত্যেক শ্রেণির প্রান্তিক যোগ্যতা চিহ্নিত করতে হবে।

সাধারণ শিক্ষাধারায় ৩য় শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাই এ কমিটিতে ধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজন মনে করেন।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন-২০০৩ (মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন)

২০০২ সালের ২১ অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি-১৯৯৭ এর উপর বিবিধ পর্যালোচনা ও সুপারিশকে ভিত্তি করে দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাবলি চিহ্নিত করে এর উন্নতিকল্পে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়াকে কমিশন গঠনের বিষয়ে জানানো হয়। চেয়ারম্যানসহ এ কমিশনের সদস্য ছিল মোট ২৫ জন। কমিশনের পরবর্তী সভায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও কমিটির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১২টি উপকমিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে কমিশনের সদস্যদের ৩০টি মূলনীতি সম্বলিত পরামর্শমালা বিতরণ করা হয়। এ নীতিগুলো কমিশনের সভায় আলোচিত হয় এবং কিছু সংশোধনীসহ গৃহীত হয়।

সাধারণ শিক্ষা ধারার প্রাথমিক স্তরে ইসলামধর্ম শিক্ষা রাখা হলেও অবহেলিত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ও সচেতন করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি ছিল বলে মনে হয়। কেননা-

১. ১ম শ্রেণিতে কেবল বাংলা, ইংরেজি ও গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১ম শ্রেণিতে ইসলামধর্ম শিক্ষা একেবারেই অনুপস্থিত।

২. ২য় শ্রেণিতেও বাংলা, ইংরেজি ও গণিতের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মশিক্ষা রাখা হয়নি। কেবল মৌখিক পাঠদানের কথা বলা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক কোন পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়নি।

৩. ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ বিজ্ঞান, বাংলাদেশ পরিচিতি ইত্যাদির সাথে ইসলাম ধর্মশিক্ষা রাখা হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নে বাংলা, গণিত ইংরেজি ও বাংলাদেশ পরিচিতি বিষয়গুলো রাখা হয়েছে (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৩, পৃ. ৫৪)। এখানে ধর্মশিক্ষার আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন বা পরীক্ষা না থাকায় শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে উঠেছে।

সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ১০০ নম্বরের ইসলাম ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ইসলাম শিক্ষা গুরুত্ব পেলেও প্রাথমিক স্তরে অবহেলিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মনে ইসলাম সম্পর্কে মজবুত ভিত্তি রচনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। সামগ্রিক

বিবেচনায় এ শিক্ষানীতিতে অনেকগুলো যুগান্তকারী প্রস্তাব করা হলেও এর সম্ভাবনা ও বাস্তবায়ন চোখে পড়েনি।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে এ পর্যন্ত এ জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে সর্বমোট ১০টি শিক্ষা কমিশন/ শিক্ষা সংস্কার কমিটি/ অন্তর্বর্তীকালীন টাস্কফোর্স/ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেগুলো আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত সুপারিশ করলেও কার্যত তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে সর্বশেষ হলো জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিম/শাঃ০৪/শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সেল-২/২০০৪/১২১ তারিখ ২৩-১২-১৪১৫ বঙ্গাঃ/০৬-০৪-২০০৯ খ্রি. দ্বারা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে সরকার ১৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এর চেয়ারম্যান করা হয় জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীকে। যিনি পূর্বে কুদরত-এ-খুদা কমিশনেরও সদস্য ছিলেন। এ কমিটি মাত্র চার মাসের মধ্যে একটি খসড়া শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করেন। এই খসড়া শিক্ষানীতি জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এতে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, রাজনীতিবিদ, আলেম-ওলামা, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও সমাজের সকলস্তরের মানুষের মতামত, সুপারিশ ও পরামর্শ বিবেচনা করে খসড়া শিক্ষানীতির আরও সংশোধন ও সংযোজন করে ৩১ মে ২০১০, মন্ত্রীসভায় জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদন করা হয়। অবশেষে ৩ অক্টোবর ২০১০ জাতীয় সংসদে শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর সর্বসাধারণের জন্য তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে পাঠ্যসূচি অধ্যায়ের নম্বর বণ্টন অধ্যায়টি বাদ দেওয়ায় নতুন করে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। কোন বিষয় কত নম্বর পড়ানো হবে তা উল্লেখ না করায় শিক্ষানীতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কারণ পূর্বের সব শিক্ষানীতিতে নম্বর বণ্টন অধ্যায়টি ছিল। এমনকি কোন বিষয়ে সাপ্তাহিক কতটি ক্লাস হবে সেটিও উল্লেখ ছিল।

প্রাক্-কথন, মুখবন্ধ, আঠাশটি অধ্যায় ও দুটি সংযোজনী নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর কলেবর। প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণিত হয়। এতে ৩০টি লক্ষ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। এতে শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের ও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও

রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশমালা পেশ করেন তা নিম্নরূপ:

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

১. প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান।

২. প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

কৌশলসমূহ

ক. ধর্মশিক্ষা অংশে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল কৌশল বর্ণিত হয়েছে তা হলো:

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ, রাসুল (স) ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায় সেভাবে ইসলাম ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে।

২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে।

৩. কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথাযথভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ, সাহস ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

খ. নৈতিক শিক্ষা

নৈতিকতার মৌলিক উৎস ধর্ম। তবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং দেশজ আবহও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে নৈতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে (জাতীয় শিক্ষানীতি-**২০১০,** পৃ. ২০)।

সাধারণ শিক্ষাধারায় প্রাথমিক স্তরের ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১০০ নম্বরের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি, ১ম ও ২য় শ্রেণিতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা রাখা হয়নি। এতে করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা জীবনের শুরুতে ধর্মীয় শিক্ষা না পাওয়ায় ক্রমান্বয়ে ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মাধ্যমিক স্তরে নবম-দশম শ্রেণিতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক আছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। তবে গবেষকের সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে নবম ও দশম শ্রেণিতে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টির ১০০ নম্বরের পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাই ব্যক্তিকে তার চিন্তা-চেতনা, কর্মকাণ্ড ও

আচার-আচরণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সুপথে পরিচালনা করে। ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবই ব্যক্তিকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়। তাই শিক্ষাস্তরের শুরু থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ পর্যালোচনা করে বলা যায় এটি একটি স্তরগত পরিবর্তনশীল শিক্ষানীতি। শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত বৈশিষ্ট্য, মৌলিক নীতি সংক্রান্ত দর্শন ও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন হয়নি। এছাড়া মানবণ্টন ও পাঠ্যসূচি অধ্যায়টি না থাকায় এর কাঠামোগত দিকও অসম্পূর্ণ রয়েছে যায়। আর এসব বিবেচনায় শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গতা নিয়েও যথেষ্ট প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ পূর্বেকার ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশন ও শামসুল হক কমিশন এর প্রতিরূপ বলে মনে হয়। পূর্বের এসব কমিশনে যেহেতু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা গুরুত্ব না পাওয়ায় এ জাতি এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এ জন্য এ শিক্ষানীতিতে অনেক ভালো প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও জাতি স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত বলে মনে হয় না। যদিও সরকার ২৮ জুন ২০১১ সালে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রয়াস চালাচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের আলোকে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যসূচি ও শিখনফল পর্যালোচনা

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের আলোকে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের পাঠ্যসূচি ও শিখনফল পর্যালোচনা

কোন দেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সে দেশের জাতীয় দর্শন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা, ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার। শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিক তৈরি করে। রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সুনাগরিক ও দেশপ্রেমিক জনশক্তিতে পরিণত করে শিক্ষাব্যবস্থা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, শান্তি, প্রগতি নির্ভর করে শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষা মানুষকে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে শেখায়। এছাড়া মৌলিক মানবীয় গুণাবলী (শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, কর্তব্যজ্ঞান, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ব, নৈতিকমূল্যবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সৃজনশীলতা) ইত্যাদির বিকাশ ঘটায় শিক্ষাব্যবস্থা।

আর এ শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি। বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম (৯১.৪%) হিসেবে ৩য় বৃহত্তম দেশ। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাক্রমে/পাঠ্যক্রমে ইসলামধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে শিক্ষানীতিতে বর্ণিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও আদর্শ সুনাগরিক তৈরিতে সক্ষম হচ্ছে না। আদর্শ মানুষ তৈরীতে, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে যথাযথ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান একান্ত প্রয়োজন। ফলে সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিকস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ অধ্যায়ে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যসূচি ও শিখনফল পর্যালোচনা করা হবে।

- **বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান**

  রাষ্ট্র

  ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

  খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

  গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ৫)।

  ২৮. ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

  ১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

  ২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ৮)।

৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ১২)।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, পৃ. ১-২)

শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমেই জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে গণমুখী, সুলভ, সুষম, সর্বজনীন, সুপরিকল্পিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানে সক্ষম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি ও রণকৌশল হিসেবে কাজ করবে। এই আলোকে শিক্ষার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিগত তাগিদ নিম্নরূপঃ

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমনঃ ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবন-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনধর্মী, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণি-বৈষম্য ও নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা। শিক্ষাকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পণ্য হিসেবে ব্যবহার না করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১০. মুখস্তবিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতিস্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

১১. বিশ্বপরিমন্ডলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিষয়ে উচ্চমানের দক্ষতা সৃষ্টি করা।

১২. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১৩. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৪. সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সম-মৌলিক চিন্তাচেতনা গড়ে তোলা এবং জাতির জন্য সম-নাগরিক ভিত্তি সৃষ্ঠির লক্ষে সবধারার শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ। একই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরেও একইভাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে পাঠদান।

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৬. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।

১৭. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যথাযথ মান নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী স্তরে অর্জিত (শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ) জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত দৃঢ় করে পরবর্তী স্তরের সাথে সমন্বয় করা। এগুলো সম্প্রসারণে সহায়তা করা এবং নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা। এই লক্ষ্যে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ অবদান রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা।

১৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৯. সর্বক্ষেত্রে মান-সম্পন্ন উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহী করা এবং মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার সাথে সাথে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।

২০. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেলক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

২১. শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের উপকরণ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।

২২. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলে-মেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

২৪. সব ধরনের প্রতিবন্ধীর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২৫. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৭. বাংলা ভাষা শুদ্ধ ও ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া নিশ্চিত করা।

২৮. শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

২৯. শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩০. মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় জীবনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক। দেশের সব মানুষের শিক্ষার আয়োজন এবং জনসংখ্যাকে দক্ষ করে তোলার ভিত্তিমূল প্রাথমিক শিক্ষা। তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য জাতিসত্তা, আর্থ-সামাজিক, শারীরিক-মানসিক সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকল শিশুর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। একাজ করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। শিক্ষার এই স্তর পরবর্তী সকল স্তরের ভিত্তি সৃষ্টি করে বলে যথাযথ মানসম্পন্ন উপযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার পর অনেকে কর্মজীবন আরম্ভ করে বলে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা তাদের যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান ও বিদ্যালয়ভেদে সুযোগ-সুবিধার প্রকট বৈষম্য, অবকাঠামোগত সমস্যা, স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের দুর্বলতাসহ বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর করে জাতির সার্বিক

শিক্ষার ভিত শক্ত করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের। অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক এবং ভৌগলিক কারণে বর্তমানে শতভাগ শিশুদের প্রাথমিক স্কুলের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না, ২০১০-১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। যে সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেই সকল গ্রামে ন্যূনপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্রুত প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ (জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, পৃ. ৪)

- মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা।
- কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা।
- শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কার মুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা।
- শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা।
- শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখনচাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া।
- সবধরণের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলে মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম

শিক্ষা হলো একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যত সমাজ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার। উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, মানবতা, সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেম ইত্যাদি ভালোগুণের বিকাশ ঘটায়। আর এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম হলো একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ কর্মকুশলীর কাজ। শিক্ষাক্রম ছাড়া শিক্ষাদান কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম (Curriculum) হলো শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখা। একজন শিক্ষার্থী কি পড়বে, কিভাবে পড়বে, শিখন সামগ্রী কীরূপ হবে ইত্যাদি নির্দেশনার সমষ্টিই হলো শিক্ষাক্রম। তাই শিক্ষাক্রমকে শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলা হয়।

শিক্ষাক্রম বা (Curriculum) শব্দটি ল্যাটিন currese শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে (মিয়া, ২০০৪, পৃ. ১)। cursese শব্দটি প্রাচীন রোমে ব্যবহৃত হতো। যার অর্থ Course of study আবার কারো কারো মতে ল্যাটিন শব্দ currer শব্দ থেকে Curriculum শব্দটি এসেছে। যার অর্থ ঘোড়া দৌড়ের পথ। শিক্ষাক্রমের ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে আধুনিক শিক্ষাক্রমের প্রবক্তা (Ralph Tylor) রাফ টেইলার ১৯৪৯ সালে চারটি প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের ধারণাটি স্বচ্ছ করার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নগুলো হলো:

১. শিক্ষা কি কি উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
২. কি কি শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিদ্যালয় ঐ সব উদ্দেশ্য অর্জন করবে?
৩. কিভাবে ঐ সব শিখন অভিজ্ঞতাগুলো সংগঠন ও বিন্যাস করা যাবে?
৪. উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হয়েছে কিনা তা কিভাবে যাচাই করা যাবে? (মিয়া, ২০০৪, পৃ. ৩)

উপরোক্ত প্রশ্নগুলো থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের বিশদ পরিকল্পনার নাম। জাতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য নিরূপিত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিস্তৃত প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মানবিক বিষয়ে সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনই হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে যে সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করতে হবে এর মধ্যে অন্যতম হলো- শিক্ষার্থীর মনে সর্বশক্তিমান

আল্লাহর প্রতি অটল আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা, যেন এই বিশ্বাস তার সমগ্রচিন্তা ও কর্মে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা। ইসলাম এই আকিদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র গঠন এবং নীতিবান মানুষ তৈরি করতে চায় যাতে তারা সমাজের সব ধর্মের মানুষের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এদিকে দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মাধ্যমে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ ও এই যোগ্যতাগুলোর ভিত্তিতে বিস্তৃত শিখনক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। একজন আল্লাহ বিশ্বাসী, নীতিবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে ইমান ও আকিদা, ইবাদত, আখলাক বা নৈতিক গুণাবলি, কুরআন মজিদ সহীহ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করতে পারা ও নবি রাসুলগণের জীবন সম্পর্কে জানা-শীর্ষক পাঁচটি প্রান্তিক যোগ্যতা হলো একজন মানুষের সকল কর্মের উৎস বিশ্বাস (প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা- পৃ. ৩৩৪)।

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণগত উৎসর্ষ সাধন ও নৈতিক মানবিক গুণাবলি সমৃদ্ধ চরিত্র গঠন (প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা- পৃ. ২৪)। কিন্তু কারিকুলামে এ উদ্দেশ্য অর্জনে যে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ দেয়া হয়েছে তাতে বেশকিছু দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তাই এ বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।

প্রান্তিক যোগ্যতা

পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিশুরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা যায় সেগুলোকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা বলা হয়। প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রথম শ্রেণি থেকে এবং তা চলতে থাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তবে কোন কোন প্রান্তিক যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর শুরু ও শেষ হওয়ার পর্যায় ভিন্নতরও হতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার শুরু থেকে শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্জিত যোগ্যতার সমষ্টিই হলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তির যোগ্যতা। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্য থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সাথে **১৬** টি প্রান্তিক যোগ্যতা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের জন্য নির্ধারিত ২৯টি প্রান্তিকযোগ্যতা থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো (প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা- পৃ. ৩৩৫)

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা/সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন, সকল সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত হওয়া।

২. নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তকের আদর্শ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করা।

৩. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৪. মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. স্বাধীন ও মুক্তচিন্তায় উৎসাহিত হওয়া এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করা।

৬. নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ এবং তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

৭. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হওয়া।

৮. বিশেষ-চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের মানসিকতা অর্জন করা।

৯. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে ত্যাগের মনোভাব অর্জন এবং পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা।

১০. সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

১১. প্রতিকূলতা ও দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং তা মোকাবেলায় দক্ষ ও আত্মপ্রত্যয়ী হওয়া।

১২. নিজের কাজ নিজে করা এবং শ্রমের মর্যাদা দেওয়া।

১৩. প্রকৃতি, পরিবেশ ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জানা ও ভালোবাসা এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ত্যাগের মনোভাব গঠন ও দেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

১৫. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১৬. বাংলাদেশকে জানা ও ভালোবাসা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে প্রান্তিক যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হবে তাকে বলা হয় শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে তৃতীয় শ্রেণির জন্য ৪৬টি, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ৬১টি এবং পঞ্চম শ্রেণির জন্য ৫৩টি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিখনফল (Learning Outcomes)

সুনির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার পর শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও স্থায়ী যে পরিবর্তন আসে এবং শিক্ষার্থীর হাতে কলমে

বিষয় বা কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় তাকে শিখনফল বলা হয়। একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা শনাক্ত করা হয় শিখনফলে। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় এটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টির উপায় হিসেবে কাজ করে। শিখনফল শিক্ষার্থীর শিখনকে সহযোগিতা করে যাতে শিক্ষার্থী নিজেই তার চিন্তা ও সাহস দিয়ে শিখন বিষয়কে অনুধাবন করতে পারে।

শিখনফলের গুরুত্ব

প্রতিটি পাঠের কিছু সুনির্দিষ্ট শিখনফল রয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে ভিত্তি করে শিখনফল চিহ্নিত করা হয়। পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করতে পারলেই শিক্ষার্থী শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে। যেহেতু শিখনফলকে ভিত্তি করে লেখা হয়েছে বিষয়বস্তু। সেহেতু শিখন-শেখানো কার্যাবলী শিখনফলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত করতে হবে। অন্যথায় যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হবে। শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা নেওয়ার সময় অবশ্যই উপস্থাপিত পাঠটির শিখনফলসমূহ লিখতে হবে। আর শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালিত হবে কেবল পাঠের নির্ধারিত শিখনফলসমূহ অর্জন করানোর জন্য।

শিখনফলের বৈশিষ্ট্য

- শিখনফল সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে।
- শিক্ষার্থীর আচরণে প্রত্যাশিত পরিবর্তন শিখনফলে উল্লেখ থাকবে।
- এক বা একাধিক শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।
- একটি শিখনফল কেবল এক ধরনের আচরণ নিয়ে গঠিত হবে।
- পরোক্ষ শব্দ পরিহার করতে হবে।
- শিখনফল জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক ও দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধের পরিবর্তনমূলক হয়ে থাকে।
- শিখনফল লেখার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হবে বা পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণ নির্দেশ করবে। যেমন-বিবৃতি করতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা, তালিকা করতে পারা, সমাধান করতে পারা, সংজ্ঞা দিতে পারা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় শিখনের উদ্দেশ্য হলো কতগুলো শিখনফল অর্জন। আর শিখনফল অর্জন হয় সব সময় আচরণগত পরিবর্তনের দ্বারা। আর আচরণগত পরিবর্তন বলতে শারীরিক, মানসিক ও প্রায়োগিক আচরণ সব কিছুরই পরিবর্তন বোঝায়। তাই শিখনের দ্বারা শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন হলে কেবল শিখনফল অর্জন সম্ভব হয়েছে বলা যায়। আর শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ণ করা যায়। এ অধ্যায়ে (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখনফলগুলোর আলোকে পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন করা হবে। প্রত্যেক শ্রেণির জন্য আলাদা আলাদা শিখনফলগুলো অধ্যায়ভিত্তিক নির্ধারণ করা হয়েছে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে তৃতীয় শ্রেণির

জন্য ৯৯টি, চতুর্থ শ্রেণির জন্য ১৩২টি এবং পঞ্চম শ্রেণির জন্য ১০৫টি শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফলগুলো অর্জনের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক

শিক্ষার নির্ধারিত স্তরের নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত নির্ধারিত শিক্ষণ-শিখনীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে অবশ্য পঠিতব্য পুস্তককেই পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। যেমন- পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা, বাংলা, গণিত ইত্যাদি। যে কোন বিষয়ে শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামগ্রী হলো পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তককে শিখন হাতিয়ার ও বলা হয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০) এর প্রাথমিক স্তরে প্রণীত ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তার আলোকে প্রণীত হয়েছে প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম। আর এই শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিস্তৃত শিখনক্রম তৈরি করা হয়েছে। এতে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও পরিকল্পিত কাজ। শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে শিখনফল। আর এ শিখনফল অর্জনের জন্য প্রাথমিক স্তরের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে এখানে তার অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল পর্যালোচনা করা হবে।

তৃতীয় শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় (ঈমান ও আকাইদ)

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১ম অধ্যায়ে ৯টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি ১.১

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে এবং তার প্রতি ইমান আনবে	আল্লাহর পরিচয়	আল্লাহর পরিচয়-পৃ. ১
১. মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের স্রষ্ঠা মহান আল্লাহ এ কথা বলতে পারবে।	মহান আল্লাহ স্রষ্টা	আল্লাহ স্রষ্টা-পৃ. ২

১. মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির পালনকর্তা একথা বিশ্বাস করবে এবং মানবে। ২. ফল, ফসল, আলো, বাতাস ও পানি দিয়ে আল্লাহ আমাদের লালন পালন করেন। তিনি আমাদের রব একথা বিশ্বাস করবে এবং মানবে।	আল্লাহ পালনকর্তা	আল্লাহ পালনকারী-পৃ. ৪
১. মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতকে খাদ্য দিয়ে, পানি দিয়ে, আলো দিয়ে, বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন এ কথা জানবে ও ইমান আনবে। ২. আল্লাহ আমাদের রিযিকদাতা তিনি রায্‌যাক। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।	আল্লাহ রিযিকদাতা	আল্লাহ রিযিকদাতা-পৃ. ৫
১. আল্লাহ পরম করুণাময় ও দয়ালু তিনি দয়াবান, তাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আছি একথা জানবে ও বিশ্বাস করবে। ২. আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য আলো বাতাস, ফলমূল সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তা বলতে পারবে। ৩. আল্লাহকে রাহমান বা পরম দয়ালু হিসেবে মানবে। ৪. আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী তা বলতে পারবে।	আল্লাহ দয়ালু	আল্লাহ দয়ালু-পৃ. ৬
১. নবি-রাসুলগণের (আ) পরিচয় বলতে পারবে। ২. নবি-রাসুলগণ (আ) আল্লাহর প্রেরিত, তাঁদেরকে মহান শিক্ষকরূপে জানবে ও তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম ও শেষ নবির নাম বলতে পারবে। ৩. নবি-রাসুলগণ (আ) সকল দিক দিয়ে মানুষের জন্য আদর্শ এ কথা বর্ণনা করতে পারবে। তারা নবি-রাসুলগণকে (আ) শ্রদ্ধা করবে, ভালোবাসবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।	নবি-রাসুল (আ)	নবি-রাসুল-পৃ. ৭

১. মহান আল্লাহ দয়া করে মানুষের পথ-নির্দেশনার জন্য আসমানি কিতাব নাযিল করেছেন তা জানবে ও বিশ্বাস করবে। ২. প্রধান চারখানা আসমানি কিতাবের নাম জানবে ও কোন কোন নবির ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছে বলতে পারবে। ৩. তারা সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআন মজিদ শিখতে আগ্রহী হবে।	আসমানি কিতাব	আসমানি কিতাব-পৃ. ৭
১. আখিরাত সম্পর্কে বলতে পারবে। আখিরাতে শান্তির জন্য দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে। ২. আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী তা বলতে পারবে।	আখিরাত	আখিরাত-পৃ. ৮
১. কালিমা তাইয়্যিবা আরবিতে পড়তে ও বলতে পারবে। ২. কালিমা তাইয়্যিবার অর্থ বলতে পারবে। ৩. এ কালিমায় যারা বিশ্বাস করে, তারাই মুমিন ও মুসলিম এ কথা জানবে ও মানবে।	কালিমা তাইয়্যিবা	কালিমা তাইয়্যিবা-পৃ. ১০

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ইমান ও আকাইদঃ এই অধ্যায়ে আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহ স্রষ্টা, আল্লাহ পালনকারী, আল্লাহ রিযিকদাতা, আল্লাহ দয়ালু, ইত্যাদি বিষয়ে খুব আকর্ষণীয় ও ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান আনব, পৃথিবীর সকল সৃষ্টি একমাত্র তাঁর। তাই আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দান করেছেন। তাই তিনি খুশি হন এমন কাজ করব। তিনি আমাদের পালনকারী, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির পালনকারী। তিনি আমাদের ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা। তাই তাঁর দেওয়া রিজিক খেয়ে আমরা শোকর আদায় করব। আমাদের উপর তাঁর দয়া সব সময় বিরাজমান তাই কখনো তাঁর দয়া থেকে নিরাশ হব না। তিনি সবাইকে দয়া করেন ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এছাড়া নবি-রাসুলের পরিচয়, প্রথম ও শেষ নবির নাম, তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে আমরা তাদের ভালোবাসব। আসমানি কিতাব, আসমানি কিতাবের সংখ্যা, এসব কিছু বিশ্বাস করা, আসমানি কিতাব শিক্ষা গ্রহণ করা, পরকালের পরিচয়, পরকালের স্তর, দুনিয়ার ভালো-মন্দ কাজের বিচার হবে পরকালে। মন্দ কাজের শাস্তি ও ভালো কাজের পুরস্কার দেয়া হবে পরকালে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে তাদের দুনিয়ার জীবন সুন্দর হবে। এবং কালিমা তায়্যিবা অর্থসহ আলোচনা করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিশুদের বয়স উপযোগী সব বিষয়ে চমৎকার আলোচনা হলেও কিছু কিছু বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

পাঠ্য বইয়ের পৃ-৬ এ আল্লাহ দয়ালু এ বিষয়ের আলোচনায় যে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তার ক্যাপশনে লিখা হয়েছে ‘‘আল্লাহর দয়ায় বৃষ্টি পড়ছে, প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে’’। এখানে একই ছবিতে ২টি বাক্যের কথা বুঝা যাচ্ছে না, তাই আল্লাহর দয়ায় বৃষ্টি পড়ছে। এর জন্য বৃষ্টি পড়ার একটি ছবি এবং প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে, বুঝানোর জন্য অন্য একটি ছবি ব্যবহার করলে যথাযথ হবে।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৬ এ আল্লাহ দয়ালু, الله رحمن আল্লাহু রাহমান, এভাবে লিখা হলেও আলোচনার শেষে এসে রাহমান শব্দকে রহমান লিখা হয়েছে। যা শিশুদের বানান বিভ্রাটে ফেলতে পারে।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৭ এ ‘‘আসমানি কিতাব’’ এই অংশের আলোচনায় ‘‘আল্লাহর বাণীর সমষ্টিকে কিতাব বলে’’ এই কথার পরিবর্তে ‘‘আল্লাহর বাণীকে আসমানি কিতাব বলে’’ এরকম বললে যথাযথ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-১০ এ كلمة طيبة কালিমা তায়্যিবা-এর আলোচনায় কলেমা তায়্যিবা লেখা হয়েছে। এটি কালিমা তায়্যিবা লিখলে যথাযথ হতো। শিশুদের শুরু থেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো হলে ভালো হয়।

প্রথম অধ্যায়ে সর্বমোট ৯টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২১ টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু কিছু আলোচনায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় (ইবাদত)

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২য় অধ্যায়ে ১২টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণিঃ ১.২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. ইবাদত কাকে বলে তা বলতে পারবে ২. একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে। ৩. ইবাদত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধিত হবে।	ইবাদত	ইবাদত- পৃ. ১৪
১. পাক-পবিত্রতার পরিচয় ও উপকারিতা বলতে পারবে।	পাক-পবিত্রতা	পাক-পবিত্রতা-

২. পাক-পবিত্র থাকতে অভ্যস্ত হবে।		পৃ. ১৪
১. ওযুর গুরুত্ব উপকারিতা ও নিয়ম বলতে পারবে ২. ওযুর ফরজ কয়টি তা উল্লেখ করতে পারবে। ৩. তারা সঠিক নিয়মে ওযু করতে পারবে।	ওযু	ওযু- পৃ. ১৫ কালেমা শাহাদত- পৃ. ১৭ ওযুর ফরজ- পৃ. ১৭
১. হাত ও পা পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতা বলতে পারবে। ২. তারা নিয়মিত হাত ও পা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।	হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা	হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা- পৃ. ১৮
১. চোখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপকারিতার নিয়ম বলতে পারবে। ২. নিয়মিত চোখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।	চোখের পরিস্কার - পরিচ্ছন্নতা	চোখের পরিচ্ছন্নতা-পৃ. ১৮
১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম বলতে পারবে। ২. এবং কখন কোন সালাত আদায় করতে হয় তা বলতে পারবে। ৩. সময়মত সালাত আদায় করতে পারবে।	পাঁচ ওয়াক্ত সালাত	সালাত-পৃ. ১৯ সালাতের ওয়াক্ত-পৃ. ২০
১. তাকবির তাহরিমা কী তা বলতে পারবে। ২. তাকবির শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। ৩. আল্লাহু আকবর বলে সঠিকভাবে তাহরিমা বাধতে পারবে।	তাকবির তাহরিমা	সালাতের নিয়ম-পৃ. ২১
১. শুদ্ধ উচ্চারণে সানা পড়তে পারবে। ২. সানা মুখস্ত বলতে পারবে।	সানা	সানা-পৃ. ২২
১. শুদ্ধ উচ্চারণে আউযুবিল্লাহ পড়তে পারবে এবং এর অর্থ বলতে পারবে।	আউযুবিল্লাহ	আউযুবিল্লাহ-পৃ. ২২
১. বিসমিল্লাহ বলতে পারবে এবং অর্থসহ পড়তে পারবে। ২. সকল ভালো কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলবে।	তাসমিয়াহ	বিসমিল্লাহ-পৃ. ২২
১. রুকু ও সিজদাহ কী তা বলতে পারবে। ২. সঠিকভাবে রুকু ও সিজদাহ করতে পারবে।	রুকু ও সিজদাহ	রুকু ও সিজদা-পৃ. ২৩ রুকু করার নিয়ম-পৃ. ২৩

		সিজদা করার নিয়ম-পৃ. ২৪
১. সালাম শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করার নিয়ম বলতে পারবে। ২. সালাতের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।	সালাম	সালাম-পৃ. ২৪ সালাতের নৈতিক উপকার-পৃ. ২৫

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ইবাদতঃ এই অধ্যায়ে ইবাদতের পরিচয়, প্রধান ৪টি ইবাদত, সালাত ,যাকাত, সাওম ও হজ ছাড়াও ইবাদত হিসেবে গণ্য, সালাম দেওয়া, আব্বা আম্মার কথা শোনা, জীবে দয়া করা, রোগীর সেবা করা, সত্য কথা বলা, ইয়াতিম-মিসকিনকে সাহায্য করা, আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম মানার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও পাক-পবিত্রতা, সর্বাবস্থায় পাক-সাফ থাকা, কালিমা শাহাদাত, ওযু ও ওযু করার নিয়ম চিত্রসহ বর্ণনা করা হয়েছে। হাত-পায়ের পরিচ্ছন্নতা, চোখের পরিচ্ছন্নতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে অসুখ হবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও সালাত, সালাতের নিয়ম, চিত্রসহ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে সালাতের নৈতিক উপকার আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায় শেষ করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুগুলোর সুন্দর, সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠ্যপুস্তকে ফুটে উঠেছে। তথাপি কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে। যা শিশুদের বয়স উপযোগী কিন্তু আলোচনায় স্থান পায়নি। তা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

পাঠ্যবইয়ের পৃ-১৯ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ছেলে-মেয়ে সাত বছর হলে তাদের দ্বারা সালাত আদায় করানো পিতামাতার ওপর ওয়াজিব।

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বয়স কমপক্ষে ৮/৯ বছর হয়। তাই এই সময়ে সম্পূর্ণ সালাত শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এই অধ্যায়ে সালাত শিক্ষার যে আলোচনা স্থান পেয়েছে তাতে সম্পূর্ণ সালাত শিক্ষা দেওয়া হয়নি। তাই পূর্ণাঙ্গ সালাত শিক্ষা পাঠ্যবইয়ে সংযুক্ত করা উচিত।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-২৪ এ সালাত শিক্ষার আলোচনায় সিজদা করার নিয়মের পর সালাম এর মাধ্যমে সালাত শেষ করার আগে বসা অবস্থায় (শেষ বৈঠক) ৩টি গুরুত্বপূর্ণ দু'য়া পড়তে হয়। যেমন- আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'য়া মাসুরা ইত্যাদি। এই দু'য়াগুলো সালাম এর আলোচনার আগে শিখানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। অন্যথায় সালাত অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বমোট ১২টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২৭টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায় (আখলাক)

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৩য় অধ্যায়ে ৭টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.৩

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. আব্বা-আম্মার কথামতো চলবে।	আব্বা-আম্মার কথা শোনা	আব্বা-আম্মার কথা শোনা-পৃ. ২৮
১. সত্য বলার উপকারিতা ও মিথ্যার কুফল বলতে পারবে।	সত্য কথা বলা	সত্য কথা বলা-পৃ. ৩৬
১. সালাম ও সালামের জওয়াব শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। ২. নিয়মিত সালাম বিনিময় করবে।	সালাম	সালাম বিনিময়-পৃ.৩০
১. মেহমানের পরিচয় ও মেহমানের সম্মান সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে। ২. মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।	মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার	মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার-পৃ. ৩২
১. সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে।	সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার	সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার-পৃ. ২৯
১. মানুষের মর্যাদা এবং মানব সেবার সুফল বলতে পারবে। ২. মানুষের সেবা করবে।	মানুষের সেবা করা	মানুষের সেবা-পৃ.৩৩
১. জীবে দয়া করা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে। ২. তারা জীবে দয়া করবে।	জীবে দয়া করা	জীবে দয়া-পৃ.৩৫

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক: এ অধ্যায়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আব্বা-আম্মার কথা শোনা, তাঁদের সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করা, সালাম দেয়া, সম্মান করা, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। তাঁদের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলা, তাঁদের

অবাধ্য না হওয়া, কুরআনে তাঁদের জন্য যে দু'য়া শিখিয়ে দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করে তাঁদের জন্য দু'য়া করার কথা বলা হয়েছে। সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সহপাঠীদের সাহায্য করা, বিপদে এগিয়ে আসা, অসুখ হলে সেবা করা, একসাথে খেলাধুলা করা, ঝগড়া, মারামারি, হিংসা না করার কথা একটি গল্পাকারে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া আব্বা-আম্মা, দাদা-দাদী, শিক্ষক, সহপাঠী, বন্ধু ও ছোট বড় সকলকে সালাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মেহমানের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সাধ্যমতো তাদের আপ্যায়ন করা, হাসিমুখে কথা বলা ইত্যাদি মহানবি (স)-এর একটি ঘটনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মানুষ মানুষের ভাই, মানুষের সেবা করা, সুখে-দুঃখে একে অপরের সাহায্য করা, খাদ্য, পানি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা, মুসলিম অমুসলিম সবাইকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি আল্লাহর। সকল জীবের প্রতি দয়া দেখানো, জীব-জন্তু, গাছপালা, পশু-পাখি, হাস-মুরগি, বিড়াল, কুকুরসহ সব প্রাণীর সাথে দয়া দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি পাখির বাসা না ভাঙ্গা ও ফড়িংয়ের পায়ে সুতা বেঁধে খেলতে নিষেধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) এর বাণী উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক মহিলা ও পিপাসার্ত কুকুরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে সত্য কথা বলার গুরুত্ব, পিতা-মাতা, ভাই-বোন, বন্ধু, সহপাঠী সকলের সাথে সদা সত্য কথা বলা, মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা, সত্য কথা বলার উপকারীতা ও মিথ্যা কথা বলার অপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। যেহেতু এই অধ্যায়টি দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়গুলোতে উল্লেখিত কুরআনের আয়াতগুলো আরবিসহ উল্লেখ করে, হাদিস ও ঘটনাগুলোর রেফারেন্স উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো সুন্দর হতো। নিম্নে এ বিষয়ে গবেষকের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলোঃ

পাঠ্যবইয়ের পৃ-২৮ এ আল্লাহ বলেন ''তোমরা আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে''। এটি আরবি টেক্সটসহ আয়াত ও রেফারেন্স উল্লেখ করলে ভালো হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-২৯ এ আব্বা-আম্মার জন্য দু'য়া উল্লেখ করা হয়েছে ''রাব্বিরহাম হুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা''। এটি আরবি টেক্সটসহ আয়াত ও রেফারেন্সসহ উল্লেখ করা উচিত ছিল। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজে আরবি দেখে মুখস্ত করতে অভ্যস্ত হয়।

পাঠ্যবইয়ের এই অধ্যায়ে মহানবি (স) এর প্রায় ১২টি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসগুলো হাদিসের মূল কিতাবের নামসহ রেফারেন্স উল্লেখ করলে শিশুরা মনের অজান্তে হাদিসের কিতাবের নামের সাথে পরিচিত হতে পারতো। এছাড়া এই অধ্যায়ে ৫টি শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর একটিও রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি। শিক্ষাক্রমের সাথে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর বর্ণনার ক্রমিকে অসংগতি রয়েছে। যেমন শিক্ষাক্রমে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে সে বিষয়টি পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বমোট ৭টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ১১টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায় (কুরআন মজিদ শিক্ষা)

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৪র্থ অধ্যায়ে ১৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণিঃ ১.৪

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. কুরআন মজিদের গুরুত্ব, তেলাওয়াতের ফযিলত বলতে পারবে। ২. আগ্রহের সাথে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করবে।	কুরআন মজিদ শিক্ষা	কুরআন মজিদ শিক্ষা-পৃ. ৪১
১. আরবি বর্ণগুলো ভালোভাবে চিনবে। ২. আরবি বর্ণগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে।	আরবি বর্ণমালা	আরবি বর্ণমালা-পৃ. ৪২
১. নুকতা কী তা জানবে ও বলতে পারবে। নুকতাবিহীন হরফগুলো চিনবে ও পৃথক করতে পারবে। ২. এক, দুই ও তিন নুকতাবিশিষ্ট হরফ চিনবে এবং পৃথক করতে পারবে।	নুকতা	নুকতা-পৃ. ৪৫
১. বিভিন্ন আকার আকৃতির আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে চিনতে, বলতে ও লিখতে পারবে।	আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ	আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ-পৃ. ৪৬
১. যবর, যের ও পেশ ইত্যাদি হরকতগুলো চিনবে। ২. হরকতের চিহ্নগুলো ব্যবহার করে উচ্চারণ করতে পারবে।	হরকত	হরকত-পৃ. ৪৯
১. তানবীন কাকে বলে তা চিনতে পারবে। ২. তানবীন ব্যবহার করে আরবি বর্ণমালা উচ্চারণ করতে পারবে।	তানবীন	তানবীন-পৃ. ৫২
১. জযম চিনতে পারবে। ২. জযমযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে। ৩. জযম লিখে ব্যবহার করতে পারবে।	জযম	জযম-পৃ. ৫৩
১. তাশদীদ চিনতে পারবে।	তাশদীদ	

২. তাশদীদযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে। ৩. তাশদীদ লিখে ব্যবহার করতে পারবে।		তাশদীদ-পৃ. ৫৪
১. আরবি শব্দ চিনতে পারবে। ২. এক, দুই ও তিন বর্ণের শব্দ গঠন করতে পারবে। ৩. আরবি শব্দ পড়তে ও লিখতে পারবে।	শব্দ গঠন	শব্দ গঠন-পৃ. ৫৫
১. মাদ্দ ও মাদ্দের হরফ চিনতে পারবে। ২. মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে।	মাদ্দের হরফ	মাদ্দের হরফ-পৃ. ৫৭
১. সূরা আল-ফাতিহা বানান করে পড়তে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে পারবে। ২. সূরাটি শুদ্ধভাবে সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা আল-ফাতিহা	সূরা আল-ফাতিহা- পৃ. ৫৮
১. সূরা আল-ফালাকের আয়াত সংখ্যা বলতে পারবে। ২. সূরা আল-ফালাক বানান করে পড়তে পারবে। ৩. সূরা আল-ফালাক বিশুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত করে সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা আল-ফালাক	সূরা আল-ফালাক-পৃ. ৫৯
১. সূরা আন-নাসের আয়াত সংখ্যা বলতে পারবে। ২. সূরা আন-নাস বানান করে পড়তে পারবে। ৩. সূরা আন-নাস বিশুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত করে সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা আন-নাস	সূরা আন-নাস-পৃ. ৬০

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কুরআন মজিদ শিক্ষা: এ অধ্যায়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মজিদ শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে কুরআন মজিদের পরিচয়। ২৯ টি আরবি বর্ণমালা বাংলা উচ্চারণসহ চার্ট আকারে দেওয়া হয়েছে। নুকতাবিশিষ্ট হরফ ও নুকতাবিহীন হরফগুলো চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর আরবি বর্ণের বিভিন্ন রূপ নিয়ে চার্ট দেওয়া হয়েছে। যেমন- একটি বর্ণ শব্দের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে আসলে কিভাবে বসবে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। হরকত বা স্বরচিহ্নের পরিচয়, বিভিন্ন হরকতবিশিষ্ট আরবি বর্ণের চার্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। তানবীন বা দুই যবর, দুই যের, দুই পেশবিশিষ্ট হরফের চার্ট এবং তাশদীদ তথা শব্দের দ্বিত্ব উচ্চারণ ও তাশদীদযুক্ত শব্দের চার্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। আরবি বর্ণ দিয়ে কিভাবে শব্দ গঠন করা যায় তা চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। মাদ্দের হরফ বা যেসব হরফ দীর্ঘ স্বরে টেনে পড়তে হয় তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। সর্বশেষ সূরা

আল-ফাতিহা, সূরা আল-ফালাক, সূরা-আন নাস, আরবি, বাংলা উচ্চারণসহ অর্থসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এটি যেহেতু মুসলমান সন্তানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ্যবিষয় সেহেতু শিশুদের বয়স অনুসারে আরো কিছু সূরা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। মুসলমান সন্তানদের ৭ বছর বয়স থেকে সালাত শিক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর ৮/৯ বছর বয়স হয়ে থাকে তাই কুরআন মজিদ শিক্ষা অধ্যায়ে আরো কিছু কুরআন শিখার নিয়ম ও আরো কয়েকটি ছোট ছোট সূরা অন্তর্ভুক্ত করলে যথাযথ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-(৫৮-৬০) এ সূরা আল ফাতিহা, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস এর আলোচনা অংশে শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য নির্দেশনায় সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে তা দেওয়া হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বমোট **১৩**টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ৩০টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায় (নবি-রাসুল (স)

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫ম অধ্যায়ে ৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. মহানবি (স) এর পরিচয় সহজ কথায় ও সংক্ষিপ্তভাবে দিতে পারবে। ২. মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করবে।	মহানবি (স)	নবি-রাসুল (স)- পৃ. ৬৩ মহানবি (স)- পৃ. ৬৩

১. মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবে। ২. তাঁর ইসলাম প্রচার সম্বন্ধে সহজ কথায় বলতে পারবে। ৩. তিনি কী শিক্ষা দিয়েছেন তা বলতে পারবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন গড়বে।	মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার	মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও ইসলাম প্রচার- পৃ. ৬৬
১. মহানবি (স) গরিব দুঃখীদের কীভাবে সাহায্য করতেন তা উল্লেখ করতে পারবে। ২. তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করে গরিব দুঃখীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।	মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি	মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি- পৃ. ৬৮
১. মহানবি (স) অত্যাচারের প্রতিবাদে কীভাবে সোচ্চার হতেন তা বলতে পারবে। ২. মহানবি (স) এর শিক্ষা অনুসরণ করে অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারবে।	অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)	অত্যাচারের প্রতিবাদে মহানবি (স)- পৃ. ৭০
১. প্রথম ও শেষ নবির নামসহ কয়েকজন নবির নাম বলতে পারবে।	কয়েকজন নবির নাম	কয়েকজন নবির নাম- পৃ. ৭১

পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণ

নবি-রাসুল (স): এ অধ্যায়ের শুরুতে আল্লাহর বাণী প্রচারক নবি-রাসুলের (স) পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। মহানবি (স) এর জন্ম ও বেড়ে উঠা। তাঁর পিতামাতার পরিচয়, তাঁর লালন-পালন, তাঁর দুধ মাতার পরিচয়সহ শৈশবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শিশুকাল থেকে তাঁর স্বভাব চরিত্র ও সত্যবাদিতার কথা ফুটে উঠেছে আলোচনায়। তাঁর নবুয়ত লাভ, প্রথম ওহী অবতরণ, নবুয়ত লাভের পর তাঁর সাথে মক্কার কাফিরদের শত্রুতার বর্ণনা, ইসলামের জন্য তাঁর হিজরত ও আত্মত্যাগের কথা আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সন্তান-সন্ততির নাম ও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। মহানবি (স) ছিলেন সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। তিনি ছিলেন মানবদরদি, গরিব-দুঃখীদের সাহায্যকারী, তিনি অন্যের বোঝা বহন করে দিয়ে সাহায্য করতেন, তাঁর আচরণ ছিল খুবই অমায়িক, তাঁর খাদেমদের সাথে পর্যন্ত কোনদিন ধমক দিয়ে বা বিরক্তি প্রকাশ করে কথা বলেননি। এছাড়া মহানবি (স) সব সময় সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজে নিষেধ করতেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ সংক্রান্ত একটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়। সর্বশেষ কুরআনে উল্লেখিত কয়েকজন নবির নাম উল্লেখ করে এ অধ্যায়টি শেষ করা হয়।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইসলামের কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহারে শীতিলতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৬৪ এ মহানবি (স) এর কথা যারা মানল না তাদের মন্দ/দুষ্টলোক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এখানে মহানবি (স) এর কথা যারা মানল তাদের জন্য ‘‘বিশ্বাসী’’ ও যারা মহানবি (স) এর কথায় ক্ষেপে গেল তাদের ‘‘অবিশ্বাসী’’ শব্দ ব্যবহার করা হলে যথাযথ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৬৪ এ দুষ্টলোকদের নেতা আবু ছিল আবু জাহেল। এখানে অবিশ্বাসীদের নেতা ছিল আবু জাহেল বললে যথাযথ হতো।

পুরো অধ্যায়ের আলোচনায় অবিশ্বাসীদের জন্য দুষ্টলোক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যা মোটেও শোভনীয় হয়নি।

পুরো অধ্যায়ে যে সকল কুরআনের আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তা রেফারেন্সসহ উল্লেখ করলে ভালো হতো।

পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বমোট ৫টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ১০টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

চতুর্থ শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় (ইমান ও আকাইদ)

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১ম অধ্যায়ে ১১টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণিঃ ১.৬

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. মহান আল্লাহর পরিচয় বলতে পারবে এবং তাঁর প্রতি ইমান আনবে।	মহান আল্লাহর পরিচয়	ইমান ও আকাইদ- পৃ. ১ মহান আল্লাহর পরিচয়- পৃ. ১
১. আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মালিক তা বলতে পারবে এবং বিশ্বাস করবে।	মহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক	আল্লাহ মালিক- পৃ. ৩
১. আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ২. তাঁর প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে নিজেদের কর্তব্য কাজে নিয়োজিত করবে।	মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান	আল্লাহ সর্বশক্তিমান- পৃ. ৫
১. আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে উল্লেখ করতে পারবে। ২. মহান আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি জগতের সব কিছুই নিয়মমত পরিচালিত হচ্ছে একথা বলতে পারবে।	আল্লাহ শান্তিদাতা	আল্লাহ শান্তিদাতা- পৃ. ৭

৩. আল্লাহ তায়ালাকে পরম শান্তিদাতা হিসেবে বর্ণনা করতে পারবে। ৪. তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করবে এবং শান্তির পক্ষে কাজ করবে। ৫. আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার কী বলতে পারবে।		
১. কালিমা শাহাদাত আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে এবং অর্থ বলতে পারবে। ২. আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এ কথা জানবে, ইমান আনবে ও বলতে পারবে। ৩. আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ইমান এনে আল্লাহ ও রাসুলের দেখানো পথে জীবন পরিচালনা করবে।	কালিমা শাহাদাত	কালেমা শাহাদাত- পৃ. ৯
১. ইমান মুজমাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, এর অর্থ বলতে পারবে। ২. ইমান মুজমালে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।	ইমান মুজমাল	ইমান মুজমাল- পৃ. ১০
১. ইমান মুফাসসাল আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে, অর্থ বলতে পারবে। ২. ইমান মুফাসসালে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে।	ইমান মুফাসসাল	ইমান মুফাসসাল- পৃ. ১১
১. ফেরেশতাগণের পরিচয় বলতে পারবে এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।	ফেরেশতায় বিশ্বাস	মালাইকা বা ফেরেশতাগণে বিশ্বাস- পৃ. ১২
১. আসমানি কিতাবের পরিচয় দিতে পারবে এবং আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।	আসমানি কিতাবে বিশ্বাস	আসমানি কিতাবে বিশ্বাস- পৃ. ১৩
১. নবি-রাসুলের পরিচয় বলতে পারবে। তাঁদের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে । ২. নবি-রাসুলের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে। ৩. তারা সর্বশেষ ও বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়বে।	নবি-রাসুলে বিশ্বাস	নবি-রাসুলে বিশ্বাস- পৃ. ১৪
১. আখিরাত বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে পারবে।	আখিরাতে বিশ্বাস,	শেষ দিবসে বিশ্বাস-

	তাকদিরে বিশ্বাস ও মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস	পৃ. ১৪ তাকদিরে বিশ্বাস- পৃ. ১৫ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস- পৃ. ১৬

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ইমান ও আকাইদ: এ অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে ইমান ও আকাইদের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে, খাঁটি মুসলিম হওয়ার জন্য ইমান ও আকাইদ বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন এ কথাও বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর পরিচয় তিনি সব কিছুর মালিক, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি শান্তিদাতা হিসেবে বিস্তারিত উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিশ্বজাহানের সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক, স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, সবকিছুর পরিচালক এ কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি অনাদি অনন্ত, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, নীহারিকা, ছায়াপথ ইত্যাদি তাঁরই অধীন একথাও আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তি দ্বারা বিভিন্ন নবি-রাসুলকে অনেক বড় বড় জালিমদের থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহই একমাত্র শান্তিদাতা, তিনিই সকল শান্তির উৎস। যারা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করবে একথাও বলা হয়েছে। তাই শান্তি কেবল তাঁরই কাছে পাওয়া যাবে। এরপর কালেমা শাহাদাত, ইমান মুজমাল, ইমান মুফাস্সাল অর্থসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। কালেমা শাহাদাত ও ইমান মুজমাল এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর ইমান মুফসসাল এর সাতটি বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত বিষয়গুলো সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে পাঠ্যপুস্তকে। কিন্তু কিছু বিষয়ের আলোচনায় আরবি উচ্চারণের সাথে বাংলা বানানের বিকৃতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৮ এ আল্লাহ শান্তিদাতা অংশের আলোচনার শেষ দিকে সালাম দেওয়ার ও সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য বাংলায় ‘‘আসসালামু আলাইকুম’’ এবং “ওয়া আলাইকুমুস সালাম” লেখা হয়েছে। এ বাক্যগুলো বাংলার পরিবর্তে আরবিতে السلام عليكم ও وعليكم السلام লিখলে যথার্থ হতো।

প্রথম অধ্যায়ে সর্বমোট ৮টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২২টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনায় একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় (ইবাদত)

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ২য় অধ্যায়ে ১৯টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণিঃ ১.৭

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. ইবাদতের পরিচয় ও নিয়ম পদ্ধতি বলতে পারবে। ২. তারা ইবাদতের গুরুত্ব ও উপকারিতা বলতে পারবে এবং আল্লাহর ইবাদত করবে।	ইবাদত	ইবাদত- পৃ. ২১ ইবাদতের পরিচয়- পৃ. ২১
১. পবিত্রতার পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. পবিত্র থাকতে আগ্রহী হবে এবং পবিত্র থাকবে। ৩. এতে তাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে।	তাহারাত বা পবিত্রতা	তাহারাত- পৃ. ২২
১. ওযু কী ও ওযুর ফরযগুলো কী তা বলতে পারবে। ২. তারা ওযুর ফরযগুলো সঠিক নিয়মে পালন করতে পারবে।	ওযু ও ওযুর ফরয	ওযু ও ওযুর ফরয- পৃ. ২২
১. ওযুর সুন্নাতসমূহ বলতে পারবে। তারা যথা নিয়মে ওযু করতে পারবে।	ওযুর সুন্নাত	ওযুর সুন্নাত- পৃ. ২৩
১. ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ বলতে পারবে এবং ওযু নষ্ট হলে প্রয়োজনে ওযু করে নেবে ।	ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ	ওযু নষ্ট হওয়ার কারণ- পৃ. ২৩
১. গোসলের নিয়ম বলতে পারবে এবং সঠিকভাবে ওযু-গোসলের মাধ্যমে তারা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে অভ্যস্ত হবে।	গোসল, গোসলের ফরয ও গোসলের নিয়ম	গোসল, গোসলের নিয়ম, ও গোসলের ফরয- পৃ. ২৪
১. আযানের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. সঠিক নিয়মে আযান দিতে পারবে।	আযান ও আযানের নিয়ম	আযান- পৃ. ২৪ আযানের বাক্যসমূহ-

৩. জামা'আতে সালাত প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।		পৃ. ২৫
১. আযানের দোয়া শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে এবং অর্থসহ মুখস্ত বলতে পারবে। ২. তারা আযানের দোয়ার ফযিলত ও গুরুত্ব বলতে পারবে।	আযানের দোয়া	আযানের দোয়া- পৃ. ২৬
১. ইকামতের বাক্যগুলো শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে। ২. জামা'আতে সালাতে ইকামাত দিতে পারবে। ৩. এবং জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে।	ইকামাত	ইকামত- পৃ. ২৭
১. তাশাহ্হুদ কী বলতে পারবে। তারা তাশাহ্হুদ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবে এবং যথাসময় সালাতে পড়বে।	তাশাহ্হুদ	তাশাহ্হুদ- পৃ. ২৭
১. দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা পড়তে পারবে এবং দরুদ ও দোয়া মাসুরা সালাতে পড়বে ।	দরুদ ও দোয়া মাসুরা	দরুদ ও দোয়া মাসুরা- পৃ. ২৮
১. সালাম ও মুনাজাতের বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে অর্থসহ বলতে পারবে এবং যথাস্থানে ব্যবহার করতে পারবে।	সালাম ও মুনাজাত	সালাম ও মুনাজাত- পৃ. ২৯
১. সালাতের আহকাম কাকে বলে এর গুরুত্ব জানবে এবং আহকাম কয়টি ও কী কী তা বলতে পারবে। ২. সালাতের আহকামগুলো গুরুত্বের সাথে পালন করবে।	সালাতের আহকাম	সালাতের আহকাম- পৃ. ৩০
১. সালাতের আরকান বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে। ২. সালাতের আরকান যথানিয়মে পালন করবে।	সালাতের আরকান	সালাতের আরকান- পৃ. ৩১
১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও সময় বলতে পারবে। ২. এবং সময়মত সালাত আদায়ের গুরুত্ব বলতে পারবে। ৩. তারা সময়মত সালাত আদায় করবে।	সালাতের সময়	সালামের ওয়াক্ত- পৃ. ৩০
১. সালাতের নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে। ২. সালাত আদায় করে দেখাতে পারবে। ৩. দুই, তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতের ধারাবাহিক নিয়ম বর্ণনা করতে পারবে।	সালাতের নিয়ম	সালাত আদায়ের নিয়ম- পৃ. ৩১

১. জুমুআর সালাতের পরিচয়, গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করতে পারবে। ২. জুমুআর সালাত আদায় করতে পারবে। এতে তাদের মধ্যে সামাজিক গুণাবলী গড়ে উঠবে।	জুমুআর সালাত	জুমুআর সালাত- পৃ. ৩৪
১. দুই ঈদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের নিয়ম বলতে পারবে। ২. নিয়মিত সালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তারা বৃহত্তর সমাজে মিলে মিশে চলতে শিখবে।	ঈদ ও ঈদুল ফিতরের সালাত	ঈদের সালাত, ঈদুল ফিতর- পৃ. ৩৫
১. ঈদুল আযহার সালাতের নিয়ম এবং কুরবানি করার নিয়ম বলতে পারবে। ২. তারা যথা নিয়মে সালাত ও কুরবানি আদায় করতে পারবে। ৩. কুরবানির মাধ্যমে তারা আনুগত্য ও ত্যাগের মহান শিক্ষা লাভ করবে।	ঈদুল আযহা	ঈদুল আযহা- পৃ. ৩৬

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ইবাদত: এ অধ্যায়ের আলোচনার শুরুতে ইবাদত শব্দের ব্যাপকতা উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রচলিত ইবাদত (সালাত, সাওম, কুরআন তিলাওয়াত) ইত্যাদির পাশাপাশি ভালো কাজ করাও একটা ইবাদত। যেমন- রোগীর সেবা করা, কথা বলার সময় সত্য কথা বলা ইত্যাদি। ইবাদত কেন করতে হবে সে বিষয়ে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে বলা হয়েছে। তাহারাত বা পবিত্রতা (ওযু, গোসল) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাক-পবিত্র থাকলে আমাদের দেহমন সুস্থ থাকে, পাক-পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। সালাতের আগে ওযু করা ফরয। তাই ওযুর নিয়ম, ওযুর ফরয কাজ, সুন্নত ও ওযু নষ্ট হওয়ার কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্রতা অর্জনের আরেকটি উপায় হলো গোসল। এখানে গোসলের নিয়ম, গোসলের ফরয ইত্যাদি আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, গোসল করাও একটা ইবাদত। মুসলমানদের সালাতের জন্য আহ্বানের মাধ্যম হলো আযান। এখানে কিভাবে আযানের প্রচলন শুরু হয় কিভাবে ইকামত দিতে হয়, তা বর্ণনার পাশাপাশি আযানের বাক্যগুলো অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং আযানের শেষে যে দুয়া পড়তে হয় তাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু তৃতীয় শ্রেণিতে শেষ বৈঠকের আলোচনা ছাড়া সালাতের বাকী নিয়মগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাই এখানে সালাতের শেষ বৈঠকে আমাদের যে তিনটি দুয়া পড়তে হয় যেমন-তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা এগুলো আরবি ও বাংলা উচ্চারণের পাশাপাশি অর্থসহ উল্লেখ করা হয়। সালাতের মাধ্যমে সালাত শেষ করার পর মুনাজাতের কথা বলা হয়েছে। মুনাজাত হলো আল্লাহর কাছে চাওয়ার প্রক্রিয়া। এখানে একটি চমৎকার মুনাজাতের দোয়া ও উল্লেখ করা হয়। সালাত, সালাতের ধারাবাহিক নিয়মগুলো তৃতীয় শ্রেণিতে শিখানো

হয়েছে। তাই এখানে সালাতের কিছু আবশ্যকীয় কাজ সালাতের আহকাম ও আরকানগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। সালাতের ওয়াক্তগুলো তৃতীয় শ্রেণিতে আলোচনা করা হলেও এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সালাত আদায়ের নিয়মগুলো ও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। জুমার সালাত প্রতি সপ্তাহে একদিন শুক্রবার মুসলমানরা জুমার সালাত আদায় করে। এখানে জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। সবশেষে দুই ঈদের সালাত (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার) সালাত, ঈদের দিনের সুন্নত আমল ও ঈদের সালাতের নিয়মাবলী উল্লেখ করে ঈদের দিনের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঈদ হলো আনন্দের দিন, এদিন ধনী-গরিব সবাই যেন উপভোগ করতে পারে তার নির্দেশনা দিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শিশুদের বয়স ও সক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের আরবি লেখাসহ সংযুক্ত করলে ভালো হতো। যেমন-

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৩২ এ সালাত আদায়ের নিয়ম অংশে সানা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাংলা উচ্চারণে “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা”। এটি আরবি ও অর্থসহ উল্লেখ করলে যথাযথ হতো।

পাঠ্য বইয়ের পৃ-৩৫ এ জুমার সালাতের নিয়তের জন্য বাংলা লিখা হয়েছে যে, ফরজের আগে নিয়ত করব, ‘‘আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকাত জুমার ফরজ সালাত এই ইমামের সাথে পড়ার নিয়ত করলাম আল্লাহু আকবর”। এই বাক্যটি বলার কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু মনে মনে নিয়ত করার কথা উল্লেখ করলেই যথার্থ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ-৩৭ এ ঈদের তাকবীর বাংলা উচ্চারণে ‘‘আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়ালিল্লাহিল হামদ” লিখা হয়েছে। এটি আরবি টেক্সট ও অর্থসহ উল্লেখ করলে যথাযথ হলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বমোট ১৯টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ৩৯টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে তৃতীয় শ্রেণিতে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হলেও সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায় (আখলাক)

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৩য় অধ্যায়ে ১১টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি : ১.৮

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. সচ্চরিত্র ও অসৎ চরিত্র কাকে বলে তা বলতে	আখলাক	আখলাক- পৃ. ৪০

পারবে। ২. সচ্চরিত্রের উপকারিতা বলতে পারবে। ৩. সচ্চরিত্র ও অসৎ চরিত্রের কিছু উদাহরণ দিতে পারবে। ৪. সচ্চরিত্রের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলবে এবং নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হবে।		সচ্চরিত্র ও অসৎ চরিত্রের তালিকা- পৃ. ৪০
১. সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অবদান বর্ণনা করতে পারবে। ২. পিতা মাতার সম্মান বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরতে পারবে। ৩. তারা আব্বা-আম্মাকে সম্মান করবে ও তাঁদের কথা মেনে চলবে। কখনো তাদের অবাধ্য হবে না। মৃত পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে।	আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা	আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা- পৃ. ৪১
১. শিক্ষককে সম্মান করার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ২. শিক্ষকগণকে হিতাকাঙ্ক্ষী আপনজন ও শ্রদ্ধাভাজন বলে জানবে এবং শ্রদ্ধা করবে। ৩. শিক্ষকগণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সে অনুসারে চলবে।	শিক্ষককে সম্মান করা	শিক্ষককে সম্মান করা- পৃ. ৪২
১. বড়দের সম্মান করার বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে। ২. বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা কী তা উল্লেখ করতে পারবে। ৩. ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য বিষয়ে মহানবি (স) এর বাণী বলতে পারবে। ৪. বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের আদর করবে। এতে ছোট-বড়র মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।	বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা	বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা- পৃ. ৪৩
১. প্রতিবেশীর পরিচয়, তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের সুফল, খারাপ ব্যবহারের কুফল এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও বর্ণনা করতে পারবে।	প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা	প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা- পৃ. ৪৪

২. তারা প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে সচেষ্ট হবে।		
১. রোগীর সেবা করার গুরুত্ব এবং এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে। ২. তারা আন্তরিকতার সাথে রোগীর সেবা করবে।	রোগীর সেবা করা	রোগীর সেবা করা- পৃ. ৪৫
১. সত্য কথা বলার গুরুত্ব ও সুফল এবং মিথ্যার কুফল বলতে পারবে। ২. তারা সব সময় সত্য কথা বলতে অভ্যস্ত হবে।	সত্য কথা বলা	সত্য কথা বলা- পৃ. ৪৬
১. ওয়াদা পালনের গুরুত্ব ও সুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ কাহিনী বলতে পারবে। ৩. তারা সর্বদা ওয়াদা পালন করবে।	ওয়াদা পালন করা	ওয়াদা পালন করা- পৃ. ৪৭
১. লোভ-লালসা না করার গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. লোভ-লালসা পরিহার করতে যত্নবান হবে।	লোভ না করা	লোভ না করা- পৃ. ৪৮
১. অপচয়ের ধারণা বুঝিয়ে বলতে পারবে। ২. অপচয় করার কুফল এবং অপচয় না করার সুফল বলতে পারবে। ৩. অপচয় করা থেকে বিরত থাকবে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদের অপচয় রোধ করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হবে।	অপচয় না করা	অপচয় না করা- পৃ. ৪৯
১. পরনিন্দা বা পরচর্চা কাকে বলে তা বলতে পারবে কুফলসহ । ২. পরনিন্দা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কী তা বলতে পারবে। ৩. পরনিন্দা থেকে নিজেদের বিরত রাখবে, এতে সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে উঠবে।	পরনিন্দা না করা	পরনিন্দা না করা- পৃ. ৫০

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক: এ অধ্যায়ের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আখলাক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। শুরুতে আখলাক এর পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। এরপর আখলাক বা

চরিত্রের দুটি দিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সৎ চরিত্র ও অসৎ চরিত্র। চরিত্র সৎ হলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায় আর চরিত্র অসৎ হলে দুনিয়ায় যেমন অপমান, অপদস্ত হতে হয় তেমনি আখিরাতেও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবার কথা বলা হয়েছে। একটি চার্টের মাধ্যমে সৎ চরিত্র ও অসৎ চরিত্রের কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। এরপর দশটি গুরুত্বপূর্ণ ও জীবন ঘনিষ্ট সৎ গুণাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

আব্বা-আম্মাকে সম্মান করা: আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের (স) পর আমাদের সবচেয়ে আপনজন হলো আব্বা-আম্মা। তাদের সাথে সব সময় সুন্দর ব্যবহার করা, তাদের সালাম দেয়া, তাদের সাথে কখনো কোন অবস্থাতে রাগারাগি না করা, বৃদ্ধ বয়সে তাদের সেবা করা, তাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করা, এবং তাদের জন্য দুয়া করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণী ও রাসুল (স) এর হাদিসের মাধ্যমে আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষককে সম্মান করা: আব্বা-আম্মার পর আমাদের সবচেয়ে কল্যাণকামী মানুষ হলো আমাদের শিক্ষকগণ। তাঁরা আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন, আমাদের শিক্ষিত করে তোলেন, লিখতে শেখান, পড়তে শেখান, আদব কায়দা শিক্ষা দেন। তাই শিক্ষককে যথাযথ সম্মান করার কথা বলা হয়েছে।

বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা: আমরা যেহেতু একটা সমাজে বসবাস করি আমাদের সাথে আমাদের বয়সে বড়-ছোট আরও অনেক মানুষ বসবাস করে। বড়রা আমাদের আদর করেন, তাই আমাদের উচিত বড়দের সম্মান করা, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, আর বয়সে ছোটদের স্নেহ করা। এ বিষয়ে রাসুল (স) এর একটি হাদিস উল্লেখ করে এ বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেশির সাথে ভালো ব্যবহার: আমাদের আশেপাশে যারা বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীর সাথে সব সময় ভালো ব্যবহার করতে হবে। তাদের যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিবেশী গরিব-অসহায় হলে তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেশীকে যেন কষ্ট না দেয়া হয় সে বিষয়ে মহানবী (স) এর হাদিস উল্লেখের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে।

রোগীর সেবা করা: বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে বা আত্মীয়-স্বজন কেউ অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যাওয়া এবং সেবা করার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

সত্য কথা বলা: মুমিনদের একটি গুণ হলো সব সময় সত্য কথা বলা, সত্য কথা বললে সবাই আমাদের ভালোবাসেন, আল্লাহ খুশি হন। আর মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসেনা, সবাই মিথ্যাবাদী থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ ও তাকে অপছন্দ করে। মহানবী (স) সব সময় সত্য কথা বলতেন। তাই আমাদেরও এ গুণ অর্জন করা উচিত। সর্বশেষ একটি হাদিস ও একটি ঘটনা উল্লেখের মাধ্যমে সত্য কথা বলার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ওয়াদা পালন করা: ওয়াদা পালন করা আল্লাহর নির্দেশ। ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের লক্ষণ ও মারাত্মক অপরাধ। তাই ওয়াদা পালন করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। লোভ না করা, অপচয় না করা ও পরনিন্দা না করার কথা আলোচিত হয়েছে। লোভ ও অপচয় হলো ধ্বংসের কারণ। আর পরনিন্দা খুবই জঘন্য কাজ। যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকার কথা আলোচিত হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই অধ্যায়টি যেহেতু আমাদের খুবই জীবন ঘনিষ্ট বিষয় তাই এ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়গুলোতে উল্লেখিত কুরআনের সবগুলো আয়াতে আরবিসহ উল্লেখ করলে এবং উল্লেখিত হাদিসগুলো রেফারেন্সসহ উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে ফুটে উঠত।

এছাড়া পাঠ্যবইয়ের পৃ-৪৭ এ তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় সত্য কথা বলা সম্পর্কে উল্লেখিত একটি ঘটনা হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। যা পুনরাবৃত্তির কারণে শিক্ষার্থীদের বিরক্তির কারণ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সর্বমোট **১১**টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট **৩১**টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায় (কুরআন মজিদ শিক্ষা)

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৪র্থ অধ্যায়ে **১৫**টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.৯

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. কুরআন মজিদের পরিচয় তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করতে পারবে। ২. তারা প্রতিদিন নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করবে।	কুরআন মজিদ শিক্ষা	কুরআন মজিদ শিক্ষা- পৃ. ৫৫ আরবি বর্ণমালা - পৃ. ৫৬
১. হরকতযুক্ত আরবি বর্ণমালায় লিখিত শব্দ পড়তে পারবে। ২. যবর, যের ও পেশযুক্ত আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।	হরকতযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ	হরকত- পৃ. ৫৮

১. তানবীনযুক্ত আরবি শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।	তানবীনযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ	তানবীন- পৃ. ৫৯
১. জযমযুক্ত আরবি বর্ণমালা দ্বারা গঠিত শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।	জযমযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ	জযম- পৃ. ৬১
১. তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।	তাশদীদযুক্ত আরবি বর্ণ ও শব্দ	তাশদীদ- পৃ. ৬২
১. দুই বর্ণ, তিন বর্ণ, চার বর্ণ ও পাঁচ বর্ণ বিশিষ্ট আরবি শব্দ গঠন করতে, পড়তে, বলতে ও লিখতে পারবে।	আরবি শব্দ গঠন	পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন আলোচনা করা হয়নি
১. ছোট ছোট আরবি বাক্য শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও লিখতে পারবে।	আরবি বাক্য গঠন ও পঠন	পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কোন আলোচনা করা হয়নি
১. তাজবীদের পরিচয়, গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. তাজবীদের সাথে আরবি শব্দ, বাক্য ও কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে পারবে।	তাজবীদ	তাজবীদ- পৃ. ৬৫
১. মাদ্দ কাকে বলে তা বলতে পারবে। ২. শুদ্ধ উচ্চারণে মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও বাক্য পড়তে ও বলতে পারবে।	মাদ্দ-এর পরিচয়	মাদ্দ- পৃ. ৬৩
১. মাখরাজ কাকে বলে তা বলতে পারবে। ২. আরবি বর্ণগুলো নিজস্ব উচ্চারণস্থান থেকে উচ্চারণ করতে পারবে।	মাখরাজ	মাখরাজ- পৃ. ৬৫
১. ইদগামের সংজ্ঞা বলতে পারবে। ২. ইযহারের হরফ কয়টি তা বলতে পারবে। ৩. তারা ইদগাম ও ইযহার শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে পারবে।	ইদগাম ও ইযহার	ইদগাম- পৃ. ৬৫ ইযহার- পৃ. ৬৬ আরবি বর্ণের শব্দ- পৃ. ৬৬
১. সূরা আন্ নাসর শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে এবং মুখস্থ বলতে পারবে। ২. তারা সূরা আন্ নাসর সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা আন্ নাসর	সূরা আন নাসর- পৃ. ৬৮
১. সূরা লাহাব শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে এবং মুখস্থ	সূরা লাহাব	সূরা লাহাব- পৃ. ৬৮

বলতে পারবে। ২. তারা সূরা লাহাব সালাতে পড়তে পারবে।		
১. সূরা আল-ইখলাস শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে ও মুখস্থ বলতে পারবে। ২. শিক্ষার্থীরা সালাতে শুদ্ধভাবে পড়তে পারবে।	সূরা আল-ইখলাস	সূরা ইখলাস- পৃ. ৬৯

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কুরআন মজিদ শিক্ষা: এ অধ্যায়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মজিদ শিক্ষার ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে কুরআন মজিদ এর পরিচয় উপস্থাপন করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি বর্ণমালা: কুরআন মজিদের ভাষা যেহেতু আরবি তাই কুরআন মজিদ পড়ার জন্য আরবি বর্ণমালা চেনা জরুরি। তাই প্রথমে ২৯টি আরবি বর্ণমালার চার্ট উপস্থাপন করা হয়েছে আরবি বর্ণগুলোর বাংলা উচ্চারণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

হরকত: আরবিতে তিনটি হরকত বা স্বরচিহ্ন রয়েছে। যেমন- যবর, যের এবং পেশ, এগুলো কিভাবে উচ্চারিত হবে, শব্দের এগুলোর ব্যবহার ও উচ্চারণ কেমন হবে তা আলাদা ৩টি চার্টে শব্দের উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তানবীন: দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে তানবীন বলে। ২৯টি হরফে তানবীনের ব্যবহার চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জযম: জযমের পরিচয় ও জযমযুক্ত শব্দের একটি চার্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তাশদীদ: আরবিতে একই বর্ণ দ্বিত্ব/যুক্তাক্ষর হলে তাকে তাশদীদ বলে। তাশদীদ এর ব্যবহার ও তাশদীদযুক্ত শব্দের একটি চার্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

মাদ্দ: আরবিতে কিছু হরফ টেনে পড়ার নিয়ম রয়েছে যাদের আরবিতে মাদ্দ বলে। এখানে মাদ্দের বিভিন্ন প্রকার, মাদ্দের ব্যবহার, উচ্চারণ ও উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাজবীদ: এখানে তাজবীদের পরিচয় ও তাজবীদের বিভিন্ন নিয়মসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- মাখরাজ, ইদগাম, ইযহার ইত্যাদি। ইদগাম ও ইযহার সম্পর্কে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

আরবি বর্ণের শব্দ: ৩ বর্ণের, ৪ বর্ণের, ৫ বর্ণের ও ৬ বর্ণের মোট চারটি আরবি বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন করে চার্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ সূরা আন নাসর, সূরা লাহাব ও সূরা ইখলাস আরবি ও বাংলা উচ্চারণ অর্থসহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। এটি যেহেতু মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু তাদের বয়স ও সক্ষমতা অনুসারে আরো কয়েকটি সূরা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত বিষয়বস্তুর সাথে কয়েকটি অমিল ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৫৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে ‘‘সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা ফরয। তাই তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার’’। এখানে বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল ‘‘সালাতে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা ফরয”। তাই তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া ফরয’’।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৫৬ এ আরবি বর্ণমালা শিরোনামে যে চার্ট উল্লেখ করা হয়েছে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া এ বিষয়বস্তুটি তৃতীয় শ্রেণিতে শেখানো হয়েছে। তাই এটি এখানে উল্লেখ করে পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের বিরক্তির কারণ হতে পারে।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৬৩ এ ‘‘মাদ্দ’’ নামে যে বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে এখানে কিছুটা অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- যবর এরপর (খালি আলিফ), থাকলে একটু টেনে পড়তে হবে বলা হয়েছে। কিন্তু এই একটু এর পরিমাণ ঠিক কতটুকু হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। এভাবে এ বিষয়বস্তুর আলোচনায় বিভিন্ন প্রকার ‘‘মাদ্দের’’ বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে ‘‘একটু’’ টেনে পড়ার কথা রয়েছে। এখানে ঠিক কি পরিমাণ টানতে হবে তা উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৬৫ এ তাজবীদ এর আলোচনায় তাজবীদ শব্দের অর্থ উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া তাজবীদের গুরুত্ব বর্ণনায় কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ না হলে গুনাহ হবে এই কথা উল্লেখ করে এর পক্ষে অন্তত একটি হাদীস উপস্থাপন করলে যথাযথ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৬৫ এ ‘‘মাখরাজ’’ ও ‘‘ইদগাম’’ এর আলোচনায় এ শব্দগুলোর অর্থ উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ৬৯ এ সুরা ইখলাস এর বাংলা অনুবাদে ৩ নং আয়াতের অনুবাদ যথাযথ হয়নি।

এছাড়া শিক্ষাক্রমের এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে “আরবি শব্দ গঠন” ও ‘‘আরবি বাক্য গঠন ও পঠন’’ নামে দুটি বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলেও পাঠ্যবইয়ে “আরবি শব্দ গঠন” ও ‘‘আরবি বাক্য গঠন ও পঠন’’ নামে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃ.৭০ এ অনুশীলনীতে (ক) বহুনির্বাচনি অংশের আলোচনায় ৫ নং প্রশ্নটি পাঠ্যবিষয়ে আলোচিত হয়নি তাই প্রশ্নটি যথাযথ হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বমোট ১৪টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২৪টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায় (নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ)

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫ম অধ্যায়ে ৭টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি : ১.১০

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. নবি ও রাসুলের পরিচয় ও তাদের জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ২. নবি ও রাসুলগণের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলতে পারবে। তাদের আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবে।	নবি ও রাসুলের পরিচয় ও জীবনাদর্শ	নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ- পৃ. ৭২ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ- পৃ. ৭২
১. মহানবি (স) শৈশব ও যৌবন এবং হিলফুল ফুযুল গঠন সম্পর্কে বলতে পারবে।	মহানবি (স) এর মক্কী জীবন	হিলফুল ফুজুল গঠন- পৃ. ৭৩
১. মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভের ঘটনা বলতে পারবে। ২. মক্কায় তাঁর ইসলাম প্রচারের ঘটনা বলতে পারবে।	মহানবি (স) এর নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার	নবুয়ত লাভ- পৃ. ৭৪ মক্কায় ইসলাম প্রচার- পৃ. ৭৫
১. মহানবি (স) আদর্শ কাহিনীসহ তাঁর জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ২. মহানবি (স) এর শ্রমের মর্যাদা বলতে পারবে।	মহানবি (স) এর জীবনাদর্শে শ্রমের মর্যাদা	শ্রমের মর্যাদা দান- পৃ. ৭৬
১. মহানবি (স) এর দয়া ও ক্ষমা সম্বন্ধীয় ঘটনা জানবে ও বলতে পারবে। ২. মহানবি (স) এর দয়া ও ক্ষমার আদর্শ নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে দয়ালু ও ক্ষমাশীল হবে।	মহানবি (স) এর জীবনাদর্শে দয়া, ক্ষমা ও মাতৃভক্তি	মহানবি (স) এর দয়া- পৃ. ৭৭ মহানবি (স) এর ক্ষমা- পৃ. ৭৮ মহানবি (স) এর মাতৃভক্তি- পৃ. ৭৮
১. হযরত মুসা (আ) এর সংক্ষিপ্ত জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ২. হযরত মুসা (আ) এর নবুয়ত ও তাওরাত লাভের কথা বলতে পারবে।	হযরত মুসা (আ) এর শিক্ষা	হযরত মুসা (আ)- পৃ. ৭৯ হযরত হুদ (আ)- পৃ. ৮২

৩. হযরত হুদ (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ৪. হযরত সালিহ ও ইসহাক (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ৫. হযরত লূত (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ৬. হযরত শুয়াইব (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ৭. হযরত ইলিয়াস (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে। ৮. হযরত যুলকিফল (আ) ও হযরত যাকারিয়া (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।		হযরত সালিহ (আ)- পৃ. ৮২ হযরত ইসহাক (আ)- পৃ. ৮৩ হযরত লূত (আ)- পৃ. ৮৪ হযরত শুয়াইব (আ)- পৃ. ৮৬ হযরত ইলিয়াস (আ)- পৃ. ৮৭ হযরত যুলকিফাল (আ)- পৃ. ৮৮ হযরত যাকারিয়া (আ)- পৃ. ৮৮

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

নবি ও রাসুলগণের পরিচয় ও জীবনাদর্শ: এ অধ্যায়ের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিক্ষক হিসেবে যেসব মহামানব তথা নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের পরিচয়, তাঁদের পাঠানোর উদ্দেশ্য, কুরআনে উল্লেখিত নবি রাসুলের সংজ্ঞা, প্রথম ও শেষ নবি ও রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ, জন্ম ও পরিচয়: মহানবি (স) এর জন্মসাল, তাঁর আব্বা-আম্মা, দাদা-চাচার নাম উল্লেখসহ তাঁর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের নিকট প্রতিপালনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। শিশুকাল থেকে তাঁর স্বভাব চরিত্র কেমন ছিল তাও আলোচনায় ফুটে উঠেছে।

হিলফুল ফুজুল: মহানবি (স) শিশুকাল থেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, তিনি সর্বদা অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ চিন্তা করতেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৫ বছর তখনই তিনি ‘‘হারবুল ফিজার’’ বা অন্যায় সমর দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং যুদ্ধ পরিহার করে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাঁর জন্য হিলফুল ফুজুল বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের প্রচেষ্ঠায় সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এ সংগঠন প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

নবুয়ত লাভ: মহানবি (স) যুবক বয়সেও সর্বদা মানুষের কল্যাণ চিন্তায় নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার পর একদিন তাঁর ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত লাভ করেন। তাঁর কাছে জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত ওহী নাযিল হয়। আলোচনায় সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াতের অর্থ উল্লেখ করা হয়।

মক্কায় ইসলাম প্রচার: মহানবি (স) নবুয়ত লাভের পর ৩ বছর পর্যন্ত নিজ আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম লোকদের দ্বীনের দাওয়াত দেন। তাঁর দাওয়াতে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন হযরত খাদিজা (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)। প্রথম ৩ বছরে মাত্র ৪৫ জন নর-নারী ইসলাম গ্রহণ করেন। ৩ বছর পর আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। এসময় তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন ও বাধা বিপত্তি শুরু হয় এবং তাঁর অনুসারীদের উপর ও নির্যাতন শুরু হয়। কিন্তু মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীগণ আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস রেখে সকল বাধা অতিক্রম করে ইসলাম প্রচার করেন বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

শ্রমের মর্যাদা দান: মহানবি (স) সব সময় নিজের কাজ নিজে করতেন। পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। অপরের কাজও তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। মহানবি (স) এর কাজ ও অপরকে সাহায্য করার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া কাজের লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। ঠিক সময়ে তাদের মজুরি পরিশোধ করার ব্যাপারে মহানবি (স) এর নির্দেশনা আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

মহানবি (স) এর দয়া: মহানবি (স) ছিলেন খুবই দয়ালু। তিনি মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সব কিছুর প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদের খাদ্য দিতেন, অসুস্থদের সেবা করতেন, গরিব, ভিক্ষুক, ইয়াতিম ও অসহায়দের প্রতিও দয়া দেখাতেন। এমনকি তিনি কাফিরদের প্রতিও দয়ালু ছিলেন। তাঁর দয়া সমগ্র সৃষ্টিকুলব্যাপী পরিব্যাপ্ত ছিল বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

মহানবি (স) এর ক্ষমা: মহানবি (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। তিনি চরম শত্রুকেও ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর ক্ষমার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়। মক্কা বিজয়ের পরে মক্কার কাফিরদের ক্ষমা করার কথাও আলোচনায় স্থান পায়।

মহানবি (স) এর মাতৃভক্তি: মহানবি (স) আমাদের মায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তা শিখিয়ে গেছেন। ৬ বছর বয়সে মহানবি (স) এর আম্মা ইন্তেকাল করায় তিনি মায়ের সেবা করতে না পারলেও তিনি দুধ মা হালিমা (রা) এর সাথে চরম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, সম্মান করতেন। এ বিষয়ে একটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়।

হযরত মুসা (আ): এ অংশের আলোচনায় হযরত মুসা (আ) এর বিস্তারিত পরিচয় উল্লেখ করা হয়। মুসা (আ) এর জন্ম, তাঁর পিতা-মাতার নাম ফিরআউন ও কিবতি বংশের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব আলোচনায় স্থান পায়। জন্মের পর নাটকীয়ভাবে চিরশত্রু ফিরআউনের রাজপ্রাসাদে লালন পালন, মাদইয়ান গমন, হযরত শুয়াইব (আ) সাথে সাক্ষাৎ ও বিয়ের ঘটনা, নবুয়ত লাভ, আল্লাহর সাথে মুসা (আ) এর কথোপকথন, মুসা (আ) এর তাওরাত কিতাব লাভ করা। দলবলসহ ফিরআউন ও তাঁর অনুসারীদের নীলনদে ডুবে মারার ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

হযরত হুদ (আ) ও আদ জাতির ঘটনা: আদ জাতির অবাধ্যতা ও তাদের উপর আল্লাহর ভয়াবহ আযাব ও গজবের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সালিহ (আ) ও তাঁর কওম সামুদ জাতি, সামুদ জাতির অবাধ্যতা, তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিলের ঘটনা, ইসহাক (আ) ও তাঁর কওমের ঘটনা, হযরত লূত (আ) ও তাঁর অবাধ্য কওমের উপর আল্লাহর আযাব, হযরত ইলিয়াস (আ) ও তাঁর অবাধ্য কওমের

ঘটনা, হযরত যুলকিফল (আ) ও হযরত যাকারিয়া (আ) ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়। এ অধ্যায়ে মহানবি (স) ও মুসা (আ) ছাড়াও আটজন নবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপন করা হয়।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আলোচনায় ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। নবিদের জীবনী আলোচনায় নবিদের আগমনের শুরু বা শেষ ক্রম অনুযায়ী জীবনী উল্লেখ করা হলে আলোচনা খুবই ফলপ্রসু হতো বলে মনে হয়। এছাড়া পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৭৫ এ সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াতের শুধু অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত আরবি, বাংলা উচ্চারণসহ অর্থ উল্লেখ করলে যথাযথ হতো।

পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বমোট ৭টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ১৭টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

পঞ্চম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় (আকাইদ বিশ্বাস)

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১ম অধ্যায়ে ১০টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.১১

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. আল্লাহ তায়ালার পরিচয় জানবে, বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে। ২. আল্লাহ তায়ালাকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করবে ও তাঁর আদেশমত চলবে।	মহান আল্লাহর পরিচয়	আকাইদ বিশ্বাস- পৃ. ১ আল্লাহ তায়ালার পরিচয়- পৃ. ১
১. মহান আল্লাহর গুণাবলি জানবে এবং বলতে পারবে। ২. মহান আল্লাহর গুণাবলির উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করবে।	মহান আল্লাহর গুণাবলি	আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি- পৃ. ৪
১. মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা জানবে, বিশ্বাস করবে এবং বলতে পারবে।	মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা	আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা- পৃ. ৪

২. আল্লাহ তায়ালার দানসমূহের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।		
১. তারা আল্লাহর ‘গাফুর’ নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে।	মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল	আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল- পৃ. ৮
১. ‘হালীম’ নামের অর্থ বলতে পারবে এবং সহনশীলতা কী তা বলতে পারবে। ২. মহান আল্লাহর সহনশীলতার উদাহরণ বলতে পারবে। মহান আল্লাহর এ গুণের আদর্শ গ্রহণ করবে।	মহান আল্লাহ সহনশীল	আল্লাহ অতি সহনশীল- পৃ. ৮
১. ‘সামীউন’ নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা মহান আল্লাহকে হাযির-নাযির জানবে। ৩. পাপকথা ও কর্ম থেকে বিরত থাকবে।	মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা	আল্লাহ সর্বশ্রোতা- পৃ. ৯
১.‘বাসীর’ নামের অর্থ ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা মহান আল্লাহকে সর্বদ্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে হাযির-নাযির জেনে সবরকম পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে।	মহান আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা	আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা- পৃ. ৯
১. আল্লাহর ‘কাদীর’ নামের অর্থ এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরত সম্পর্কে বলতে পারবে ও বিশ্বাস করবে। ২. আল্লাহর প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।	মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান	আল্লাহ সর্বশক্তিমান- পৃ. ৯
১. নবি-রাসুলগণের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে। ২. নবি-রাসুলগণের আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের কাজ সম্পর্কে বলতে পারবে। ৩. তারা নবি-রাসুলগণকে বিশ্বাস করবে এবং তাঁদের শিক্ষা অনুসরণ করবে।	নবি-রাসুলগণের পরিচয়	নবি-রাসুলের পরিচয়- পৃ. ১০
১. আখিরাত শব্দের অর্থ এবং আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব বলতে পারবে।	আখিরাত	আখিরাতের প্রতি ইমান- পৃ. ১২
১. কবরের জীবন সম্পর্কে বলতে পারবে এবং	বিষয়বস্তু উল্লেখ নেই	কবরে সওয়াল-জওয়াব-

বিশ্বাস করবে।		পৃ. ১৩
১. মিজান শব্দের অর্থ, হিসাব নিকাশ ও বিচারের ভয়ে সতর্ক থাকা সম্পর্কে বলতে পারবে।	মিজান	হাশর- পৃ. ১৫ মিজান- পৃ. ১৫
১. কিয়ামতের পরিচয় ও তাৎপর্য বলতে পারবে।	কিয়ামত	কিয়ামত- পৃ. ১৫
১. জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয় বলতে পারবে। ২. জান্নাত লাভের আশায় ভালো কাজ করবে। ৩. জাহান্নামের ভয়ে পাপের কাজ থেকে বিরত থাকবে। ৪. আখিরাতের প্রতি ইমানের নৈতিক উপকার সম্পর্কে বলতে পারবে।	জান্নাত ও জাহান্নাম	জান্নাত ও জাহান্নাম- পৃ. ১৫ আখিরাতে বিশ্বাসের নৈতিক উপকার- পৃ. ১৬ একজন মুসলিমের চরিত্র- পৃ. ১৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আকাইদ বিশ্বাস: এ অধ্যায়ের শুরুতে মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয় প্রদানে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। পৃথিবীতে স্রষ্টা ছাড়া আপনা-আপনি যে কিছুই সৃষ্টি হতে পারেনা তা উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ যে এ জগতের সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য কি কি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন তাও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর প্রতি ইমান আনার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামত, হাশর, মিজান ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইমানের পরিচয়, মুমিনের পরিচয়, আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য যে ইমানের প্রয়োজন সে কথাও বলা হয়েছে। এখানে আল্লাহ তায়ালার বেশ কয়েকটি গুণবাচক নামের বিস্তারিত পরিচয় ও সে গুণগুলো আমাদের অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ সারা বিশ্বের পালনকর্তা: আল্লাহ তায়ালা এ জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের সব কিছুর লালন পালন তিনিই করেন। গাছপালা, জীবজন্তু, পশুপাখি, পোকা-মাকড় সমুদ্রের মাছসহ সব জীবেরই খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সবারই খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেন তিনি। পৃথিবীর সব প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য পানির ব্যবস্থা করেন। প্রাণী জগতের খাদ্য ও পানি বন্টনের উদাহরণ দিয়ে এখানে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই আমাদের উচিত তার শোকর আদায় করা। এখানে কিভাবে শোকর আদায় করবে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, মানুষ মাত্রই ভুল, মানুষ ভুল করলেও মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। এমনকি যতবড় পাপই হোক না কেন তার নিকট ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তাই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আল্লাহ অতি সহনশীল, তিনি সহনশীলতা পছন্দ করেন এটি তাঁর বিশেষ গুণ। আমরা অপরাধ করলে তিনি সাথে সাথে শাস্তি দেন না

বরং আমাদের সংশোধনের সুযোগ দেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এটিও মহান আল্লাহর বিশেষগুণ। তিনি মহাবিশ্বে যাই হোক না কেন সবই তিনি শুনেন ও দেখেন। আমরা প্রকাশ্য কিংবা গোপনে যা বলি, যা করি, এমনকি মনে মনে যা কল্পনা করি তিনি সবই শোনেন ও দেখেন। গভীর সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র জীবও তার প্রশংসা করে তিনি সেসব শোনেন ও দেখেন। তার অগোচরে কিছুই নেই। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, এ জগতের সব কিছুই আল্লাহর অধীন। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। এখানে আল্লাহর ছয়টি গুণবাচক নাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর এসব গুণের উপর আমাদের ইমান আনার কথা বলা হয়েছে।

নবি-রাসুলের পরিচয়ঃ ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক বিশ্বাস হলো নবি-রাসুলের প্রতি বিশ্বাস। মহান আল্লাহ তার বিধি-বিধান আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। নবি-রাসুলগণ আল্লাহর বিশেষ পরিচালনায় নিষ্পাপ ছিলেন। তারা আমাদের শিক্ষক, তারা শিক্ষা দেন কিসে আমাদের কল্যাণ, কোন পথে গেলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কিসে আমাদের অকল্যাণ ও কোন পথে গেলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। এসব শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন। কিন্তু তারা দমে যাননি। আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নবি-রাসুলগণের ছয়টি মূল শিক্ষা এখানে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় সর্বশেষ নবি ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স) তার পরে আর কোন নবি আসবেন না।

আখিরাতের প্রতি ইমানঃ মানুষের মৃত্যুর পর আরেক জগত শুরু হয় তার নাম আখিরাত। আখিরাতে বিশ্বাস করাও ইমানের মৌলিক অংশ। আখিরাত জীবনের শুরু আছে শেষ নেই। এখানে আখিরাত জীবনের সাতটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। কবর, মানুষের মৃত্যুর পর কবরের জীবন শুরু হয়। এটি আখিরাত জীবনের ১ম স্তর, কবরের জীবনের শুরুতে প্রত্যেক মানুষকে ৩টি প্রশ্ন করা হবে। উত্তরের ভিত্তিতে কবরে আরাম অথবা আজাব শুরু হবে। যারা মুমিন তারা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে, তারা কবরে আরামে থাকবে। আর যারা পাপী তারা সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে ফলে তারা কবরে আজাব ভোগ করবে। কিয়ামত, হাশর, মিজান, জান্নাত ও জাহান্নাম, এ সুন্দর পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে। আল্লাহর আদেশে কিয়ামত সংগঠিত হবে। কেবল আল্লাহ ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে একাকার হয়ে যাবে। কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার বহু বছর আল্লাহ মানুষের ভালোমন্দ, পাপ পূণ্যের বিচারের জন্য সবাইকে হাশরের ময়দানে একত্র করবেন। মিজানে মানুষের পাপ পূণ্য ওজন করে যাদের ভালো কাজের পরিমাণ বেশি তাদের জান্নাত দিবেন। আর যাদের মন্দ কাজের পরিমাণ বেশি তাদের জাহান্নামে দিবেন। এখানে খুব সংক্ষেপে আখিরাত জীবনের স্তরগুলো আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে আখিরাতে বিশ্বাসের নৈতিক উপকার আলোচনা করা হয়। আখিরাতে বিশ্বাসী একজন মানুষের চরিত্র কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়। পরিশেষে একজন মুসলিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা আলোকপাত করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের উল্লিখিত বিষয়বস্তুগুলো সাবলীলভাবে ফুটে উঠলেও কয়েকটি বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে উল্লেখ না করে শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১টি বিষয়ের আলোচনা

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে উল্লেখ না থাকলেও পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে এসব অসংগতি উপস্থাপন করা হলো:

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ১৩ এ ''কবরে সাওয়াল-জওয়াব'' এ বিষয়বস্তুটি শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুতে উল্লেখ করা হয়নি। এ বিষয়ে একটি শিখনফল উল্লেখ করা হয়।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ১৫ এ ''কিয়ামত, হাশর, মিজান'' এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা আরো বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল। লেখকের জন্য নির্দেশনায় কিয়ামত এর আলোচনায় ''কিয়ামতের আলামত'' উল্লেখ করার নির্দেশনা থাকলেও তা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া লেখকের জন্য নির্দেশনায় ''কবর, মিজান, কিয়ামত'' এ বিষয়গুলোর প্রতি ''ইমান আনার গুরুত্ব'' আলোচনা করার নির্দেশনা থাকলেও এ বিষয়ে পাঠ্যবইয়ে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ১৫ এ ''জান্নাত ও জাহান্নাম'' এ বিষয়ের আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এখানে জান্নাত ও জাহান্নামের সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক আরো বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য নির্দেশনায় ''জান্নাত লাভের উপায়'' আলোচনা করার নির্দেশনা থাকলেও এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে কোন আলোচনা করা হয়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃ. ১৭ এ ''একজন মুসলিমের চরিত্র'' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষাক্রমে কোন শিখনফল ও বিষয়বস্তু কোনটির জন্যই নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তবে বিষয়বস্তুটি খুবই উপকারী।

প্রথম অধ্যায়ে মোট ১০টি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২৮টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আলোচিত কয়েকটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষাক্রমে নির্দেশনা না থাকলেও আলোচিত হয়েছে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায় (ইবাদত)

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.১২

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর

		শিরোনাম
১. ইবাদতের পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং কয়েকটি ইবাদতের নাম বলতে পারবে।	ইবাদত	ইবাদত- পৃ. ২২ পাক-পবিত্রতা- পৃ. ২৪
১. সালাতের অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময় বর্ণনা করতে পারবে। ২. নিয়মিত জামাআতে সালাত আদায় করবে।	সালাত	সালাত- পৃ. ২৪ সালাতের সময়- পৃ. ২৬ সালাতের নিষিদ্ধ সময়- পৃ. ২৮
১. সালাতের সময় ও নিয়ম বলতে পারবে। ২. তারা সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে পারবে।	সালাতের নিয়ম	সালাত আদায়ের নিয়ম- পৃ. ২৯
১. আহকাম-আরকান বলতে পারবে। ২. তারা সালাতের নিয়ম কানুন বলতে পারবে।	সালাতের আহকাম-আরকান	সালাতের আহকাম আরকান- পৃ. ৩৫
১. সালাতের ওয়াজিবগুলো কী কী তা বলতে পারবে। ২. তারা সালাতের ওয়াজিব আদায় করার নিয়ম বলতে পারবে।	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	সালাতের ওয়াজিব- পৃ. ৩৭
১. সিজদাহ সাহু কী তা বলতে পারবে। ২. সিজদাহ সাহু আদায় করতে পারবে।	সিজদাহ সাহু	সাহু সেজদা- পৃ. ৩৮
১. মসজিদের আদবগুলো কী কী তা বলতে পারবে। ২. মসজিদের আদবগুলো পালন করবে।	মসজিদের আদব	মসজিদের আদব- পৃ. ৩৮
১. সাওমের সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. নিয়মিত সাওম পালন করতে পারবে।	সাওম	সাওম- পৃ. ৪০
১. যাকাতের পরিচয়, গুরুত্ব, তাৎপর্য ও নিয়ম, নিসাব ও খাত সম্পর্কে বলতে পারবে। ২. হিসাব করে যাকাত আদায় করতে পারবে।	যাকাত	যাকাত- পৃ. ৪৩
১. হজ শব্দের অর্থ, তাৎপর্য ও গুরুত্ব বলতে পারবে।	হজ	হজ- পৃ. ৪৫
১. কুরবানির অর্থ, উদ্দেশ্য এবং নিয়ম পদ্ধতি বলতে পারবে। ২. কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষা	কুরবানি	কুরবানি- পৃ. ৪৮

সম্পর্কে বলতে পারবে।		
১. আকীকার পরিচয়, আকীকা করার নিয়ম ও পদ্ধতি বলতে পারবে।	আকীকা	আকীকা- পৃ. ৫১
১. ব্যবহারিক দোয়াসমূহ জানবে এবং বলতে পারবে। ২. মসজিদে প্রবেশের ও বাহির হওয়ার দোয়া অর্থসহ শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ বলতে পারবে।	ব্যবহারিক দোয়া	ব্যবহারিক দোয়া- পৃ. ৫২
১. পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বলতে পারবে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে।	পরিচ্ছন্নতা- মুখ, দাঁত, হাত, পা	পরিচ্ছন্নতা- পৃ. ৫৪
১. নিজ ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আন্তরিক হবে। ২. সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে।	নিজ ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা এবং সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।	ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা- পৃ. ৫৫, সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া- পৃ. ৫৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

ইবাদতঃ এ অধ্যায়ের শুরুতে ইবাদত এর পরিচয় প্রদান করে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর যাবতীয় আদেশ, নিষেধ মেনে চলাকে ইবাদত বলে। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, সব কিছু মানুষের অধীন ও অনুগত করে দিয়েছেন । কিন্তু আল্লাহ মানুষ ও জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আলোচনায় কতগুলো নির্ধারিত মৌলিক ইবাদত উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, সাদকা, দান-খয়রাত, আল্লাহর পথে জিহাদ ইত্যাদি। এসব ইবাদত শিক্ষা দিয়েছেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তাই তিনি যেভাবে যে ইবাদত করতে শিখিয়েছেন সেভাবেই আমাদের ইবাদত করা উচিত। এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকে কিভাবে ইবাদতে রূপান্তর করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবাদত তথা আল্লাহর অনুগত থাকলে পরকালে জান্নাত লাভ করা যাবে, না হয় জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

পাক-পবিত্রতাঃ ইবাদতের পূর্বশর্ত হলো পাক-পবিত্রতা। পাক-পবিত্র হওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন-ওযু, গোসল, তায়াম্মুম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সালাতঃ সালাতের পরিচয়, ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাতের অবস্থান, সালাতের গুরুত্ব, সালাতের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় বলা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সালাত, সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

সালাত মানুষকে দুনিয়ায় অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে ও পরকালেও মুক্তির মাধ্যম হবে সালাত। সালাত যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে পড়া ফরয। তাই এখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় বর্ণনা করা হয়েছে। সালাতের তিনটি নিষিদ্ধ সময় রয়েছে এগুলো ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাতের রাকায়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সালাতের ফরযসমূহ তথা আহকাম-আরকান এবং সালাতের ওয়াজিবসমূহসহ সালাত আদায়ের বিস্তারিত নিয়ম সচিত্র উল্লেখ করা হয়েছে। সালাত আদায় করতে মসজিদে গিয়ে কিছু আদব রক্ষা করা উচিত। যেহেতু আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ স্থান হলো মসজিদ। আলোচনায় আরো বলা হয় সুন্দর সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি সৃষ্টিতে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

সাওম: ইসলামের প্রধান পাঁচটি রুকনের অন্যতম হলো সাওম। সাওম একটি শারীরিক ইবাদত। এটি ধনী-দরিদ্র সকলের উপর ফরয। সাওম আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের উপরও ফরয ছিল। কেননা এটি তাকওয়া অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পাপাচার ও লোভ লালসা থেকে বেঁচে থাকার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আর সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় কেবল সাওমের মাধ্যমে। দীর্ঘ একমাস সাওম পালনের মাধ্যমে মুসলমানরা আত্মরক্ষা ও আত্মশুদ্ধি করতে পারে। অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। দরিদ্র অসহায় ও ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার জ্বালা বুঝতে পারে। ফলে ধনীরা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। এতে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সাওমের প্রতিদান মহান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে সাওম পালনকারী আল্লাহর কাছে উচ্চতর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করবেন বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সাওমের নিয়ত, ইফতারের দুয়া ও তারাবির সালাত সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

যাকাত: যাকাত ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি একটি আর্থিক ইবাদাত। এটি ধনীদের সম্পর্কে গরিবের হক। এখানে যাকাতের তিনটি অর্থ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাহলো পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং বৃদ্ধি। আলোচনায় বলা হয় ‘‘সম্পদের মালিকানা আল্লাহর’’। আর এই সম্পদ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী গরিবদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যাকাত যারা দিবে না তারা পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। এছাড়া যাকাতের নিসাবের বর্ণনা দেয়া হয়। কোন সম্পদ কতটুকু থাকলে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে তা উল্লেখ করা হয়। আর যাকাত দেওয়ার জন্য যে নির্ধারিত আটটি খাত রয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়।

হজ: হজ ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদত। সামর্থ্যবান মুসলিমদের জন্য এটি ফরজ। নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কতগুলো অনুষ্ঠান পালন করাকে হজ বলা হচ্ছে। এখানে হজের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত ছাড়াও এটি বিশ্ব মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠে। দেশ, ভাষা, জাতি, বর্ণ কোন ভেদাভেদ থাকে না। এছাড়া হজের তিনটি ফরয ও তা কিভাবে আদায় করতে হয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

কুরবানি: নিসাব পরিমাণ মালের মালিকদের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। কুরবানি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মুসলমানদের সর্বোচ্চ ত্যাগসহ হালাল পশু জবাই করা। এটি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাইল (আ) এর অতুলনীয় নিষ্ঠা ও ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানি করতে হয়, কখন কুরবানি করতে হয় ইত্যাদি ছাড়াও কুরবানি প্রচলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কুরবানির শিক্ষা আলোচনা করা হয়েছে।

আকিকা: আকিকা হলো পিতামাতার প্রতি সন্তানের অধিকার। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কল্যাণ ও হিফাযত কামনায় আল্লাহর ওয়াস্তে হালাল পশু জবাই করাই হলো আকিকা। আকিকা করা সুন্নত। এখানে সন্তান জন্মের পর প্রথম সাতদিনে পিতামাতার যে চারটি কাজ করতে হয় তা উল্লেখপূর্বক আকিকা আদায়ে নিয়ম আলোচিত হয়েছে।

ব্যবহারিক দোয়া: মুসলমানরা চাইলে তাদের দৈনন্দিন সকল কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে কতিপয় দোয়া পড়ার মাধ্যমে। এখানে কোন কাজের সময় কি দোয়া পড়তে হয় এরকম এগারটি দোয়া আরবি, বাংলা উচ্চারণসহ অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিচ্ছন্নতা: আমরা জানি পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। এখানে বিভিন্ন ধরনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবেশ, আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-মুখ, দাঁত, হাত-পা ইত্যাদির পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আন্তরিকতা: মানুষের সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এখানে আমাদের ইবাদতে বিশুদ্ধ নিয়ত ও নিষ্ঠার গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজসহ যাবতীয় ইবাদত আমাদের নিষ্ঠার সাথে করার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া: সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষদের বহুজাতি, দেশ, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত করে আল্লাহর এক অপূর্ব কুদরত প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আমাদের সকল মানুষের, ধর্ম, বর্ণ, জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, উদার ও সহনশীল হওয়া। কেননা আমরা একই আদম-হাওয়ার সন্তান। রাসুল (স) ও আমাদেরকে অন্য ধর্ম ও জাতির লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার ও সহিষ্ণু হওয়ার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে মহানবি (স) এর জীবনে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে তাঁর আচরণ কেমন ছিল তাও সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। তবে কয়েকটি বিষয়ে একটু পরিমার্জন করলে আলোচনা আরো যথাযথ হতো। যেমন-

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-২৪ এ ‘‘পাক-পবিত্রতা’’ এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়টি শিক্ষাক্রমের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতায় উল্লেখ করা হলেও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, বিষয়বস্তু ও লেখকের জন্য নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-২৮ এ একটি ছকে (চার্টে) সালাতের ওয়াক্ত ও রাকায়াত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছকে কোন ওয়াক্তে কত রাকায়াত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ, ফরয ও ওয়াজিব উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু

এখানে কোন ওয়াক্তে কত রাকাআত সুন্নতে যায়িদাহ রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে সুন্নতে যায়িদাহসহ আলোচনা করলে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৩২, ৩৩, ৩৪ এ সালাত আদায়ের নিয়ম অংশের আলোচনায় ''আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রাব্বানা লাকাল হামদ, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা'' এগুলো বাংলা উচ্চারণে লিখা হয়েছে। এগুলো আরবিসহ বাংলা উচ্চারণ লিখলে আলোচনাটি আরো সুন্দর হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৪২ এ ''সাওমের নিয়ত'' নামে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সাওমের নিয়ত করতে হয় বলে বাংলায় দুটি বাক্য লিখা হয়েছে, ''আল্লাহ আমি আগামীকাল রমজান মাসের ফরয সাওম রাখার নিয়ত করলাম। তুমি দয়া করে আমার সাওম কবুল করো''। এ কথাটি ভুল ও ভিত্তিহীন। কারণ নিয়ত মুখে বলে করতে হয়না। নিয়তের সম্পর্ক মনের সাথে। তাই এই বাক্যগুলো সাওমের নিয়ত বলে উল্লেখ করা ঠিক হয়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৪৫ এ ''হজ'' এ বিষয়ের আলোচনায় হজ শব্দের অর্থ বলা হয়েছে। ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, কোন সম্মানিত স্থান দর্শনের সংকল্প করা''। এখানে কোন সম্মানিত স্থান দর্শনের সংকল্প করা অর্থটি ঠিক হয়নি। এখানে বায়তুল্লাহ বা কাবাঘর দর্শনের সংকল্প করা লিখলে যথার্থ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৪৭ এ ''হজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য'' এ অংশের আলোচনায় ''লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'' এ দুয়াটি বাংলায় লেখা হয়েছে। এটি আরবিসহ লিখলে যথার্থ হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৪৭ এ ''হজের ফরয'' এ বিষয়ের আলোচনায় ইহরামের সাথে সাথে হাজীদের যে দু'য়া বা তালবিয়াহ পড়তে হয় তা বাংলা উচ্চারণে ''লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা-শারিকালাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়াননিমাতা লাকাওয়াল মূলক লা শারীকা লাকা'' লেখা হয়েছে। এ দোয়াটি আরবি বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ উল্লেখ করলে যথার্থ হতো।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সর্বমোট ১৫টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২৭টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায় (আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ)

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৩য় অধ্যায়ে ১০টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। আর প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.১৩

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. আখলাক শব্দের অর্থ, আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা ভালো আচরণ করতে এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকতে পারবে।	আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ	আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ- পৃ. ৬৪
১. সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করার গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. তারা সবসময় সৃষ্টির সেবা ও সাহায্য করবে।	সৃষ্টির সেবা	সৃষ্টির সেবা- পৃ. ৬৫
১. দেশপ্রেমের ধারণা, গুরুত্ব এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের শিক্ষা বলতে পারবে। ২. দেশকে ভালোবাসবে এবং জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে সতর্ক হবে।	দেশপ্রেম	দেশপ্রেম- পৃ. ৬৮
১. ক্ষমার পরিচয়, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. অন্যকে ক্ষমা করতে পারবে।	ক্ষমা	ক্ষমা- পৃ. ৭০
১. ভালো কাজে সহযোগিতা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।	ভালো কাজে সহযোগিতা করা ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া	ভালো কাজের সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া- পৃ. ৭২
১. সততার গুরুত্ব বলতে পারবে ও সৎ হবে।	সততা	সততা- পৃ. ৭৪
১. মাতা-পিতার খেদমত করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা মাতা-পিতার খেদমত করতে পারবে।	মাতা-পিতার খেদমত	পিতা-মাতার খেদমত- পৃ. ৭৬
১. শ্রমের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা নিজের কাজ নিজে করতে পারবে।	শ্রমের মর্যাদা	শ্রমের মর্যাদা- পৃ. ৭৮
১. মানবাধিকার ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে সতর্ক	মানবাধিকার ও বিশ্ব	মানবাধিকার ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব-

থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে পারবে। ২. তারা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।	ভ্রাতৃত্ব	পৃ. ৮১
১. পরিবেশ সম্বন্ধে বুঝতে পারবে ও তা সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে। ২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে ও সমাজকে রক্ষা করতে পারবে।	পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	পরিবেশ- পৃ. ৮৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগ- পৃ. ৮৪

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ: এ অধ্যায়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শুরুতে আখলাকের পরিচয় প্রদান করে কয়েকটি ভালো ও মন্দ আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। আলোচনায় বলা হয়েছে যার চরিত্র সুন্দর নয় কেউ তাকে ভালোবাসে না। ভালো চরিত্রের মধ্যে সত্য কথা বলা, পিতা-মাতার কথা শোনা, শিক্ষককে সম্মান করা, জাতীয় সম্পদ নষ্ট করা, শিক্ষকের সাথে ভালো ব্যবহার না করা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আখলাক ও নৈতিক মূল্যবোধের আদর্শ কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে ভালো আচরণ করা যায় ও মন্দ আচরণ থেকে দূরে থাকা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে।

সৃষ্টির সেবা: এ বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিত আল্লাহর সৃষ্টির সেবা করা। এসবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা। সৃষ্টির সেবা করার গুরুত্ব সম্পর্কে দুটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির সেবা করলে কি উপকারিতা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে এক মহিলা ও পিপাসার্ত কুকুরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

মানুষের সেবা করা: অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা, কেউ বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা ইত্যাদিকে সৃষ্টির সেবা হিসেবে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। এছাড়া জীবজন্তু, পশুপাখি, গরু-ছাগল, কীটপতঙ্গ, গাছপালা, কুকুর-বিড়ালসহ কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়ার কথা আলোচনায় স্থান পেয়েছে। সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে এক ছাত্র এক গাড়োয়ানকে সাহায্য করার ঘটনা আদর্শকাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয়নবি (স) কে সৃষ্টির সেবার মূর্ত প্রতীক ও সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ উপাধিটি উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশপ্রেম: জ্ঞানীরা বলে গেছেন ‘‘দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ’’। কেন দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশপ্রেম কিভাবে প্রকাশিত হয়, কোন কোন কাজ করলে দেশের সেবা করা হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ (স) এর দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ করে তাঁর জন্মভূমি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় যে কষ্ট ও দেশপ্রেম অনুভব করেছিলেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। দেশকে ভালোবাসা ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা করাকে আমাদের নৈতিক ও ইমানী দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষমা: এটি মহান আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। মানুষ জীবন চলার পথে জেনে বা না জেনে নানান ভুল করে থাকে। কিন্তু মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তা সাথে সাথে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহর এ গুণটি মানুষ অর্জন করতে পারলে চরিত্র সুন্দর হয়। সমাজে শান্তি ফিরে আসে। তাই এখানে ক্ষমা করাকে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে সবাই ভালোবাসেন এবং আল্লাহও ভালোবাসেন বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবি (স) ছিলেন মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমাশীল। তাঁর সারাজীবনই ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ। এ বিষয়ক দুটি ছোট্ট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো তায়েফবাসীকে ক্ষমা করার ঘটনা, অন্যটি হলো মক্কাবাসীকে ক্ষমা করার ঘটনা।

ভালোকাজে সহযোগিতা করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া: আল্লাহর সৃষ্টিজগতের জন্য যা কিছু কল্যাণকর সবই ভালোকাজের অন্তর্ভুক্ত। তা ছোট কিংবা বড় কাজ হোক। এখানে অনেকগুলো ভালোকাজের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। গ্রাম বা সমাজে সুন্দর পরিবেশের জন্য সকলে মিলে কাজ করলে সমাজ সুন্দর হয়। শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার পাশাপাশি গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করতে পারে। ভালো কাজে বড়দের সাহায্য করতে পারে সেটা হোক পরিবার, বিদ্যালয় বা এলাকার অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ। সকল ধরনের খারাপ ও অসৎ কাজই মন্দ কাজ। সেটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এখানে অনেকগুলো মন্দকাজের উদাহরণ দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করতে হয় সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দ কাজে বাধা প্রদান সম্পর্কে মহানবি (স) এর একটি হাদিসও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে সাহাবীদের (রা) জীবনাদর্শ ও উল্লেখ করে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ভালো কাজে সহযোগিতা ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী উল্লেখ করে সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সততা: সততা, সাধুতা, সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক। যারা নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেনা এবং অন্যের স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক সেটাও চায়না তাদেরকেই সৎ ব্যক্তি বলা হয়। এ গুণটি সব মানুষেরই থাকা উচিত। সৎ ব্যক্তিকে চরম শত্রুরাও বিশ্বাস করে। সততা মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অপরদিকে সততার অনুপস্থিতি সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। সততা না থাকলে প্রতারণা ও দুর্নীতি সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমাদের মহানবি (স) এর হিজরতের সময়ের একটি ঘটনা ও হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলের একটি ঘটনা আদর্শ কাহিনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

পিতা-মাতার খেদমত: এ পৃথিবীতে যাদের ওসিলায় আমরা জন্মলাভ করেছি তাঁরা হলেন আমাদের পিতা-মাতা। শিশুকাল থেকে অতিযত্নে তাঁরা আমাদের লালন-পালন করে বড় করেছেন। নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে আমাদের সুখী করেছেন। আদব-কায়দা, পড়ালেখা শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের সুখে তাঁরা আনন্দ পান, আমাদের কষ্টে ব্যথিত হন। পৃথিবীর সবচেয়ে আপনজন তারাই। তাই আমাদের উচিত পিতা-মাতার সেবা করা। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদের সেবা যত্ন করা। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা। কোনভাবেই পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁরা সন্তানের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাই তাদের যেন সামান্যতম দুঃখ কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা ইত্যাদি আলোচনার

পাশাপাশি এ বিষয়ে কুরআনের বাণী ও মহানবি (স) এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আদর্শ কাহিনী হিসেবে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.) ও তাঁর মায়ের সাথে ঘটে যাওয়া একটি চমৎকার শিক্ষনীয় ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রমের মর্যাদা: এখানে শ্রমের পরিচয় প্রদান করে ইসলামে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলাম কোন কাজকেই ছোট করে দেখে না। মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কেউ ব্যবসা, কেউ চাকরী, কেউ চাষাবাদ ইত্যাদিতে শ্রম দিয়ে থাকে। ইসলাম সবাইকে পরিশ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। মহানবি (স) সব সময় নিজের কাজ নিজে করতেন। মেহমানদের যত্ন নিতেন। আমরা অনেক সময় কাজ করতে লজ্জাবোধ করি। অথচ তা ঠিক নয়। পৃথিবীতে কোন কাজই তুচ্ছ নয়। প্রত্যেক কর্মী ও শ্রমিকের হাতই উত্তম হাত। শ্রমিকদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ন্যায্য মজুরী কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এসব আলোচনার পাশাপাশি শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

মানবাধিকার ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব: মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে গেলে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে মানুষকে চলতে হয়। সমাজে বসবাসকৃত সকল মানুষের অধিকারকে মানবাধিকার বলে। ধনী-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শিশু-বৃদ্ধসহ সকলের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক ও অভিন্ন। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চল এসবের ভিন্নতা থাকলেও সকল মানুষ এক আদম (আ) হতে সৃষ্ট। তাই ইসলাম সকলের ন্যায্য অধিকার দান করেছে। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ বেচাকেনা হতো। ইসলাম আসার পর সকলের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এসকল বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি মহানবি (স) এর জীবনে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি আদর্শ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ: আমাদের চারপাশে যা আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশে যে সকল উপাদান রয়েছে তা সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা এসব উপাদান এক সময় নষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের অপব্যবহারের কারণে অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষের কিছু করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিচয় প্রদানপূর্বক তা থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিজে বাঁচা ও অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করাকে নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত বিষয়বস্তুগুলো সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু একটি বিষয়ের আলোচনায় খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া আরো একটি বিষয়ের আলোচনায় শব্দ চয়ন ঠিক হয়নি। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো:

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৬৪ এ ‘‘আখলাক বা চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ’’ এর আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটির আলোচনায় শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করা হয়নি।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৬৬ এ ‘‘সৃষ্টির সেবা’’ এর আলোচনায় এক মহিলা ও পিপাসার্ত কুকুরের যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তা ৩য় শ্রেণিতে “জীবে দয়া করা” অংশেও উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটির আলোচনায় অন্যকোন ঘটনা উল্লেখ করলে পুনরাবৃত্তি মুক্ত থাকা যেত।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৭১ এ ‘‘ক্ষমা’’ এর আলোচনায় একটি আদর্শ কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মহানবি (স) ও যায়িদ (রা) এর তায়েফে রক্তাক্ত হওয়ার ঘটনায় মুহাম্মদ (স) ও যায়িদ (রা) পালিয়ে আসলেন বলে উল্লেখ করা হয়। এখানে মহানবি (স) এর শানে ‘‘পালিয়ে আসলেন’’ কথাটি বেমানান হয়েছে। এখানে ‘‘কোনভাবে ফিরে আসলেন’’ লেখা যেতো।

এ অধ্যায়ের আলোচনায় যত কুরআনের আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে কোনটির রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়নি। রেফারেন্স উল্লেখ করলে আলোচনা আরো যথার্থ হতো।

তৃতীয় অধ্যায়ে মোট ১০টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ১৯টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায় (কুরআন মজিদ শিক্ষা)

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৪র্থ অধ্যায়ে ১০টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.১৪

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. কুরআন মজিদের পরিচয় বলতে পারবে। ২. কুরআন মজিদ সহীহ করে তিলাওয়াত করতে পারবে।	বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়নি	কুরআন মজিদের পরিচয়- পৃ. ৯১
১. তাজবীদের পরিচয় ও গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. তারা তাজবীদের সাথে কুরআন মজিদ পড়তে পারবে।	তাজবীদ	তাজবীদ- পৃ. ৯২

১. মাখরাজের পরিচয় ও আরবি বর্ণের উচ্চারণের স্থানগুলো বলতে পারবে। ২. আরবি বর্ণগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবে।	মাখরাজ	মাখরাজ- পৃ. ৯২
১. ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন কী তা বলতে ও চিনতে পারবে। ২. তারা বিরাম চিহ্নে নিয়মিত থামতে পারবে।	ওয়াকফ	ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্ন- পৃ. ৯৫
১. গুন্নাহর অর্থ ও গুরুত্ব বলতে পারবে। ২. গুন্নাহর অক্ষরগুলো কী তাও বলতে পারবে।	গুন্নাহ	গুন্নাহ- পৃ. ৯৬
১. সূরা ফীল শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে। ২. তাঁরা এ সূরাটি সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা ফীল	সূরা ফীল- পৃ. ৯৭
১. সূরা কুরাইশ শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে। ২. তারা সূরা কুরাইশ সালাতে পাঠ করবে।	সূরা কুরাইশ	সূরা কুরাইশ- পৃ. ৯৮
১. সূরা মাউন শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে। ২. তারা এ সূরাটি সালাতে পাঠ করতে পারবে।	সূরা মাউন	সূরা মাউন- পৃ. ৯৯
১. সূরা কাউসার শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্থ পড়তে পারবে। ২. তারা এ সূরাটি সালাতে পাঠ করতে পারবে।	সূরা কাউসার	সূরা কাউসার- পৃ. ১০০
১. সূরা কাফিরুন শুদ্ধ উচ্চারণে ও মুখস্থ পড়তে পারবে। ২. তারা এ সূরাটি সালাতে পড়তে পারবে।	সূরা কাফিরুন	সূরা কাফিরুন- পৃ. ১০১

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

কুরআন মজিদ শিক্ষা: এ অধ্যায়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মজিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাজবীদ, মাখরাজ, ওয়াকফ, গুন্নাহসহ পাঁচটি সূরার অর্থসহ আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজিদের পরিচয়ে বলা হয়েছে এটি আল্লাহ তায়ালার বাণী, সর্বশেষ আসমানি কিতাব। যেটি সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর নাজিল হয়। কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করে বলা হয় এ উদ্দেশ্যগুলো সামনে রেখে মহানবি (স) এর সাহাবীগণ কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতেন। এখানে কুরআন মজিদ বুঝে তেলাওয়াত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআন মজিদ বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করলে কি কি সুবিধা ও কি কি জানা যাবে সে বিষয়েও উল্লেখ করা হয়। তাজবীদের আলোচনায় কেবল বলা হয়েছে শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াতের নিয়মকে তাজবিদ বলে।

মাখরাজ: আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। এ বিষয়টি চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। ২৯টি আরবি হরফের ১৭টি মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান বিস্তারিত উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। ওয়াকফ বা বিরাম চিহ্নের আলোচনায় কুরআন মজিদে শুরু থেকে এ চিহ্নগুলো উল্লেখ ছিল না। সর্বপ্রথম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে তাইফুর এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করেন। যাতে আরবি না জানা লোকেরা সহজে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করতে পারে। ওয়াক্‌ফ বা বিরাম চিহ্নগুলো উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গুন্নাহ এর পরিচয় উদাহরণসহ উল্লেখপূর্বক গুন্নাহ করা ওয়াজিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ, সূরা মাউন, সূরা কাউসার ও সূরা কাফিরুন আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে সাবলীলভাবে ফুটে উঠলেও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা খুবই সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য নির্দেশনায় উল্লেখিত দুটি বিষয় পাঠ্যবইয়ে আলোচনা করা হয়নি। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো:

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-৯২ এ ''তাজবীদ'' এর আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছে। এখানে লেখকের জন্য শিক্ষাক্রমে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা পুরোপুরি ফুটে উঠেনি। আরো বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-(৯২-৯৪) এ ''মাখরাজ'' এর আলোচনায় শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য নির্দেশনায় মাখরাজ বা বর্ণ উচ্চারণের স্থান নির্দেশ করে ছবি দেওয়ার নির্দেশনা থাকলেও পাঠ্যবইয়ে তা উল্লেখ করা হয়নি। এখানে এ বিষয়টি ছবিসহ উল্লেখ করলে আলোচনা আরো ফলপ্রসু হতো।

পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-১০০ এ ''গুন্নাহ''এর আলোচনায় শিক্ষাক্রমে লেখকের জন্য নির্দেশনায় মশক বা অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও এ জন্যে কোন উদাহরণ পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করা হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বমোট ১০টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ২০টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরস্পর সংগতিপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায় (মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়)

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৫ম অধ্যায়ে ৮টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে। প্রত্যেকটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে এক বা একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে আমরা তা নিচের সারণিতে বিশ্লেষণ করব।

সারণি: ১.১৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু	পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তুর শিরোনাম
১. মহানবি (স) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে। ২. মহানবি (স) এর আদর্শ নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে পারবে।	মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়	মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়- পৃ. ১০২ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শ- পৃ. ১০২ মহানবি (স) এর জন্ম ও পরিচয়- পৃ. ১০২ আরবের অবস্থা- পৃ. ১০২ শৈশব ও কৈশোর- পৃ. ১০৩ হাজরে আসওয়াদ স্থাপন- পৃ. ১০৪ হযরত খাদিজার (রা) ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ- পৃ. ১০৫ নবুয়ত লাভ- পৃ. ১০৬ ইমানের দাওয়াত- পৃ. ১০৭ ইসলাম প্রচারে তায়েফ গমন- পৃ. ১০৮ মিরাজ গমন- পৃ. ১০৯ মদিনায় হিজরত- পৃ. ১১০ আল্লাহর উপর মহানবি (স) এর ছিল গভীর আস্থা, অটল বিশ্বাস- পৃ. ১১১ মদিনা সনদ- পৃ. ১১১ বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ-পৃ. ১১২ হুদাইবিয়ার সন্ধি- পৃ. ১১৪ মক্কা বিজয়- পৃ. ১১৫

		ক্ষমা- পৃ. ১১৫ বিদায় হজ- পৃ. ১১৬
১. কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম বলতে পারবে।	কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম	কুরআন মজিদে উল্লিখিত নবি-রাসুলগণের নাম- পৃ. ১১৭
১. হযরত আদম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবে। ২. নবি-রাসুলদের আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারবে।	হযরত আদম (আ)	হযরত আদম (আ)- পৃ. ১১৭
১. হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলতে পারবে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস করবে। ২. তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে।	হযরত নূহ (আ)	হযরত নূহ (আ)- পৃ. ১১৯
১. হযরত ইবরাহিম (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে বলতে পারবে। ২. তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারবে।	হযরত ইবরাহিম (আ)	হযরত ইবরাহিম (আ)- পৃ. ১২২
১. হযরত দাউদ (আ) এর জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবে।	হযরত দাউদ (আ)	হযরত দাউদ (আ)- পৃ. ১২৫
১. হযরত সুলায়মান (আ) এর পরিচয় ও জীবনাদর্শ বলতে পারবে।	হযরত সুলায়মান (আ)	হযরত সুলায়মান (আ)- পৃ. ১২৬
১. হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বলতে পারবে। ২. হযরত ঈসা (আ) এর ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করতে পারবে।	হযরত ঈসা (আ)	হযরত ঈসা (আ)- পৃ. ১২৭

পাঠ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ

মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ ও অন্যান্য নবিগণের পরিচয়: এ অধ্যায়ের শুরুতে নবি-রাসুলগণের কতিপয় গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-তারা ছিলেন মানুষের মহান আদর্শ ও শিক্ষক, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, সত্যবাদী, নির্লোভ, নিষ্পাপ, দয়ালু, মানবদরদি ইত্যাদি। এরপর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। মহানবি (স) এর জন্ম ও পরিচয়, আরবের অবস্থা, শৈশব কৈশোর, হাজরে আসওয়াদ স্থাপন, বিয়ে, নবুয়ত লাভ, ইমানের দাওয়াত, ইসলাম প্রচারে তায়েফগমন, মিরাজ, হিজরত, মদিনা সনদ, বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ, হুদাইবিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয়, বিদায় হজ ইত্যাদি আলোচনায় স্থান পায়। আলোচনায় বলা হয় মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২০ এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় আরবের

অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানি, মদ, জুয়া, হত্যা, লুণ্ঠন ছিল আরবদের নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। এসময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল এবং তারা এগুলোর উপাসনা করত। আলোচনায় এ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা মুর্খতার যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। জাহিলিয়াতের অন্ধকার দূর করার জন্য আল্লাহ শান্তির দূত হিসেবে মহানবি (স) কে পাঠান বলেও আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। জন্মের পর মুহাম্মদ (স) বানু সাদ গোত্রে হালিমা নামে এক মহিলার কাছে লালিত পালিত হন। তাঁকে মহানবি (স) এর দুধমা বলা হয়। মহানবি (স) মাত্র ৬ বছর বয়সে তাঁর মাকে হারান। এরপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে লালন পালন করেন। দাদার মৃত্যু হলে চাচা আবু তালিবের নিকট লালিত পালিত হন। শৈশবে তিনি ছাগল-মেষ চড়াতেন। চাচা আবু তালিবের ব্যবসা-বাণিজ্যেও সাহায্য করতেন। শৈশবে হারবুল ফিজার এর ভয়াবহতা দেখে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে যুবকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যার নাম ছিল ‘‘হিলফুল ফুযুল’’ বা শান্তি সংঘ। শিশুকাল থেকে তাঁর সত্যবাদীতা, আমানতদারী, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণের জন্য তাকে আল আমিন, আস-সাদিক উপাধি দেয়া হয়েছিল বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সময় এটি কাবাঘরের দেয়ালে কে স্থাপন করবে এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তা সমাধান করেন। তাঁর সমাধানে সবাই খুশি হলো। পঁচিশ বছর বয়সে আরবের ধনী ও বিদুষী মহিলা খাদিজা (রা) এর সাথে তাঁর চাচা আবু তালিবের পরামর্শে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। খাদিজা (রা) বেঁচে থাকা অবস্থায় তিনি অন্য কোন বিয়ে করেননি।

নবুয়ত লাভঃ মুহাম্মদ (স) শিশুকাল থেকে চিন্তা করতেন কিভাবে মানুষকে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত করা যায়। মূর্তিপূজা, শিরক, কুফর ইত্যাদি থেকে কিভাবে বাঁচানো যায় তা নিয়ে সব সময় চিন্তামগ্ন থাকতেন। অবশেষে তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর রমজান মাসে কদরের রাতে হেরা গুহায় তিনি নবুয়ত লাভ করেন। তখন সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। প্রথম ওহি নাযিলের সময় তিনি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এসব আলোচনার পাশাপাশি সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত অর্থসহ উল্লেখ করা হয়।

ইমানের দাওয়াতঃ নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) সর্বপ্রথম নিকট আত্মীয়দের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করেন। তাঁর দাওয়াতে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজা (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবন হারিসা (রা) এবং তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকর (রা)। তাঁর দাওয়াতে বলেন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, রিযিকদাতা ও পালনকর্তা। তাঁর দাওয়াতে মূর্তি পূজারীরা তাঁর ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তাকে নানান প্রলোভন দেখাতে শুরু করে। সর্বশেষ তাকে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়। এতে তিনি মোটে বিচলিত না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে দ্বীনের দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি তাঁর দাওয়াতে বলেন, যারা পাপ কাজ করবে তারা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। যারা আল্লাহ ও রাসুলের কথা মানবে তারা চিরসুখের জান্নাত লাভ করবে। মক্কাবাসীরা তাঁর দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের অত্যাচার শুরু করে। এক পর্যায়ে নবুয়তের একাদশ বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখে আল্লাহ মহানবিকে (স) মিরাজ নিয়ে

যান। সেখানে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেন, আল্লাহর দিদার লাভ করেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নির্দেশ পান বলে আলোচনায় বলা হয়েছে।

মদিনায় হিজরত: মক্কার কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া ও মক্কায় ইসলাম প্রচার বাধাগ্রস্থ হওয়ায় মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। হিজরতের পূর্বে তাঁর নিকট রক্ষিত মক্কার কাফিরদের সকল আমানত আলী (রা) এর নিকট রেখে যান, যাতে তাদের সম্পদ ফেরত দেওয়া যায়। মহানবি (স) এর আমানতদারীতা দেখে কাফিররা মনে মনে লজ্জিত হয়। মহানবি (স) তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর (রা) কে নিয়ে ৩দিন দীর্ঘ সফরের পর মদিনায় পৌঁছে যান বলে উল্লেখ করা হয়।

মদিনা সনদ: মহানবি (স) মদিনায় এসেই একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্যে মদিনার মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ইহুদী, খ্রিস্টানদের নিয়ে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি বা সনদকে মদিনা সনদ বলা হয়। এতে ৪৭ টি ধারা ছিল। ধারাগুলো থেকে এখানে ছয়টি ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। মদিনা সনদ মহানবি (স) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কুটনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি প্রমাণিত হয় বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

বদর ও অন্যান্য যুদ্ধ: মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পরও মক্কার কাফিরদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তারা ইসলামকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে মদিনায় আক্রমণ করে। মহানবি (স) ৩১৩ জন সাহাবি নিয়ে কাফিরদের মোকাবিলায় মদিনার ৮০ কি.মি দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে উপস্থিত হন। বদর প্রান্তরে কাফির ও মুসলামানদের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এতে ৭০ জন কাফির নিহত হয় ও ৭০ জন বন্দি হয়। আর মুসলমানদের ১৪ জন শহীদ হন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। শিক্ষিত বন্দিদের মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হয় ১০ জন মুসলিম বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান করা। এতে করে শিক্ষা বিস্তারে রাসুল (স) এর প্রচেষ্টা সফল হয় বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রতিশোধের নেশায় পরের বছর আবার মদিনা আক্রমণ করলে ওহুদ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এতে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলেও ৭০ জন সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন ও মহানবি (স) এর পবিত্র দাঁত ভেঙ্গে যায় বলে আলোচনায় বলা হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি: এতে বলা হয় ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স) ১৪০০ জন সাহাবিসহ উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাত্রা করলে মক্কার ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফিররা বাধা দেয়। এতে মক্কার কাফিরদের প্রস্তাবে মহানবি (স) ও মক্কার কাফিরদের মধ্যে একটি সন্ধি হয়। এ সন্ধিকে হুদায়বিয়ার সন্ধি বলা হয়। এ সন্ধির মেয়াদ ছিল ১০ বছর। এ সন্ধির বেশ কিছু শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে হলেও এতে মুসলমানরাই লাভবান হয়। আল কুরআনে এ সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়: ৮ম হিজরীর রমজান মাসে মহানবি (স) দশ হাজার সাহাবি নিয়ে মক্কা অভিযান শুরু করেন। এ অভিযানে বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে মুসলমানরা মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (স) মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এমনকি মহানবি (স) এর ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ান ও

তার স্ত্রী হিন্দাকেও ক্ষমা করে দেন। এতে মহানবি (স) এর ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা ফুটে উঠে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

বিদায় হজ: দশম হিজরী সনে মহানবি (স) তাঁর জীবনের শেষ হজ পালন করেন। এতে তাঁর সাথে লক্ষাধিক সাহাবি অংশগ্রহণ করেন। এ হজ বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে মহানবি (স) তাঁর সমস্ত উম্মতের উদ্দেশ্যে এক বলিষ্ঠ ভাষণ প্রদান করেন। আলোচনায় এ ভাষণের সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। বিদায় হজ থেকে ফেরার পর মহানবি (স) অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল (স) ইন্তেকাল করেন। মসজিদে নববীর এক পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। মহানবি (স) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেন, لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة এ আয়াতটি অর্থসহ আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়। এতে মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার আহ্বান জানানো হয় এবং কুরআন মজিদে উল্লিখিত ২৫ জন নবি ও রাসুলের নামের তালিকা উপস্থাপন করা হয়।

হযরত আদম (আ): পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ)। এ আলোচনায় আদম (আ) এর সৃষ্টির প্রক্রিয়া, সৃষ্টির পর ফেরেশতাদের তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর আদেশ, আজাজিল নামের একজনের আদম (আ) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি, পরবর্তীতে আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আজাজিল এর অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর জান্নাতে বসবাস, শয়তানের কুমন্ত্রণায় তাদের জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপের ঘটনায় আদম ও হাওয়া (আ) নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দীর্ঘ অনেক বছর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে আল্লাহ তাদের মাফ করে দিলেন। তাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির পথযাত্রা শুরু হলো। আদম (আ) ছিলেন প্রথম নবি। তিনি তাঁর সন্তানের এক আল্লাহর ইবাদতের আদেশ দিতেন। আমরা সবাই তাঁর বংশধর বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

হযরত নূহ (আ): হযরত আদম (আ) এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘ অনেক বছর অতিক্রান্ত হলে আল্লাহ নূহ (আ) কে নবি হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘ সাড়ে নয়'শ বছর আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেন। তাঁর দাওয়াতে মাত্র ৮০ জন নারী-পুরুষ ইমান আনল। বাকী কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। নূহ (আ) তাঁর অবাধ্য জাতিকে ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করলেন। আল্লাহ তাঁর দুয়া কবুল করে তাকে একটা নৌকা বানানোর নির্দেশ দিলেন। নৌকা বানানো দেখে তাঁর জাতির লোকেরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা, উপহাস করতে লাগল। এক সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি ও মাটি ফুঁড়ে পানি বের হতে লাগল এভাবে টানা ৪০ দিন চলতে থাকে। সৃষ্টি হয় এক মহাপ্লাবন। এ প্লাবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটি এখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

হযরত ইবরাহিম (আ): ইরাকের বাবেল শহরে ইবরাহিম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকেরা মূর্তিপূজা করত। ইবরাহিম (আ) মূর্তিপূজার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তিনি সবাইকে মূর্তিপূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানালে সবাই তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়। তখনকার বাদশাহ নমরুদ ইবরাহিম (আ) কে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে আগুন তাঁর কোন ক্ষতিই করল না।

ইবরাহিম (আ) এর দুই পুত্র ছিল। একজন ইসমাইল (আ) অন্যজন ইসহাক (আ) দুই জনই নবি ছিলেন। ইবরাহিম (আ) এর জীবন ছিল কঠিন পরীক্ষায় ভরপুর। আল্লাহর আদেশে তিনি তাঁর প্রিয়পুত্র ইসমাইল (আ) কে কুরবানি দিতে গেলে ইসমাইল (আ) এর পরিবর্তে একটি দুম্বা কুরবানি হয়ে যায়। ইবরাহিম (আ) এর এ সুন্নত আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখলেন। তাঁকে আল্লাহর বন্ধু বা খলিলুল্লাহ বলা হয় বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

হযরত দাউদ (আ): এ আলোচনায় দাউদ (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়। বলা হয় তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের সন্তান। তিনি বাদশাহ তালুতের সেনাপতি ছিলেন, তালুতের ইন্তেকালের পর দাউদ (আ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সব সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। রাতে কম ঘুমাতেন। একদিন পরপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাওম পালন করতেন। তাঁর উপর যাবুর কিতাব নাযিল হয়। এখানে তার বেশ কিছু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী, তিনি পশু পাখিদের ভাষা ও বুঝতেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। সুশাসক ও সুবিচারক। তিনি রাজকোষ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ না করে আল্লাহর কুদরতে স্বহস্তে ইস্পাতের দ্বারা বর্ম তৈরি করে বিক্রি করে সংসার চালাতেন। এছাড়া দাউদ (আ) এর গুণগুলো অর্জনের আহ্বান জানানো হয় আলোচনায়।

হযরত সুলায়মান (আ): এখানে সুলায়মান (আ) এ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়। বলা হয় তিনি ছিলেন দাউদ (আ) এর সন্তান, আল্লাহর একজন নবি ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। তিনি জ্বীন-পরী, পশু-পাখি এমনকি গাছপালার ভাষা ও বুঝতেন। আল্লাহর হুকুমে বাতাস তাঁর অধীন ছিল। তিনি সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করতেন। তিনি ছিলেন একজন সুশাসক ও সুবিচারক। তিনি বৃদ্ধ বয়সে বায়তুল মাকদাস নির্মাণ করেন। এছাড়া তাঁর ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করা হয়।

হযরত ঈসা (আ): এখানে ঈসা (আ) এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়। বলা হয় ঈসা (আ) আল্লাহর অসীম কুদরতে পিতা ছাড়াই মরিয়ম (আ) এর গর্ভে বেথেলহাম নামক স্থানে জন্ম লাভ করেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর একজন নবি ও রাসুল। তাঁর উপর ইনজিল কিতাব নাযিল হয়েছিল। তাঁর অসংখ্য মুজিজা ছিল। তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান, ধবল, শ্বেত ও কুষ্ঠরোগীর রোগমুক্ত করা ইত্যাদি। তাঁর জাতির লোকেরা দেব-দেবীর পূজা করত। তিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানালে তারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। একদিন একজন তাকে হত্যা করতে গেলে আল্লাহ তাকে আসমানে তুলে নেন। শেষ জামানায় কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য তিনি আবার দুনিয়ায় আসবেন। তিনি ৪০ বছর পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করবেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) এর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়।

শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমের নির্দেশিত বিষয়বস্তুগুলো পাঠ্যপুস্তকে যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সর্বমোট ৮টি বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এসব আলোচনার মাধ্যমে মোট ১৩টি শিখনফল অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পারস্পর সংগতিপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল আলোচনা ও সুপারিশ

পঞ্চম অধ্যায়
গবেষণার ফলাফল আলোচনা ও সুপারিশ

ভূমিকা: এ অধ্যায়ে গবেষণা উদ্দেশ্যের আলোকে সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা উদ্দেশ্যের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত শিখনফল কতটুকু অর্জিত হলো সে সম্পর্কে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষকের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন ইত্যাদি তথ্য সম্ভার থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আহরিত এ সকল তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল নিরূপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে কতটুকু অর্জিত হয়েছে সে বিষয়ে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখনফলের আলোকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহ থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণি থেকে ৩ জন করে শিক্ষার্থী উত্তরদাতা হিসেবে বাছাই করা হয়। তৃতীয় শ্রেণির ৩০ জন, চতুর্থ শ্রেণির ৩০ জন এবং পঞ্চম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থী থেকে করোনাকালীন অতিমারীর কারণে গবেষক অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে শিক্ষার্থীদের থেকে সঠিক উত্তর প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

শিক্ষাক্রম এবং ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে বিবৃত শিখনফলের আলোকে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে সে বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ:

৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থী

তৃতীয় শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে মোট (৯৯) টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে একটি বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য যে বিষয়বস্তুগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হলো সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ১৬টি প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ফলাফলসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. আকাইদ সংক্রান্ত: মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্রষ্টা, পালনকারী, রিযিকদাতা ও পরম দয়ালু এ সংক্রান্ত আলোচনায় শিক্ষার্থীদের ৫৩.৩৩% মোটামুটি জানেন, ২৬.৬৬% ভালোভাবে জানেন এবং ২০% শিক্ষার্থী আংশিক জানেন। ফলে মহান আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ আংশিক ধারণা পাচ্ছে। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়ার উপর জোর দেওয়া জরুরি। (দ্র. চিত্র-০১)

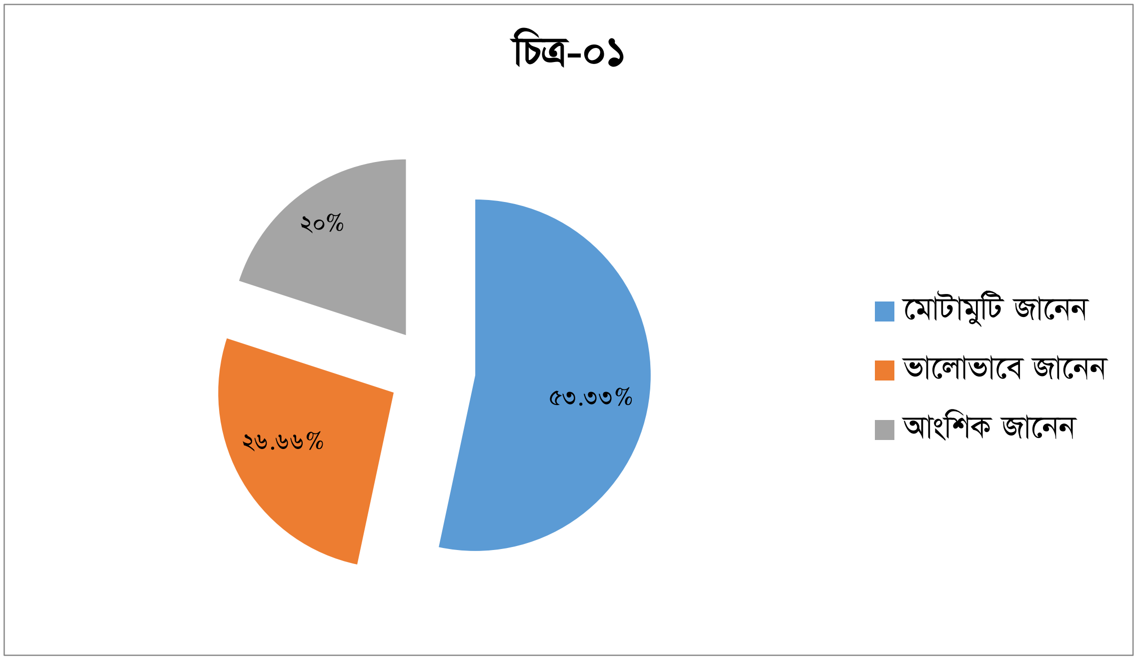

২. ‘‘নবি-রাসুলগণ আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির পথ প্রদর্শক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাঁদের উপর আসমানি কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে’’ এ বিষয়ে মাত্র ২০% শিক্ষার্থী ভালোভাবে জানেন, ৪০% শিক্ষার্থী মোটামুটি জানেন আর ৪০% শিক্ষার্থী আংশিক জানেন। (দ্র. চিত্র-০২)

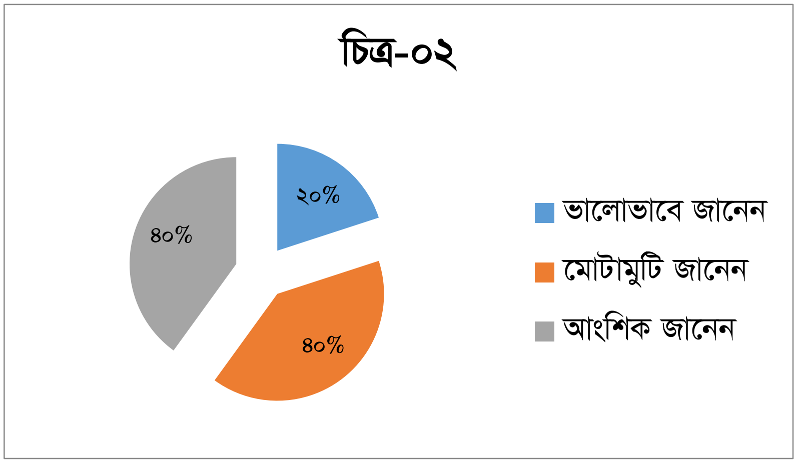

৩. ‘‘মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাত। পৃথিবীর ভালো-মন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে’’ এ বিষয়ে মাত্র ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী ভালোভাবে জানেন, ১৩.৩৩% শিক্ষার্থী মোটামুটি জানেন আর ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী আংশিক জানেন। (দ্র. চিত্র-০৩)

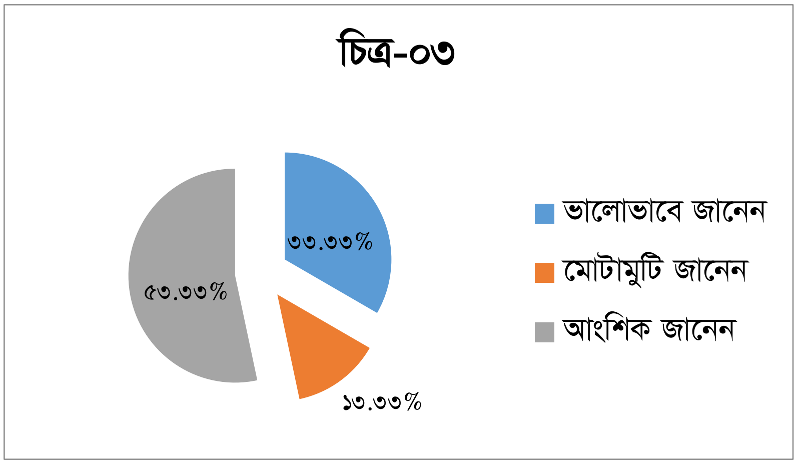

৪. ইবাদত হিসাবে ওযু, গোসল ও সালাতের নিয়মসমূহ সম্পর্কে ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী ভালোভাবে জানেন, ২০% শিক্ষার্থী মোটামুটি জানেন আর ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী আংশিক জানেন। (দ্র. চিত্র-০৪)

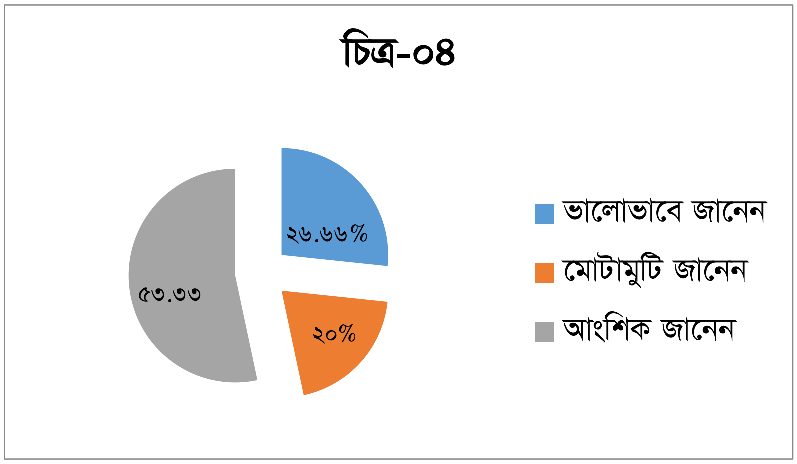

৫. দৈনন্দিন জীবনে ইবাদত হিসাবে ওযু, গোসল ও সালাতের ফরয ও নিয়মসমূহ নিয়মিত পালন করেন মাত্র ২০% এবং ৮০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে পালন করেন।

৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও কোন সালাত কখন আদায় করতে হয় সে বিষয়ে মাত্র ৩০% শিক্ষার্থী ভালোভাবে জানেন, ৫০% শিক্ষার্থী মোটামুটি জানেন এবং একেবারেই জানেন না ২০% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-০৫)

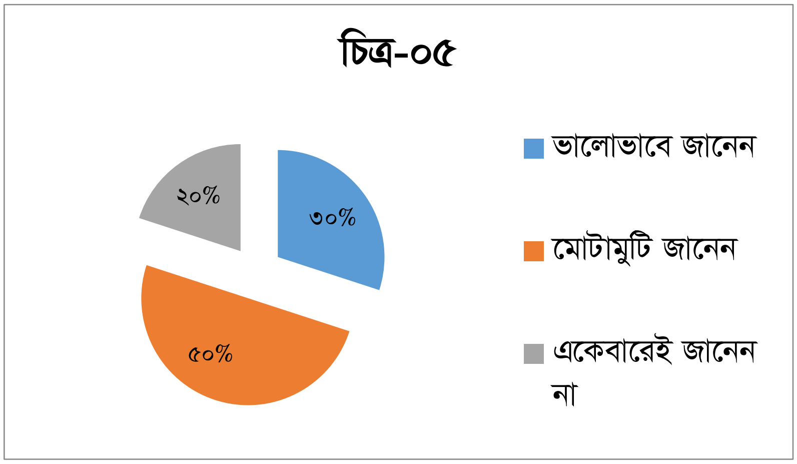

৭. আব্বা-আম্মার কথা শোনা, সদা সত্য কথা বলা, সালাম দেয়া, সহপাঠী ও মেহমানের সাথে ভালো আচরণ করা, জীবে দয়া করা ও মানুষের সেবা করা এগুলো যে সৎ চরিত্র এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী, মোটামুটি জানেন ৫৩.৩৩%শিক্ষার্থী।

৮. দৈনন্দিন জীবনে (৭নং) এ উল্লেখিত আখলাক/ইবাদতসমূহ নিয়মিত পালন করেন মাত্র ৪০% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে পালন করেন ৬০% শিক্ষার্থী।

৯. কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব। এটি আরবি ভাষায় নাযিল হয়। এই ২৯টি আরবি বর্ণমালা সঠিকভাবে জানেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী, আংশিক জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী ।

১০. আরবি বর্ণমালার হরফগুলোর হরকত, তানবীন, জযম, তাশদীদ সহকারে সঠিকভাবে জানেন মাত্র ২০% শিক্ষার্থী, আংশিক জানেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই জানেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-০৬)

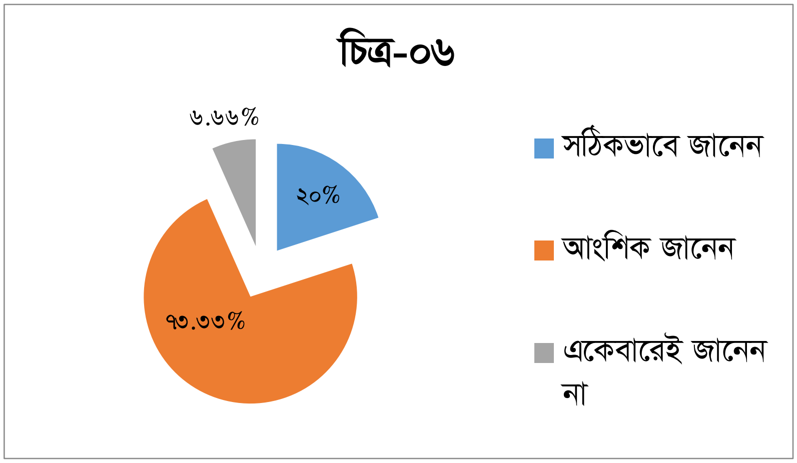

১১. আরবি হরফসমূহ ও আরবি হরফ দিয়ে শব্দ গঠন করে পড়তে ও লিখতে সঠিকভাবে জানেন ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী, আংশিক জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই জানেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-০৭)

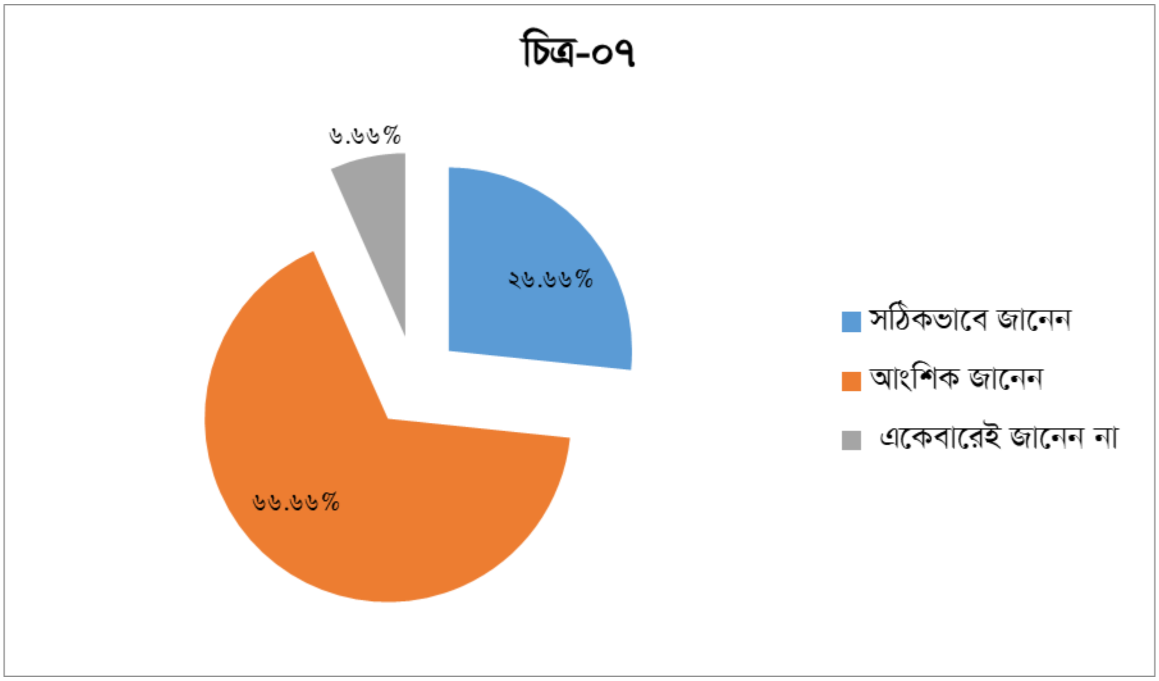

১২. পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস শুদ্ধভাবে মুখস্ত পারেন ১০০% শিক্ষার্থী।

১৩. মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, আমানতদার, বন্ধুভাবাপন্ন, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অন্যান্য গুণের অধিকারী, মহানবি (স)-এর এসব আদর্শ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানেন ৪০% শিক্ষার্থী এবং আংশিক জানেন ৬০% শিক্ষার্থী।

১৪. উপরোল্লিখিত (১৩নং এ) রাসুল (স) এর আদর্শসমূহ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন মাত্র ৬০% শিক্ষার্থী আর ৪০% শিক্ষার্থী আংশিক অনুসরণ করেন।

১৫. পাঠ্যপুস্তকে হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও আরো ৭ জন নবি-রাসুলের নাম রয়েছে এর মধ্য থেকে ৪ জনের নাম জানেন ১০০% শিক্ষার্থী। কোন শিক্ষার্থীই পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত ৭ জন নবি-রাসুলের নাম জানেন না।

১৬. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করেন ৯৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর অনুসরণ করেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী

চতুর্থ শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে মোট (১৩২)টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে একটি বিষয়বস্তুর জন্য একাধিক শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়বস্তুগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হলো সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ২২টি প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ফলাফলসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. মহান আল্লাহর আদেশে সৃষ্টিজগতের সব কিছুই নিয়মমতো পরিচালিত হচ্ছে এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং আংশিক জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

২. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং আংশিক জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৩. কালেমা শাহাদাত, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসাল এ তিনটি কালিমার সবগুলো শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে পারেন ৯৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর ১টি পড়তে ও বলতে পারেন ৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৪. নবি রাসুলগণ আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির পথ প্রদর্শক, মানব জাতির হেদায়েতের জন্য তাঁদের উপর নাযিল হয়েছে আসমানি কিতাব এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর মোটামুটি জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাত। আখিরাতে পৃথিবীর ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন মাত্র ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর মোটামুটি জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৬. পবিত্রতার অংশ হিসেবে অযুর নিয়ম, অযু ভঙ্গের কারণ ও গোসলের নিয়মসমূহ নিয়মিত পালন করেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর মাঝে মাঝে পালন করেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৭. আযান, আযানের দুয়া, ইকামতের বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থসহ ভালোভাবে মুখস্ত বলতে পারেন ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী, আংশিক পারেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী আর একেবারেই পারেন না ৬.৬৬%। (দ্র. চিত্র-০৮)

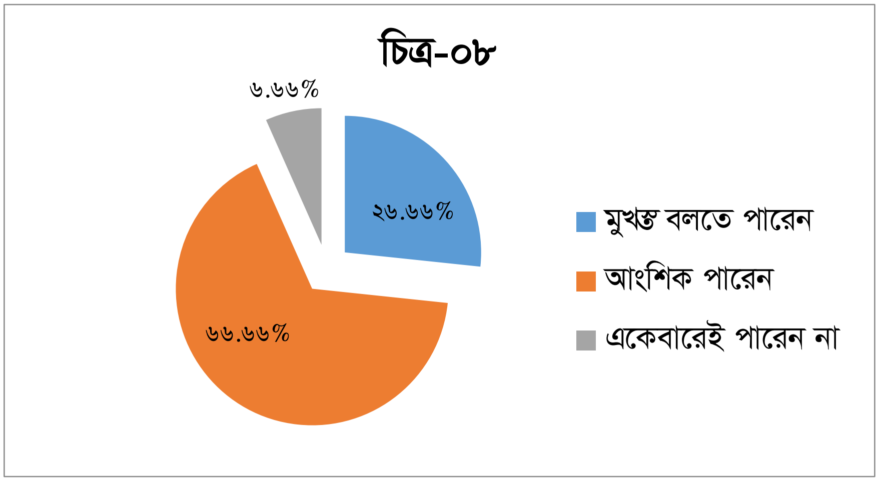

৮. তাশাহুদ, দরুদ শরীফ, দুয়া মাসুরা, সালাম ও মুনাজাতের বাক্যগুলো ভালোভাবে পারেন ৪০% শিক্ষার্থী এবং আংশিক পারেন ৬০% শিক্ষার্থী।

৯. সালাতের আহকাম, আরকান, জুমা ও দুই ঈদের সালাতের নিয়মসমূহ ভালোভাবে জানেন মাত্র ১৩.৩৩% শিক্ষার্থী, মোটামুটি জানেন ৬০% শিক্ষার্থী আর একেবারেই জানেন না ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-০৯)

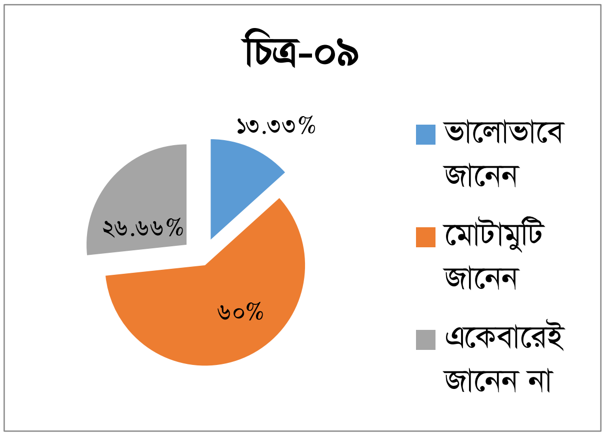

১০. সালাতের আহকাম ও আরকানসমূহ পালনসহ দৈনিক পাঁচওয়াক্ত সালাত ও জুমার সালাত নিয়মিত পালন করেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে পালন করেন ২৬.৬৬ শিক্ষার্থী।

১১. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা, শিক্ষককে সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা, সত্য কথা বলা, ওয়াদা পালন করা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ করা এগুলো যে সচ্চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৩৩.৩৩ % শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১২. উপরোল্লিখিত (১১ নং এ) সচ্চরিত্রসমূহ সচেতনভাবে নিয়মিত পালন করেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে পালন করেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১৩. আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা ও অহংকার করা এগুলো যে অসৎ চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ২০% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৮০% শিক্ষার্থী।

১৪. উপরোল্লিখিত (১৩ নং এ) অসৎ চরিত্রসমূহ থেকে সচেতনভাবে নিয়মিত বেঁচে থাকেন ১০০%শিক্ষার্থী।

১৫. কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৪৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৫৬.৬৬% শিক্ষার্থী ।

১৬. যবর, যের ও পেশযুক্ত শব্দ, তানবীন, জযম ও তাশদীদযুক্ত শব্দ ভালোভাবে পড়তে, বলতে ও লিখতে পারেন মাত্র ৪০% শিক্ষার্থী এবং আংশিক পারেন ৬০%শিক্ষার্থী।

১৭. মাদ্দ, মাখরাজ, ইদগাম ও ইযহার এর নিয়মসহ কুরআন মজিদ ভালোভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং আংশিক পারেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১৮. সূরা নাসর, সূরা লাহাব ও সূরা ইখলাস এই ৩টি সূরার মধ্যে সবগুলো সূরা পড়তে ও বলতে পারেন ১০০%শিক্ষার্থী।

১৯. মহানবি (স) এর শৈশব, যৌবন, হিলফুল ফুযুল গঠন, নবুয়ত লাভ, মক্কায় ইসলাম প্রচার এবং তাঁর জীবনের আদর্শগুলো: যেমন- মানবদরদি, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, আমানতদার, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অন্যান্য সৎগুণের অধিকারী ছিলেন এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন মাত্র ৪৩.৩৩% শিক্ষার্থী, মোটামুটি জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই জানেন না ১০% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-১০)

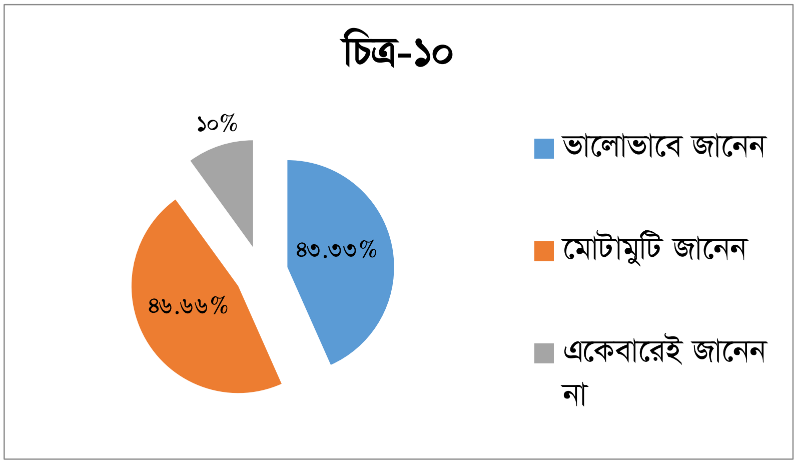

২০. উপরোল্লিখিত (১৯ নং এ) রাসুল (স) এর জীবনাদর্শসমূহ সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন মাত্র ২০% শিক্ষার্থী এবং আংশিক অনুসরণ করেন ৮০%শিক্ষার্থী।

২১. হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত অন্যান্য নবি-রাসুলের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ২৬.৬৬%শিক্ষার্থী এবং আংশিক জানেন ৭৩.৩৩%শিক্ষার্থী।

২২. বিদ্যালয়ের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করেন ১০০%শিক্ষার্থী।

৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী

পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে মোট (১০৫)টি শিখনফল উল্লেখ করা হয়েছে। এই শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে যে বিষয়বস্তুগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা কতটুকু অর্জিত হলো সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিখনফল ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ২১টি প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ফলসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী (আল্লাহ বিশ্বের পালনকর্তা, আল্লাহ ক্ষমাশীল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান) ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

২. নবি-রাসুলগণের আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাদের কাজ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী, মোটামুটি জানেন ৪০% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই জানেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-১১)

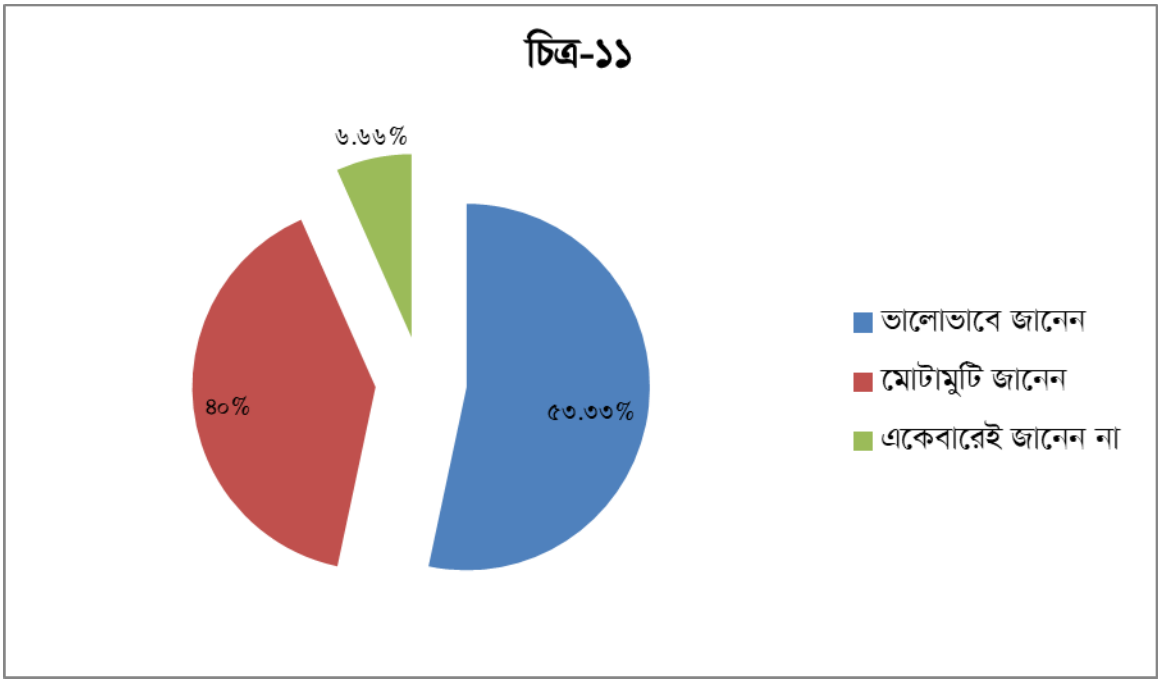

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখিরাত। পৃথিবীর ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে এ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৪. কবরের জীবন কবরের সওয়াল-জওয়াব, মিজান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

৫. অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত হিসাবে সালাতের নিয়মকানুন, আহকাম-আরকান, সালাতের ওয়াজিবসমূহ ভালোভাবে জানেন ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

৬. অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত হিসেবে (১-২০)টি সাওম পালন করেন ৩৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং (১-১০)টি সাওম পালন করেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

৭. ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ ২টি স্তম্ভ হলো যাকাত ও হজ। এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন মাত্র ২০% শিক্ষার্থী, মোটামুটি জানেন ৬০% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই জানেন না ২০% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-১২)

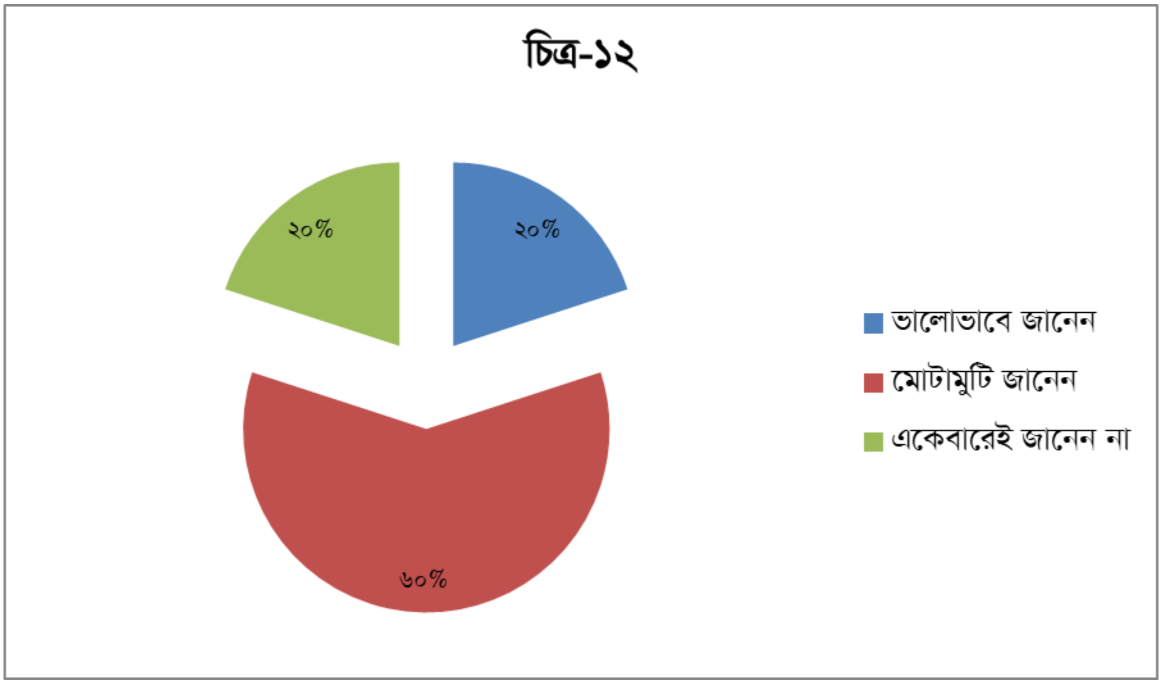

৮. পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যবহারিক দু’য়া: যেমন- কোন কাজ শুরু করার দু’য়া, ঘুমানোর ও ঘুম থেকে উঠার দু’য়া, মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু’য়া এবং সালাম ও সালামের উত্তর দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন মাত্র ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

৯. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা, শিক্ষককে সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা, সত্য কথা বলা, ওয়াদা পালন সচ্চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১০. উপরোল্লিখিত (৯ নং এ) সচ্চরিত্রসমূহ সচেতনভাবে নিয়মিত পালন করেন ৮০% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে পালন করেন ২০% শিক্ষার্থী।

১১. আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা ও অহংকার করা এগুলো যে অসৎ চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন মাত্র ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

১২. উপরোল্লিখিত (১১ নং এ) অসচ্চরিত্রসমূহ থেকে সচেতনভাবে নিয়মিত বেঁচে থাকেন ৭৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে বেঁচে থাকেন ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১৩. ভালো কাজে সহযোগিতা করা, মন্দকাজে বাধা প্রদান করা এবং নিজেই নিজের কাজ নিয়মিত করেন মাত্র ৬০% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে করেন ৪০% শিক্ষার্থী।

১৪. সততা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ভালোভাবে জানেন ৭০% শিক্ষার্থী এবং আংশিক জানেন ৩০% শিক্ষার্থী।

১৫. কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন ৪৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং মোটামুটি জানেন ৫৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

১৬. তাজবীদের যাবতীয় নিয়ম-কানুন ও মাখরাজসহ কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত ভালোভাবে পারেন মাত্র ৬.৬৬% শিক্ষার্থী, আংশিক পারেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই পারেন না ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-১৩)

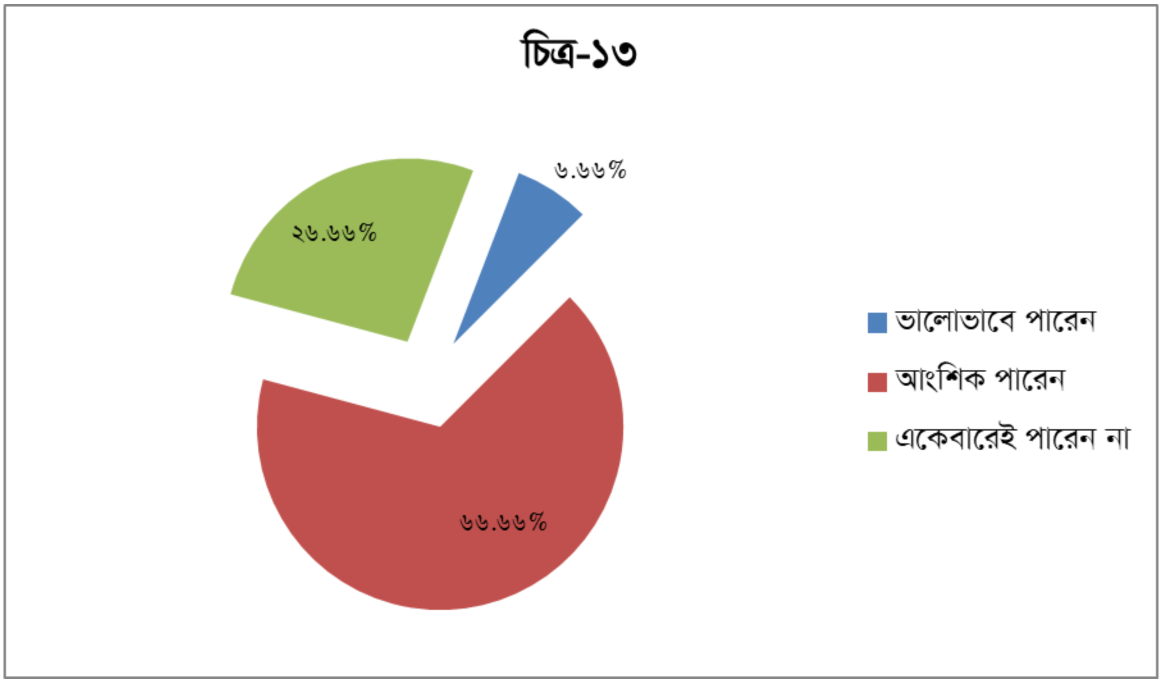

১৭. সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ, সূরা মাউন, সূরা কাউসার, সূরা কাফিরুন এই পাঁচটি সূরার মধ্যে সবগুলো শুদ্ধভাবে পারেন ৬৬.৬৬% শিক্ষার্থী, ৪টি পারেন ২৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং একটিও পারেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী। (দ্র. চিত্র-১৪)

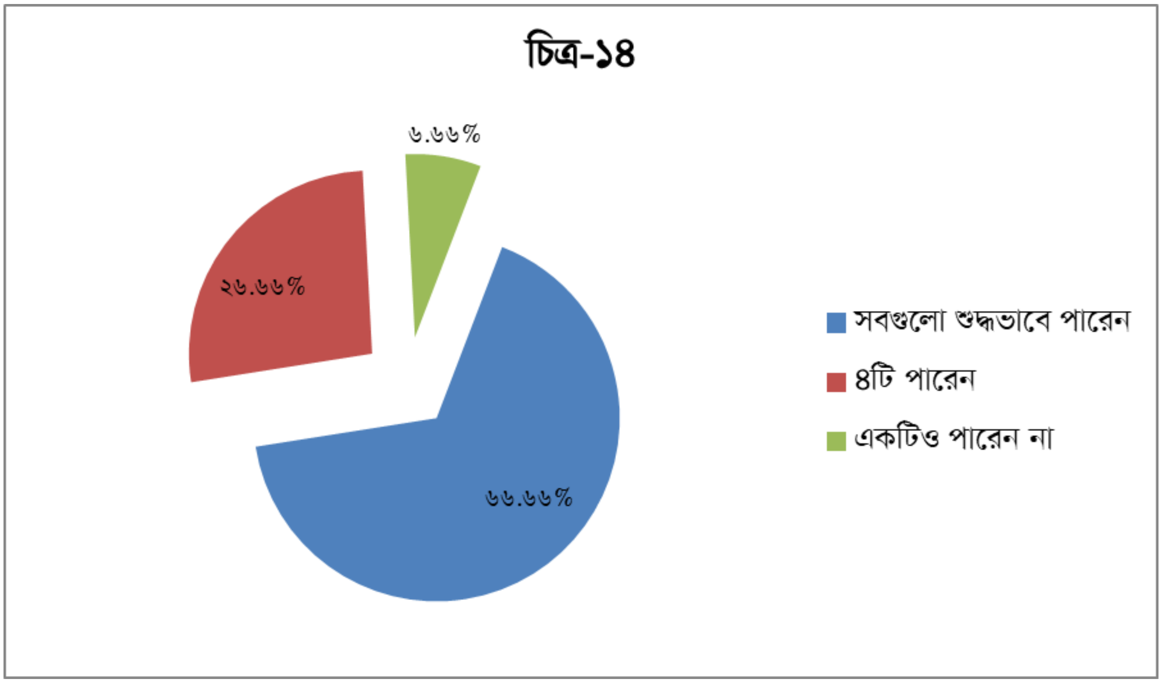

১৮. উপরোল্লিখিত (১৭ নং এ) সূরাগুলো সালাতে নিয়মিত তিলাওয়াত করেন ৮৬.৬৬% শিক্ষার্থী, মাঝে মাঝে তিলাওয়াত করেন ৬.৬৬% শিক্ষার্থী এবং একেবারেই তিলাওয়াত করেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

১৯. মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানেন এবং তাঁকে নিয়মিত অনুসরণ করেন ৬৩.৩৩% শিক্ষার্থী এবং মাঝে মাঝে অনুসরণ করেন ৩৬.৩৬% শিক্ষার্থী।

২০. কুরআন মজিদে উল্লেখিত ২৫ জন নবি ও রাসুলের নামের মধ্যে (১-২০) জনের নাম বলতে পারেন মাত্র ৬.৬৬% শিক্ষার্থী আর (১-১০) জনের নাম বলতে পারেন ৯৩.৩৩% শিক্ষার্থী।

২১. হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত অন্যান্য নবি-রাসুলের জীবনাদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি জানেন ৯৩.৩৩% শিক্ষার্থী আর একেবারেই জানেন না ৬.৬৬% শিক্ষার্থী।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফল অর্জনের সামগ্রিক ফলাফল বিশ্লেষণ ও গবেষকের পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় এই বিষয়ের শিখনফল অর্জিত হওয়ার হার সন্তোষজনক নয়। কারণ তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শিখনফল অর্জনের গড় মাত্র ৩৮%। চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শিখনফল অর্জনের গড় মাত্র ৪০%। আর পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে শিখনফল অর্জনের গড় মাত্র ৪৮%। এর কারণ হিসেবে আমরা যা পাই তা হলো:

১। মাঠ পর্যায়ে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের কারিকুলাম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

২। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত।

৩। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

৪। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করা হয় না। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম রুটিন অনুযায়ী এটি একদম শেষ পিরিয়ডে অনুষ্ঠিত হয়।

৫। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি তৃতীয় শ্রেণি থেকে পাঠদান শুরু হয়। ফলে এটি একটি নতুন বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়বস্তু বুঝে উঠতে পারে না। তাই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি প্রথম শ্রেণি থেকে পাঠদান শুরু করা উচিত।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আগামীর শিশুদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা অনেক কঠিন হবে।

শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বর্ণিত প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম/শিক্ষাক্রম ও শিখনফল কতটুকু অর্জিত হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে চট্টগ্রাম জেলার ৫ জন কর্মকর্তাকে শিখনফলের আলোকে ১৩টি প্রশ্ন করা হয়। উত্তরদাতা কর্মকর্তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: অর্জিতব্য শিখনফলসমূহ প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

২. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: শিখনফলসমূহ শিক্ষার্থীর বয়সের সাথে সমন্বয় করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. উত্তরদাতা ৮০% কর্মকর্তাই মনে করেন: বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে (যেমন; পিতামাতার অবাধ্যতা, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, শিক্ষকের সাথে অসদাচরণ ইত্যাদি) সমস্যা নিরসনে বর্তমান কারিকুলামের বিষয়বস্তু যথেষ্ট ও যথাযথ। আর ২০% কর্মকর্তা মনে করেন: উল্লেখিত সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের জন্য কারিকুলামে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো পাঠদানের সাথে সাথে বাস্তব জীবনে অনুশীলন ও প্রয়োগের উপর জোর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিখনফল অর্জনে বিষয় শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

৫. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নির্দেশিকা যথাসময়ে শিক্ষকদের নিকট পৌঁছায় না।

৬. নৈতিকমূল্যবোধ জাগতকরণে বিষয় শিক্ষকের আচরণ অনুসরণীয় বলে মনে করেন ৬০% উত্তরদাতা। আর ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন বিষয় শিক্ষকের আচরণ অনুসরণীয় নয়।

৭. শিক্ষাক্রম, শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে করেন মাত্র ৪০% উত্তরদাতা, আর ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন এসব কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

৮. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: শিক্ষাক্রম, শিক্ষক নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মশিক্ষা বিষয়ে আলাদা কোন কমিটি নেই। ফলে এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি।

৯. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সে দিকে নজর দেয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত বলে মনে করেন ৮০% উত্তরদাতা আর ২০% উত্তরদাতা মনে করেন পর্যাপ্ত নয়। যারা এই বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত মনে করেন তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, বিদ্যালয়ে ও পরিবারে নৈতিকতা অনুশীলনের অভাব ও আকাশ সংস্কৃতিকে দায়ী করেন। ফলে অবিলম্বে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

১০. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে বর্তমান কারিকুলামে রচিত পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট বলে মনে করেন মাত্র ৪০% উত্তরদাতা, আর ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন এই পাঠ্যপুস্তক উদ্দেশ্য অর্জনে যথেষ্ট নয়।

১১. শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সময় সাপ্তাহিক মাত্র ২ পিরিয়ড। এটি পর্যাপ্ত নয় বলে জানান শতভাগ উত্তরদাতা। বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সময় সাপ্তাহিক ৫ পিরিয়ড করার পরামর্শ প্রদান করেন উত্তরদাতাগণ।

১২. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণে শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শিখনফল সফল হয়েছে মনে করেন মাত্র ২০% উত্তরদাতা, ৪০% উত্তরদাতা মনে করে মোটামুটি সফল হয়েছে আর ৪০% উত্তরদাতা মনে করেন একেবারেই সফল হয়নি। (দ্র. চিত্র-১৫)

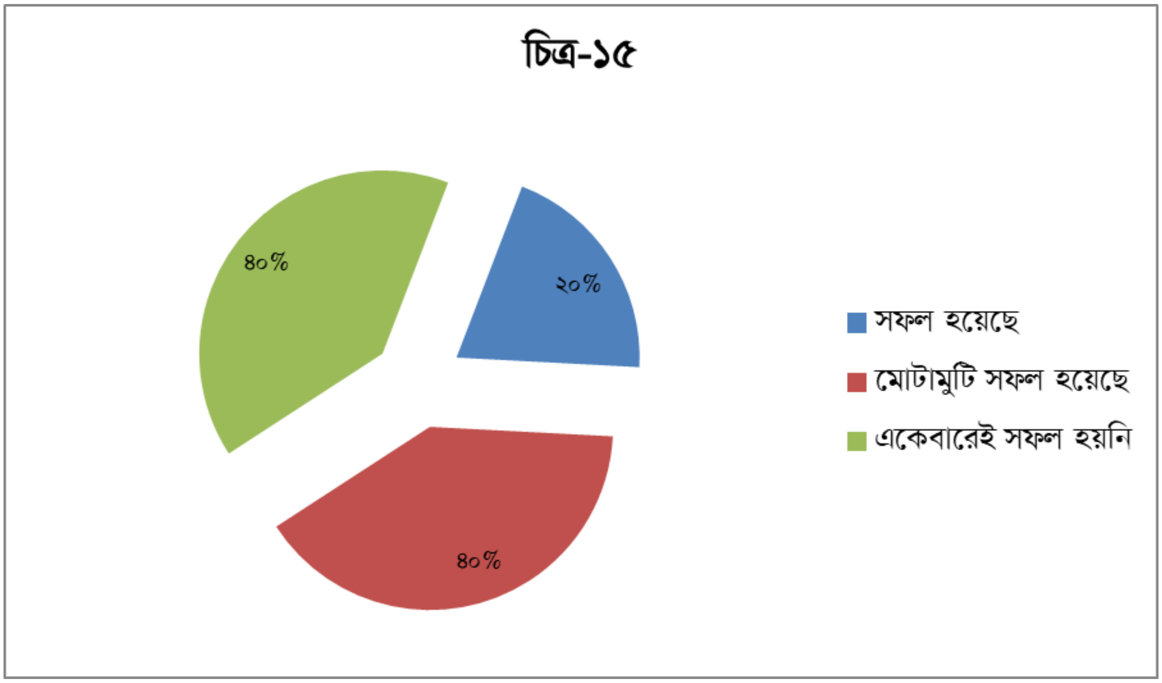

১৩. শিক্ষা প্রশাসনের উত্তরদাতা শতভাগ কর্মকর্তা বলেন: কোন বিদ্যালয়ে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয় পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক নেই। ফলে এই বিষয়ে পাঠদান ব্যাপক সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

গবেষণা এলাকার নির্বাচিত ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০ জন সহকারি শিক্ষক, যারা বিদ্যালয়ে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদান করেন তাঁদের থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষাক্রমের আলোকে তাঁদেরকে ২৩টি প্রশ্ন করা হয়। সবগুলো বিদ্যালয়ে দেখা যায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি বয়স্ক পুরুষ শিক্ষক অথবা মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান করা হয়। উত্তরদাতা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা কারিকুলাম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন মাত্র ১০% শিক্ষক, আংশিক অবগত আছেন ৭০% শিক্ষক আর কারিকুলাম সম্পর্কে একেবারেই অবগত নন প্রায় ২০% শিক্ষক। (দ্র. চিত্র-১৬)

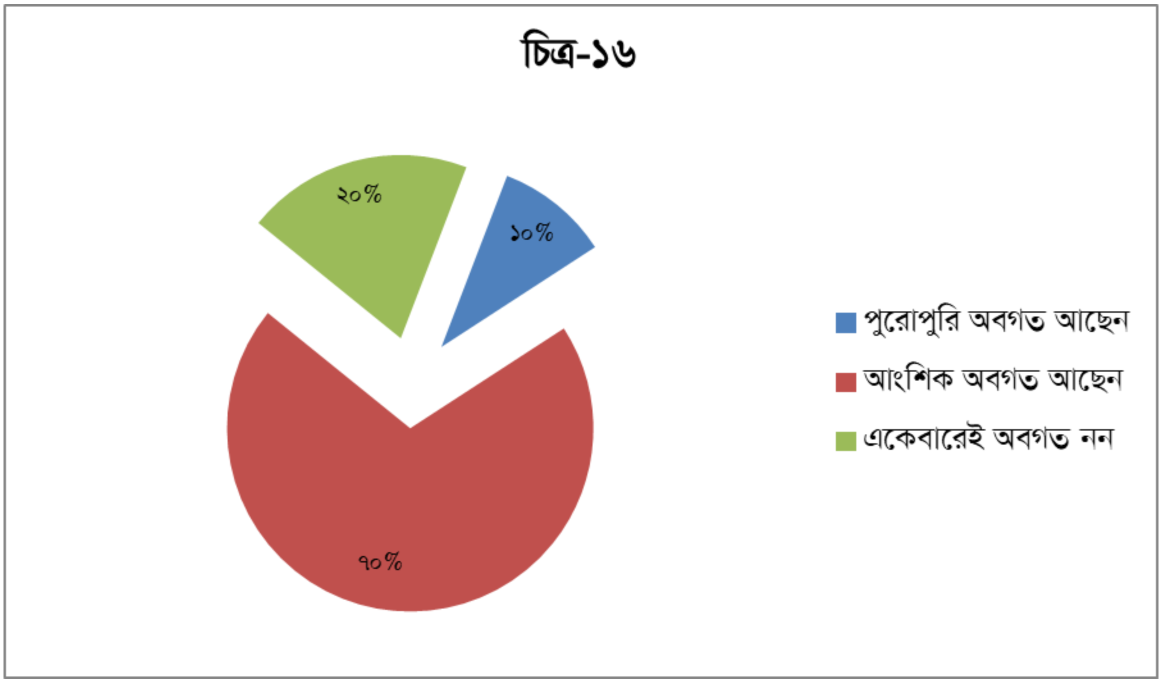
চিত্র-১৬

২. শ্রেণি-কার্যক্রমে অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল অর্জনে নিয়মিত সচেতন থাকেন মাত্র ১০% শিক্ষক আর শিখনফল অর্জনে মাঝে মাঝে সচেতন থাকেন প্রায় ৯০% শিক্ষক।

৩. দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যক্রম শিক্ষক নির্দেশিকা নিয়মিত অনুসরণ করেন মাত্র ১০% শিক্ষক আর শিক্ষক নির্দেশিকা মাঝে মাঝে অনুসরণ করেন ৯০% শিক্ষক।

৪. উদাহরণ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে আল্লাহর পরিচয় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যথার্থ বলে মনে করেন ৬০% শিক্ষক আর ৪০% শিক্ষক মনে করেন এ বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যথার্থ নয়।

৫. শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত পরিকল্পিত কার্যক্রম ও অধ্যায়ভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম: যেমন- বিভিন্ন সচ্চরিত্রের তালিকা, অসৎ চরিত্রের তালিকা, আল্লাহর নাম, কাবা ঘরের ছবি, মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, বিভিন্ন আরবি হরফ ইত্যাদি পোস্টার, চার্ট ও মডেলের মাধ্যমে মাঝে মাঝে উপস্থাপন করেন মাত্র ৫০% শিক্ষক আর এসব একেবারেই উপস্থাপন করেন না ৫০% শিক্ষক।

৬. সাপ্তাহিক যে কোন দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন ৪০% শিক্ষক আর এ কাজে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অংশগ্রহণ করেন ৬০% শিক্ষক।

৭. শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত পরিকল্পিত কাজ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সালাত, আযান, ইকামত, সূরা তিলাওয়াত, তাশাহুদ, দরূদ শরীফ, দু'য়া মাসুরা ও মুনাজাত ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত অনুশীলন করান

মাত্র ২০% শিক্ষক, মাঝে মাঝে অনুশীলন করান ৬০% শিক্ষক এবং একেবারেই অনুশীলন করান না ২০% শিক্ষক। (দ্র. চিত্র-১৭)

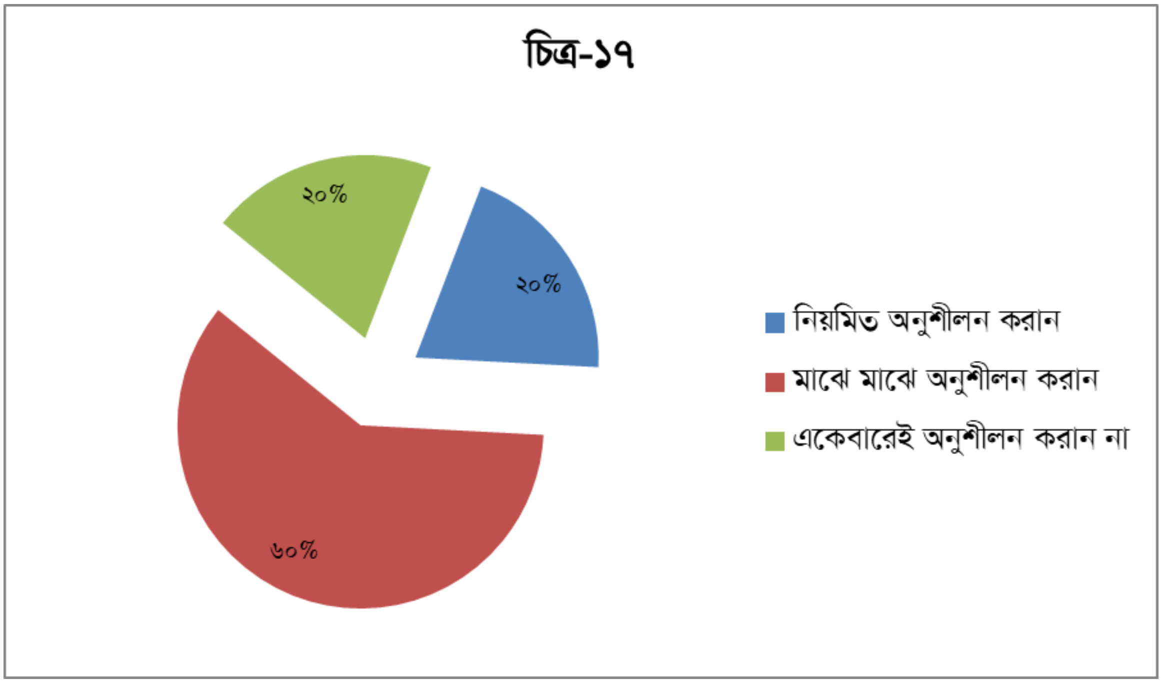
চিত্র-১৭

৮. বিদ্যালয়ে আখলাকে হামিদাহ (সচ্চরিত্র) অনুশীলনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন ৮০% শিক্ষক আর এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি ২০% শিক্ষক।

৯. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণ পাননি কোন শিক্ষকই। বাকী ৫টি বিষয়ে বাংলা, গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে {উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে} প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে কিন্তু অতিগুরুত্বপূর্ণ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ নেই।

১০. শিখনফল অর্জনে আখলাকে হামিদাহ/আখলাকে যামিমার বিষয়বস্তু ও নির্দেশিত ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি মাঝে মাঝে অনুসরণ করেন ২০% শিক্ষক আর ৮০% শিক্ষক এ পদ্ধতি একেবারেই অনুসরণ করেন না।

১১. ৯০% বিদ্যালয়ে শারীরিক ইবাদতগুলো অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই আর মাত্র ১০% বিদ্যালয়ে শারীরিক ইবাদতগুলো অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে।

১২. বিদ্যালয়ে শারীরিক ইবাদগুলো অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেন উত্তরদাতা ১০০% শিক্ষক।

১৩. শ্রেণিকক্ষে আরবি হরফ, তাশদীদযুক্ত বর্ণ ও শব্দ, দুই হরফ ও তিন হরফযুক্ত শব্দ, জযম, তানবীন ও মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও শব্দ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বোর্ডে লিখে উপস্থাপন ও অনুশীলন করান মাত্র

১০% শিক্ষক, মাঝে মাঝে অনুশীলন করান ৪০% শিক্ষক আর একেবারেই অনুশীলন করান না ৫০% শিক্ষক। (দ্র. চিত্র-১৮)

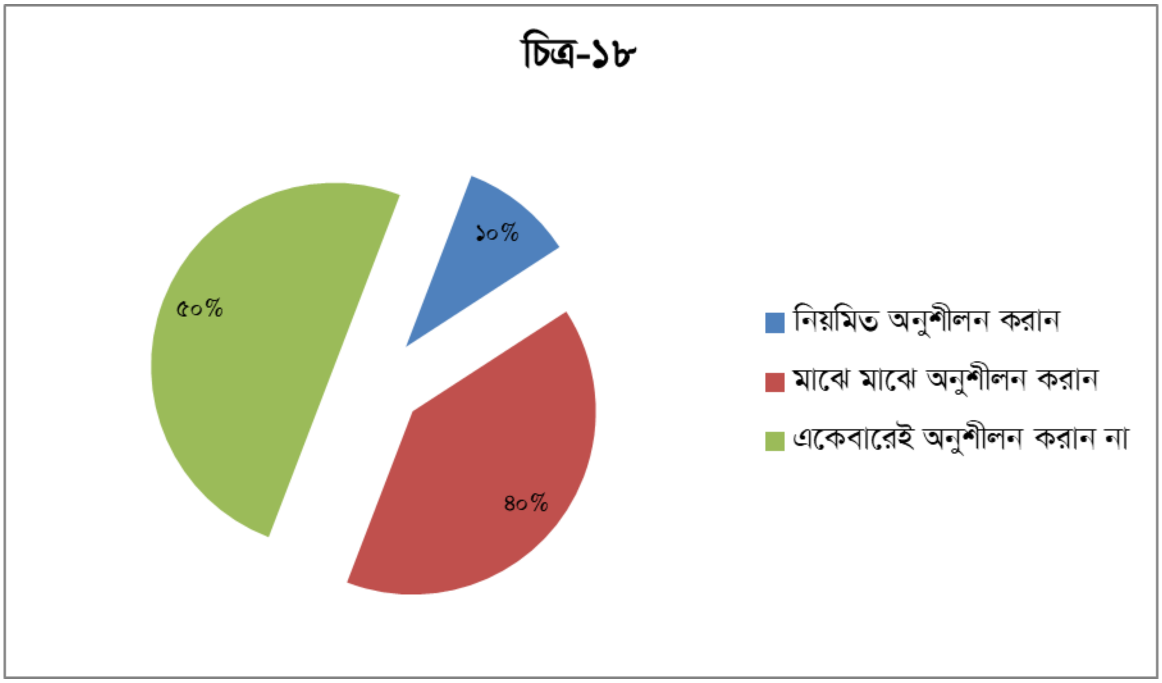

১৪. শ্রেণিকক্ষে বিদ্যমান উপকরণের পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক অন্যান্য: যেমন- (ছবি, প্রজেক্টর ও অডিও ইত্যাদি) উপকরণ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন মাত্র ৪০% শিক্ষক আর এসব উপকরণ একেবারেই ব্যবহার করেন না ৬০% শিক্ষক।

১৫. পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত কুরআন মজিদের সূরাসমূহ শুদ্ধভাবে অনুশীলনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি নিয়মিত অনুসরণ করেন মাত্র ২০% শিক্ষক, মাঝে মাঝে অনুসরণ করেন ৩০% শিক্ষক এবং এ পদ্ধতি একদমই অনুসরণ করেন না ৫০% শিক্ষক।

১৬. নৈতিকতা ও সৎ চরিত্রের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষক।

১৭. ধর্ম ও নৈতিকতা অনুশীলনের জন্য উৎসাহ প্রদানের জন্য বার্ষিক মূল্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে মাত্র ২০% বিদ্যালয়ে আর ৮০% বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা চালু নেই।

১৮. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিখনফলগুলো দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে করেন ৫০% শিক্ষক আর ৫০% শিক্ষক মনে করেন শিখনফলগুলো দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

১৯. বিদ্যমান সামাজিক অসঙ্গতি: যেমন- পিতামাতার অবাধ্যতা, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, শিক্ষকের সাথে অসদাচরণ ইত্যাদি থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখতে প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু যথার্থ বলে মনে করেন মাত্র ৩০% শিক্ষক আর ৭০% শিক্ষক মনে করে এটি যথার্থ নয়।

২০. উত্তরদাতা শতভাগ শিক্ষক মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে উপরোল্লিখিত (১৯ নং এ) সামাজিক সমস্যাগুলো বিদ্যমান থাকার মূখ্য কারণ হলো: ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা, বিদ্যালয়ে যথার্থ নৈতিকতা অনুশীলনের অভাব এবং অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

২১. গবেষকের বিদ্যালয়ের রুটিন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সময় সাপ্তাহিক মাত্র ২ পিরিয়ড; এটি পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন ৯০% শিক্ষক আর পর্যাপ্ত বলে মনে করেন মাত্র ১০% শিক্ষক।

২২. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো; ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন ৮০% শিক্ষক আর মাত্র ২০% শিক্ষক মনে করেন এ বিষয়বস্তু যথার্থ।

২৩. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে রচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত বলে মনে করেন মাত্র ৩০% শিক্ষক আর ৭০% শিক্ষক মনে করেন উদ্দেশ্য অর্জনে এ পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত নয়।

অভিভাবক (৩য় ও ৪র্থ) শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রণীত প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত শিখনফলসমূহ কতটুকু অর্জিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রেণির ১ জন শিক্ষার্থীর ১ জন করে অভিভাবক (১০+১০)= ২০ জন অভিভাবককে প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১৩টি প্রশ্ন করা হয়। করোনাকালীন অতিমারীর কারণে গবেষক ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে অভিভাবকদের থেকে সঠিক উত্তর প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। উত্তরদাতা অভিভাবকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. বিদ্যালয়ে ক্লাস শেষে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ক্লাসে আলোচিত ইমান ও আকাইদ (আল্লাহর পরিচয়, নবি-রাসুলগণের পরিচয়, আখিরাত ও আসমানি কিতাবের পরিচয় ইত্যাদি) সম্পর্কে পিতা-মাতাকে প্রশ্ন করে এ বিষয়ে আরো জানতে চায় ৬০% শিক্ষার্থী আর ৪০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পিতা-মাতাকে কোন প্রশ্ন করে না।

২. শতভাগ উত্তরদাতা অভিভাবক জানান ওযু, গোসল ও সাওমের নিয়ম পালনে শিশুরা খুবই আগ্রহী।

৩. ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৩০% শিক্ষার্থী নিয়মিত পিতা-মাতার কথা শুনে, বড়দের সালাম ও সম্মান করে, সত্য কথা বলে, সহপাঠী ও মেহমানদের সাথে ভালো আচরণ করে, বাড়ীর কাজে সহায়তা করে ও রোগীর সেবা করে আর ৭০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে এসব ভালোগুণ অনুশীলন করে থাকে।

৪. ৮০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলা, মন্দ কথা বলা, ভাইবোন, সহপাঠী ও প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করা ইত্যাদি মন্দ আচরণে জড়িত হয়ে পড়ে আর মাত্র ২০% শিক্ষার্থী একদমই এসব মন্দ আচরণে জড়িত হয় না।

৫. ৩০% শিক্ষার্থী বাসায় নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে আর ৭০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে বাসায় কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে।

৬. বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়; এ কথায় একমত নন ৬০% অভিভাবক আর ৪০% অভিভাবক এ কথায় একমত পোষণ করেন।

৭. উত্তরদাতা শতভাগ অভিভাবক জানান বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো এবং অনুশীলন করানো হয় না।

৮. উত্তরদাতা শতভাগ অভিভাবক মনে করেন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো প্রয়োজন ।

৯. ভালো কাজের জন্য পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করেন ৮০% শিক্ষার্থী আর ২০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

১০. যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর থাকেন ৬০% শিক্ষার্থী আর ৪০% শিক্ষার্থী যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর নয়।

১১. ৯০% শিশু শিক্ষার্থী ভালো কাজে (নামাজের জন্য ডেকে দেয়া, দান সাদাকা করা, সহনশীলতা, অপরকে সহায়তা) ইত্যাদি কাজে মা-বাবার হস্তক্ষেপ কামনা করে। আর মাত্র ১০% শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে মা-বাবার কোন সাহায্য কামনা করে না।

১২. উত্তরদাতা অভিভাবকগণ জানান শতভাগ শিক্ষার্থী রমজান মাসে সাওম পালনে আগ্রহী।

১৩. ৫০% শিক্ষার্থী বাসায় নবি-রাসুলদের বিভিন্ন আদর্শ ও শিক্ষণীয় ঘটনা সম্পর্কে মা-বাবার কাছে জানতে চায় আর ৫০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে না।

অভিভাবক (৫ম) শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রণীত প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষাক্রম/পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখিত শিখনফলসমূহ কতটুকু অর্জিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে সে সম্পর্কে ৫ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতি ১ জন শিক্ষার্থীর ১ জন করে মোট ১০ জন অভিভাবককে প্রশ্নমালার মাধ্যমে ১৮টি প্রশ্ন করা হয়। করোনাকালীন অতিমারীর কারণে গবেষক ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। এতে অভিভাবকদের থেকে সঠিক উত্তর প্রাপ্তির লক্ষ্যে গবেষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়। উত্তরদাতা অভিভাবকদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিচে উপস্থাপন করা হলো:

১. বিদ্যালয়ে ক্লাস শেষে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের ক্লাসে আলোচিত ইমান ও আকাইদ (আল্লাহর পরিচয়, নবি-রাসুলগণের পরিচয়, আখিরাত ও আসমানি কিতাবের পরিচয় ইত্যাদি) সম্পর্কে পিতা-মাতাকে প্রশ্ন করে এ বিষয়ে আরো জানতে চায় ৩০% শিক্ষার্থী আর ৭০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে পিতা-মাতাকে কোন প্রশ্ন করে না।

২. শতভাগ উত্তরদাতা অভিভাবক জানান ওযু, গোসল ও সাওমের নিয়ম পালনে শিশুরা খুবই আগ্রহী।

৩. ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০% শিক্ষার্থী নিয়মিত পিতা-মাতার কথা শুনে, বড়দের সালাম ও সম্মান করে, সত্য কথা বলে, সহপাঠী ও মেহমানদের সাথে ভালো আচরণ করে, বাড়ীর কাজে সহায়তা করে ও রোগীর সেবা করে আর ৪০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে এসব ভালোগুণ অনুশীলন করে থাকে।

৪. ৩০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলা, মন্দ কথা বলা, ভাইবোন, সহপাঠী ও প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করা ইত্যাদি মন্দ আচরণে জড়িত হয়ে পড়ে আর মাত্র ৭০% শিক্ষার্থী একদমই এসব মন্দ আচরণে জড়িত হয় না।

৫. ৫০% শিক্ষার্থী বাসায় নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তেলাওয়াত করে আর ৫০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে বাসায় কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে।

৬. বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়; এ কথায় একমত নন ৯০% অভিভাবক আর ১০% অভিভাবক এ কথায় একমত পোষণ করেন।

৭. উত্তরদাতা শতভাগ অভিভাবক জানান বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো হয় না।

৮. উত্তরদাতা শতভাগ অভিভাবক মনে করেন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো প্রয়োজন ।

৯. ভালো কাজের জন্য পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করেন প্রায় ৯০% শিক্ষার্থী আর ১০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন।

১০. যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর থাকেন ৩০% শিক্ষার্থী আর ৭০% শিক্ষার্থী যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর নয়।

১১. ৯০% শিশু শিক্ষার্থী ভালো কাজে (নামাজের জন্য ডেকে দেয়া, দান সাদাকা করা, সহনশীলতা ও অপরকে সহায়তা) ইত্যাদি কাজে মা-বাবার হস্তক্ষেপ কামনা করে আর মাত্র ১০% শিক্ষার্থী এ ব্যাপারে মা-বাবার কোন সাহায্য কামনা করে না।

১২. উত্তরদাতা অভিভাবকগণ জানান শতভাগ শিক্ষার্থী রমজান মাসে সাওম পালনে আগ্রহী।

১৩. ১০% শিক্ষার্থী বাসায় নবি-রাসুলদের বিভিন্ন আদর্শ ও শিক্ষনীয় ঘটনা সম্পর্কে মা-বাবার কাছে জানতে চায় আর ৯০% শিক্ষার্থী এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে না।

১৪. ৬০% শিক্ষার্থী মাঝে মাঝে পরিবারে ভালো আচরণ অনুশীলন করে এবং মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকে আর ৪০% শিক্ষার্থী নিয়মিত পরিবারে ভালো আচরণ অনুশীলন করে ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকে।

১৫. উত্তরদাতা অভিভাবকগণ জানান শতভাগ শিক্ষার্থী অসুস্থ ব্যক্তির বা রোগীর সেবা করে ও গৃহপালিত পশু-পাখির যত্নে আগ্রহী।

১৬. উত্তরদাতা অভিভাবকগণ জানান শতভাগ শিক্ষার্থী বিভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

১৭. ৬০% শিক্ষার্থী নিজ ধর্ম ইসলামের অনুশাসন পালনে আগ্রহী আর ৪০% শিক্ষার্থী ইসলামের অনুশাসন পালনে উদাসীন ।

১৮. ৮০% শিক্ষার্থী ছুটির দিনে বাড়ির আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং ২০% শিক্ষার্থী এ কাজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী নয়।

শিক্ষাক্রমে উল্লেখিত শিখনফল শতভাগ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণসমূহ

১। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা কারিকুলাম বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগের অভাব।

২। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যবিষয়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত।

৩। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার জন্য বিষয় শিক্ষক নেই।

৪। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি যে সকল শিক্ষক বিদ্যালয়ে পাঠদান করেন তাঁদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

৫। বিদ্যালয়ে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টির শ্রেণি কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করা হয় না।

৬। পাঠ্যপুস্তকে যা শেখানো হচ্ছে তা বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ খুবই কম।

৭। অভিভাবকদের অসচেতনতা।

৮। শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের সদিচ্ছার অভাব।

৯। আধুনিক পাঠদান কৌশলের অভাব।

১০। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করতে না পারা।

আলোচনা

- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' নামে (তৃতীয় শ্রেণি, চতুর্থ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণি) পর্যন্ত পাঠ্যতালিকায় যে বিষয়টি রয়েছে তাতে প্রতি শ্রেণিতে (ইমান ও আকাইদ, ইবাদত, কুরআন মজিদ শিক্ষা, আখলাক ও নবি-রাসুল) নামে পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলাম শিক্ষার পরিধি সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়টির মাধ্যমে ইসলামধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণে দেখা যায় এতে একই বিষয়ের আলোচনা একাধিকবার এসেছে আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন আলোচনাই স্থান পায়নি। ইসলামের আলোচনা মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে তাও খুব সংক্ষিপ্তাকারে। এতে শিরক, বিদআত, ইসলামে জ্ঞানচর্চার নির্দেশনাসহ অনেক জরুরি বিষয় আলোচিত হয়নি। সর্বোপরি ইসলামকে একটি সংকীর্ণ ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। এটি একটি সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে উপস্থাপনের কোন নির্দেশনা পরিলক্ষিত হয়নি।
- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিকস্তরে (৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণির) ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে মোট পৃষ্ঠা রয়েছে ৩০৬টি। এতে ইমান ও আকাইদ সংক্রান্ত আলোচনা: ৪৩ পৃষ্ঠা, ইবাদত সংক্রান্ত: ৬৭ পৃষ্ঠা, কুরআন মজিদ শিক্ষা সংক্রান্ত: ৪৫ পৃষ্ঠা, আখলাক সংক্রান্ত: ৪৬ পৃষ্ঠা, নবি-রাসুল সংক্রান্ত আলোচনা: ৫৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' বিষয়টিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন রুটিনের একেবারে শেষে স্থান দেওয়া হয়েছে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাই এটি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' বিষয়টির ব্যাপারে অভিভাবকগণের অসচেতনতা চোখে পড়ার মতো।
- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' বিষয় ছাড়া বাকী পাঠ্যবইগুলোতে ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে তার বিপরীতে একশ (১০০) নম্বরের ইসলাম শিক্ষার কোন তাৎপর্যই অবশিষ্ট থাকে না।
- পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ''পাঠ্যক্রম উন্নত চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটায়'' একথা বলা হলেও বাস্তবে এ লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। তাই পাঠ্যক্রম নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।
- মানুষ হলো নৈতিক জীব। নৈতিকতাই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানের বিকাশের সাথে প্রয়োজন সুসংগঠিত নীতিবন্ধন। কোনক্রমেই নৈতিকতা হারালে মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।
- মানুষের আসল পরিচয় ও মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের যথার্থ বিকাশ কেবল ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।
- বাংলাদেশের সংবিধান, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানস, ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার পরিপন্থি কোন বিষয়ই কোন স্তরের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত হবে না।
- বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপরায়ণ। ধর্মীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে বাংলাদেশের জনসাধারণের ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা কল্পনাই করা যায় না। তাই বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণে ধর্মীয় শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।
- ধর্ম কেবল আলোচনার বিষয় নয়। ধর্ম হলো অনুভূতির বিষয়। বিদ্যালয়ের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মূল পদ্ধতি হওয়া উচিত সক্রিয়তাভিত্তিক।
- আমাদের সমাজ বর্তমানে যে নৈতিক অবক্ষয়ের মধ্যে পতিত হয়েছে তা হতে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো যথার্থ নৈতিক শিক্ষা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতার ব্যাপক অনুশীলন।
- আমাদের বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবর্জিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও কর্মে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু প্রতিফলন পরিলক্ষিত হচ্ছে না।
- বাংলাদেশের শিক্ষানীতি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক মূলত ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় রচিত। পাঠ্যক্রমের সকল স্তরে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিফলিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মাত্র একটি বিষয়ে ইসলাম শিক্ষা প্রদান করে সামগ্রিক নৈতিকমান অর্জন সম্ভব নয়। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত সমাজ বিজাতীয় ধর্মহীন চিন্তা ও ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।
- আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে সৎ, দক্ষ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক তৈরীর জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শ জাগ্রত করাই প্রাধান্য পেয়েছে।

- ‘‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’’ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলে ও বিদ্যালয়ে এটি একটি গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হয়। যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হলে ইসলাম সম্পর্কে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দেয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা যায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ২ দিনে মাত্র ২টি পিরিয়ড অনুষ্ঠিত হয়।
- ‘‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’’ বিষয়টি পাঠদানের জন্য এ বিষয়ের নির্দিষ্ট কোন শিক্ষক নেই। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক ও বয়স্ক পুরুষ শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করা হয়। তাছাড়া একেক বছর একেক শিক্ষক পর্যায়ক্রমে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদান করেন। তাই শিক্ষকদের মধ্যে কেউই এ বিষয়ের পাঠদানে দক্ষ হয়ে উঠছে না।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের জন্য এ বিষয়ের যোগ্য ও দক্ষ কোন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয় না।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই ।
- এ গবেষণায় যে সকল শিক্ষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে কেউ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাননি।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে দেখানোর ব্যবস্থা নেই। গবেষক সরেজমিনে দেখতে পান যে, কোন বিদ্যালয়ে ইসলামের মৌলিক ইবাদত ‘‘সালাত’’ অনুশীলন ও আদায় করার জন্য কোন কক্ষ বরাদ্দ নেই। তবে কয়েকটি বিদ্যালয়ে সংলগ্ন মসজিদ রয়েছে।
- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিকস্তরের ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম শ্রেণির পাঠ্যবই বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদেশ, উপদেশ কিংবা হিতোপদেশ শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এসব শিখন প্রয়োগের সুযোগ নেই বললেই চলে।
- সরেজমিনে দেখা যায় ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের চেয়ে মক্তব অথবা পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা বেশি। আর এর জন্য বিদ্যালয়ে ইসলাম শিক্ষা বিষয়টির ব্যাপারে অবহেলাকে দায়ী করেন।
- ইসলামি নৈতিকতা মূলত মানুষের বাস্তব জীবনে আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও নিষেধের প্রতিফলন। নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানুষ কেবল সে কাজটিই করেন যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। আর আল্লাহর অপছন্দের কাজগুলো পরিহার করে চলেন।
- নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আলোকিত মানুষগুলোই দেশ ও সমাজের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ হয়ে থাকে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের মতোই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষে বছরব্যাপী ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহলে এ বিষয়টির শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগের একটি সুযোগ তৈরী হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিশুবান্ধব ইসলামি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষককে হতে হবে ধৈর্যশীল, বন্ধুসুলভ,

সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, দায়িত্বশীল, আন্তরিক, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, বাকপটু, নিয়মানুবর্তী ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রশিক্ষিত।

- অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টির ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেন না। ফলে শিক্ষক ইচ্ছে মতো শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।
- নৈতিকতার মূলভিত্তি হলো সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে ব্যক্তি জীবনে তাঁর আদেশ- নিষেধ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, কুকর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করে। মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ছাড়া একটি সুশৃঙ্খল ও কল্যাণকর মানব সমাজ কল্পনা করা যায় না।
- প্রাথমিকস্তরের ১ম শ্রেণি ও ২য় শ্রেণিতে ধর্মশিক্ষা রাখা হয়নি। অথচ ললিতকলা শিক্ষা পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।
- নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানা ও নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা একটি শিশুর অধিকার। আজকের শিশুকে আগামী দিনের সত্যিকার আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষা। শিশু যেন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য রাষ্ট্রকেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর পৃষ্ঠা-৪১ এ ললিতকলা শিক্ষা সম্পর্কে কৌশল ৬ ও ৭ নং এ বলা হয়েছে। ''সরকারি উদ্যোগে ও অর্থানুকুল্যে জাতীয় চিত্রশালা, সংগীত ও নৃত্য একাডেমী, নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্চনীয়''।

  ''সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শহর ও গ্রাম পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ চিত্রকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী, সংগীত, নাটক ও নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে''।

  ললিতকলা শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নানা কর্মসূচি গ্রহণ করলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের জন্য শিক্ষানীতিতে তেমন কোন নির্দেশনা নেই।
- প্রাথমিকস্তরের (৩য়-৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ে ধর্মীয় ও পারিভাষিক বানানের ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় অসংগতি রয়েছে। বইগুলোতে কোথাও মুহম্মদ, রসূল, কুরআন মাজিদ এভাবে লেখা হয়েছে। আবার কোথাও মুহাম্মদ, রাসূল, কুরআন মজিদ এভাবে লেখা হয়েছে। অনেকগুলো বানান আরবি প্রতি বর্ণায়ন অনুযায়ী হয়নি।
- শিক্ষকদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা প্রেরণ করা হয়নি এবং এই বিষয়ে শিক্ষকদের কোন প্রশিক্ষণও দেয়া হয়নি।

সুপারিশ

- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বর্তমান যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রয়েছে তা মোটামুটি ভালো। কিন্তু এ বিষয়টির শিক্ষা কেবল পাঠদানে সীমাবদ্ধ নয় এটি

প্রয়োগের বিষয়। তাই ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বর্তমান পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে আরো কিছু বিষয় সংযোজন করা জরুরি এবং প্রয়োগের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি বলে মনে করি।

- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম) শ্রেণির ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে এসব আলোচনায় বিষয়ভিত্তিক কুরআনের আয়াত ও হাদিস সংযুক্ত করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা একই সাথে কুরআন ও হাদিসের দলিলভিত্তিক আলোচনার সাথে পরিচিত হবে। ফলে যেকোন ইসলামি বিষয়ের আলোচনায় কুরআন ও হাদিসের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে পারবে।
- মানুষের অধিকারসমূহ নামে একটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা প্রয়োজন ছিল। যেখানে বান্দার হক তথা পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অসহায়, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কসহ সাধারণ মানুষের অধিকারসমূহ নিয়ে কুরআন ও হাদিসের তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা প্রয়োজন।
- হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক সুস্পষ্ট আলোচনা করা প্রয়োজন ছিল।
- বিদ্যমান নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় একদিনে সৃষ্টি হয়নি। তাই এ থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। নৈতিক প্রগতি ও সচ্ছতায় উত্তরণের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী, শক্তিশালী ও সুপরিকল্পিত সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আর এই উদ্যোগের প্রথম হাতিয়ার হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন। কারিকুলামে নৈতিক শিক্ষা এমনভাবে ঢেলে সাজানো উচিত যেন একজন শিক্ষার্থী সচেতনভাবে সঠিক নৈতিকতা অর্জনে সচেষ্ট হয়।
- আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষাথীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে।
- শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি, বিবেকবোধ, আত্মসম্মানবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংযোজন করতে হবে।
- পরকালীন জীবনের প্রতি শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা এবং পরকালের সফলতা ও ব্যর্থতাকে প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার উপযোগী বিষয়বস্তু পাঠ্যবিষয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা।
- ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা'' বিষয়ের শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা ও চারিত্রিক মাধুর্য ছাড়া শিক্ষার্থীদের যথাযথ নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আবশ্যক।
- শুধু শিক্ষা দ্বারা মানুষের চরিত্র সংশোধিত হয় না। শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে ''সততা স্টোর'' এর পাশাপাশি সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ, যথাসময়ে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক আচরণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন ক্লাস রুটিনে সাপ্তাহিক কেবল ২টি পিরিয়ডে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠদান করা হয়। এই পিরিয়ডগুলোতে ইসলামি শিক্ষা পেলেও বাকী পিরিয়ডগুলোতে যা শিক্ষা দেওয়া হয় তা পরস্পর বিরোধী শিক্ষা। তাই শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামাইজেশন জরুরি হয়ে

পেড়েছে। শতভাগ ইসলামাইজেশন করা সম্ভব না হলেও অন্যান্য পাঠ্যবিষয়গুলোতে ইসলামি উপাদান বাড়ানো ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়বস্তুগুলো বাদ দেওয়া উচিত।

- এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজরা সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে সহশিক্ষা চলতে পারে না। সহশিক্ষার কুফল ও ভয়াবহ পরিণতি ইতোমধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতিনিয়ত। তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে সহশিক্ষা বন্ধ করে ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অথবা আলাদা আলাদা শিফটে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি।
- বিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ অনুশীলন করে শিখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সন্তানদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে এমন কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত ধর্মীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের যথার্থ প্রয়োগ করার সুযোগ পায়।
- বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ধর্মীয় মৌলিক নীতিগুলো প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়টি শিক্ষকদের তদারকি করতে হবে।
- শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের দৈনন্দিন আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অর্জিত ইসলামি জ্ঞান ও বিশ্বাসের পূর্ণ অনুশীলন করার সুযোগ পায় অভিভাবকগণ সে বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।
- সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে এতটা পরিমাণ আরবি ভাষা শিক্ষা রাখা আবশ্যক যেন শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কুরআন পড়তে পারে ও অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়।
- প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেন শিশুরা মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে ও তা অনুশীলনে সচেষ্ট হয়।
- পাঠ্যক্রমে মানুষের মন্দ আচরণের (মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, ঘুষ, দুর্নীতি, হারাম উপার্জন, প্রতারণা, খাদ্যে ভেজাল, চুরি, নকল, ওয়াদা খেলাফ, অপচয়, মানুষের হক নষ্ট করা ইত্যাদি) বিষয়ভিত্তিক কঠোর সমালোচনা করে এর পরিণতি উল্লেখ করতে হবে যাতে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয় সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়।
- পাঠ্যক্রমে মানুষের ভালো আচরণের (সত্য বলা, ধোঁকাবাজী না করা, হালাল উপার্জন, অপচয় না করা, প্রতারণা না করা, ঘুষ ও দুর্নীতি মুক্ত থাকা, ওয়াদা পালন করা, মানুষের হক নষ্ট না করা ইত্যাদি) বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করে এসবের সুফল উল্লেখ করতে হবে যাতে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এসব গুণ অর্জনের বিষয়ের তীব্র আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়।
- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রধান বাহন হলো আরবি ভাষা। আমাদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে প্রাথমিক আরবি শিক্ষা সংযুক্ত করা উচিত। কেননা আরবি ভাষা ন্যূনতম না বুঝলে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হবে বলে মনে হয় না।
- ‘‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’’ পাঠ্যবইয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে অমুসলিম নাগরিকগণ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সে সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা জরুরি। এ বিষয়টি আলোচনা

করা হলে ইসলামে অমুসলিমদের যেসকল অধিকার স্বীকৃত সে সম্পর্কে শিশু শিক্ষার্থীরা ধারণা লাভ করবে।

- বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির ইভেন্ট বাড়াতে হবে। যেমন- হামদ, নাত, গজল, ইসলামি সংগীত, ক্বিরাত ও আযান ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।
- বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা, মুসলিম ঐতিহ্য ও ধর্ম বিশ্বাসের পরিপন্থী যেসব বিষয় রয়েছে সকল পাঠ্যবিষয়ের পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব নেতিবাচক টপিক বাদ দিতে হবে। অন্যথায় ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে শিশু মনে ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা জন্মানোর সকল আয়োজন থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ স্থাপনার গায়ে পুষ্পমাল্য প্রদান, নিরবতা পালন, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি করা হয় যা সুস্পষ্ট শিরক। ''ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা" বইয়ে এসব শিরক এর ভয়বহতা তুলে ধরে বাস্তব জীবনে তা থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করাতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামি ভাবধারা ও নৈতিক চরিত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইবাদতের স্থান বরাদ্দ করা জরুরি।
- প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকে (১ম শ্রেণি) থেকে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রাথমিক স্তর থেকেই বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তর থেকেই বিষয়ভিত্তিক কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিস মুখস্তকরণ বিষয়টি পাঠ্যক্রমে যুক্ত করতে হবে। যাতে শিশুকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা কুরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল উপস্থাপন করতে পারে।
- বিদ্যালয়ে প্রতি ২/৩ মাসে "অভিভাবক সমাবেশ" বা "মা সমাবেশ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী যথোপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম চালাতে হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন অভিভাবকদের মতামত নিয়ে তা পর্যালোচনার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত একই বিষয় বারবার আলোচনা করা হয়েছে। যা একবার আলোচনা করে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীরা ইসলাম সম্পর্কে আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীরা যখন নিজে কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করে জানতে পারবে যে, কোন ধরনের অপরাধের শাস্তি কি এবং কি কাজের কি পুরস্কার তখন শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি জীবনে তা থেকে উপকৃত হতে পারবে এবং ব্যক্তি জীবনে কুরআন ও হাদিস দ্বারা বেশি প্রভাবিত হবে।

- প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান করা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক অনাচার থেকে বাঁচতে পারবে ও এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারবে।
- শিশুকাল থেকে শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী করা সম্ভব হলে কুরআন ও হাদিসের আলোকে আদর্শ জীবন গঠন করার জন্য শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হবে।
- একজন শিক্ষার্থীরা যখন জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, ইভটিজিং, যৌতুক, অপহরণ, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, সন্ত্রাস, সামাজিক অনাচার, জুয়া, ছিনতাই, রাহাজানী, হত্যা ও আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, ধূমপান, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সম্পর্কে সরাসরি কুরআন ও হাদিস থেকে এর ভয়াবহ শাস্তি ও বিধান সম্পর্কে জানতে পারবে তখন কুরআন ও হাদিসের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।
- ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে যদি বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদিস মুখস্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে শিক্ষার্থীদের জীবনে কুরআন ও হাদিসের আমল খুব সহজে বাস্তবায়ন করা যাবে।
- আমাদের পাঠ্যক্রমে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয় ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আরবি ভাষা সেভাবে গুরুত্ব পেলে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে মনে করি।
- বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু এই দ্বিমুখী শিক্ষা জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাই একমুখী ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।
- ঈমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে প্রাথমিক শিক্ষাসহ সকল স্তরে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত করতে হবে।
- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিকে পরিমার্জন করে ইসলামি ভাবধারায় রূপান্তর করতে হবে।
- বিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রের সামষ্টিক প্রত্যাশা পূরণের জন্য শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক শিক্ষার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি বলে মনে করি।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার শিক্ষণ ও অনুশীলন বাস্তবায়নের তদারকির জন্য আলাদা মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।
- শিক্ষকদের সততা, দক্ষতা ও সদাচরণের সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষকের শেখানো উপদেশাবলী আচরণে প্রতিফলিত হতে হবে। শিক্ষক নিজেই যেন শিশু শিক্ষার্থীদের অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন।
- প্রাথমিক স্তরের ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা ফলপ্রসূ করতে হলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও ধর্মীয় শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ

***** সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ইসলামি উপাদান পর্যালোচনা।

* সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা পর্যালোচনা।

* ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের যথার্থতা পর্যালোচনা।

* বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামিকরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা।

* বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম বিদ্বেষী উপাদানের ভয়াবহতা পর্যালোচনা।

উপসংহার

একটি সমৃদ্ধশালী সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো নাগরিকদের চারিত্রিক উন্নয়ন ও উন্নত চারিত্রিক দর্শনে সমৃদ্ধ করা। আর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা কেবল ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামি জীবন অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে শুরু হওয়া ইসলামি শিক্ষার নির্মল সুবাতাস আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে দিন দিন ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করেছিল সবখানে। কিন্তু বাংলাদেশে উপনিবেশিক শাসন শুরু হলে এদেশের ইসলামি শিক্ষায় ছন্দ পতন ঘটে। উপনিবেশিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থায় যে বিভক্তি তৈরি হয়েছিল তা থেকে এ জাতি এখনো মুক্তি লাভ করতে পারেনি। ফলে এ দেশের জনসাধারণের বড় একটা অংশ যৎসামান্যই ইসলামি শিক্ষা পেয়ে থাকে। যা দিয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও অনুশীলন সম্ভব নয়। যার ফলাফল এদেশে ব্যাপক নৈতিকতার অবক্ষয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মধ্যে কিছু নেতিবাচক প্রবৃত্তি বিরাজ করে। মানুষের এসব নেতিবাচক প্রবৃত্তি ও আবেগ অনুভূতি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেগুলো হলো মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, ঘুষ, দুর্নীতি, ইভটিজিং, হারাম উপার্জন, প্রতারণা, খাদ্যে ভেজাল, চুরি, নকল, ওয়াদা খেলাফ, অপচয়, মানুষের হক নষ্ট করা ইত্যাদি। এসকল নেতিবাচক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ও মানব মনকে কলুষতা মুক্ত করার জন্য ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে সমৃদ্ধ দেশ গঠন করতে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মানুষকে মহৎ ও উদার হতে শেখায়। ফলে নৈতিকতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ একটি শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা একটা অধঃপতিত সমাজ চূড়ান্ত অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও উপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত বিভাজিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সর্বসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি। যা স্বাভবিকভাবেই মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং নৈতিকতার অনুশীলন বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কারণ বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টর নৈতিক অধঃপতনে তলিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার খুব সহজে শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে কিছু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দ্বারা এ অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করতে পারে। অনতিবিলম্বে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকার একমুখী ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে। অথবা বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামি উপাদান বৃদ্ধি করে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে পারে। পর্যাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রচলন ও ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলনের মাধ্যমে একটি নৈতিকমান সম্পন্ন জাতি গঠন সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। এতেই এই গবেষণার সার্থকতা নিহিত।

গ্রন্থপঞ্জি

০১. *আল কুরআন*

০২. আলম, অধ্যাপক খুরশীদ। (২০০৮)। *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি (অধ্যাপক নাজির আহমদ কর্তৃক অনুদিত)*। ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।

০৩. আলী, মোহাম্মদ ইলিয়াছ। (১৯৯৯)। *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত)*। ঢাকা: জাগরণী প্রকাশনী।

০৪. আযহারী, মু. আলাউদ্দীন (সম্পা.)। (১৯৯৩)। *আরবী বাংলা অভিধান (২য় খন্ড)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

০৫. আল ফরহীদী, খলিল ইবনে আহমদ। (১৪১৪ হি.)। *কিতাবুল আইন (১ম সং, ২য় খন্ড)*। স্থানবিহীন।

০৬. আল ইফরীকী, ইবন মানযুর। (১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)। *লিসানুল আরব (২য় সংস্করণ, খন্ড-৬)*। বৈরুত: দারুল ইহইয়াত তুরাসিল আরাবি।

০৭. আয যারকানী, আবদুল আযীয। (১৯৭৬)। *মানাহিলুল ইরফান (১ম সংস্করণ, খন্ড-১)*। বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

০৮. আল গাযালী, মুহাম্মদ। (১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.)। *ইয়াহইয়াউ উলুমিদ-দীন (১ম সংস্করণ, খন্ড-১)*। বৈরুত: দারুল খায়র।

০৯. আল-জাহিয। (১৯৯২)। *তাহযীব আল আখলাক* (২য় সংস্করণ)। সৌদি আরব: দারুস সাহাবাহ।

১০. আল গাযালী, ইমাম। *সৌভাগ্যের পরশমনি* (আব্দুল খালেক কর্তৃক অনুদিত)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১১. আকরাম খাঁ, মো:। (১৯৮৭)। *মোস্তফা চরিত*। কলিকাতা: নবজাতক প্রকাশনী।

১২. আলী, অধ্যাপক কে.। (১৯৭৬)। *ইসলামের ইতিহাস*। ঢাকা: আলী পাবলিকেশন।

১৩. আলমগীর, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ। (২০০৬)। *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*। ঢাকা: বুক পয়েন্ট।

১৪. আহমদ, অধ্যাপক খুরশীদ। (২০০৮)। *ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি* (অধ্যাপক নাজির আহমদ কর্তৃক অনুদিত)। ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।

১৫. আলী, মুহাম্মদ আজহার, ও বেগম, হোসনে আরা। (১৯৯৪)। *মুসলিম শিক্ষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৬. আলিম, এ. কে. এম আব্দুল। (১৯৬৯)। *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

১৭. আল কুশাইরী, ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম। *সহীহ মুসলিম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৮. আলম, এ.জেড.এম. শামসুল। (২০০২)। *মাদরাসা শিক্ষা*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.।

১৯. ইসলাম, মো: শহিদুল। (২০১৩)। *ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ঝিনাইদহ জেলার অবদান* (অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ)। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: কুষ্টিয়া।

২০. সম্পাদনা পরিষদ। (১৯৮৮)। *ইসলামী বিশ্বকোষ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২১. ইবনে হিশাম, আব্দুল মালিক। তা.বি.। *সীরাত-ই ইবনে হিশাম* (খন্ড-১)। মিশর।

২২. ইসহাক, ড. মুহাম্মদ। (১৯৯৩)। *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৩. ইবনে মাযাহ, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ। *সুনানে ইবনে মাযাহ* (প্রথম খন্ড)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৪. ইয়াহইয়া, আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মদ। (১৯৮৮০। *দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান*। ঢাকা: আল আমিন রিসার্চ একাডেমী।

২৫. উদ্দিন, ড. আ.ই.ম নেছার। (২০০৫)। *ইসলামি শিক্ষা প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৬. উদ্দীন, মোহাম্মদ বখতিয়ার। (২০১৭)। *আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহ.): ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান* (অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

২৭. উনাইস, ড. ইব্রাহীম। (১৯৭২) । *আল মু'জামুল ওয়াসিত*। বৈরুত: দারুল হাদিস।

২৮. উদ্দীন, মো: জসিম। (২০১৪)। *মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা: চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা* (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: চট্টগ্রাম।

২৯. উদ্দীন, মুহাম্মদ নিজাম। (২০০১)। *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস (১৯৭১-১৯৯০)* (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

৩০. ওয়াহিদ, ড.আব্দুল। (২০০১)। *বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা; প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*। ঢাকা: ইসলামি সাংস্কৃতিক পরিষদ।

৩১. করিম, আবদুল। (১৯৮৭)। *বাংলার ইতিহাস-সুলতানি আমল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৩২. কামাল, মোহাম্মদ মোস্তফা। (২০০৪)। *হযরত মুহাম্মদ (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩৩. খায়ের, খন্দকার আবুল। (২০০৯)। *ইসলামী জীবন দর্শন*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩৪. খান, ড. তাহেরা আরজু। (২০০৬)। *ইসলাম প্রচার ও হাদীস সংরক্ষণে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অবদান* (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: রাজশাহী।

৩৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

৩৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। (২০১০)। *জাতীয় শিক্ষানীতি*-২০১০। ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৩৭. গুপ্ত, নলিনীকাণ্ড। (১৩০৩ বাং.)। *শিক্ষা ও দীক্ষা*। কলিকাতা: ক্যালকাটা পাবলিকেশন।

৩৮. চৌধুরী, ড.কিরণ চন্দ্র। (১৯৭৯)। *ভারতের ইতিহাস কথা* (দ্বিতীয় খন্ড: মধ্যযুগ)। কলকাতা: কলিকাতা মর্ডান বুক এজেন্সি।

৩৯. চৌধুরী, জোৎস্না বিকাশ। (১৯৯৪)। *শিক্ষার ইতিহাস*। ঢাকা।

৪০. (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। (২০১৭)। *প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম: ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪১. (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। (২০২১)। *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*। পাঠ্যবই: তৃতীয় শ্রেণি। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪২. (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। (২০২১)। *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*। পাঠ্যবই: চতুর্থ শ্রেণি। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪৩. (এনসিটিবি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। (২০২১)। *ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা*। পাঠ্যবই: পঞ্চম শ্রেণি। ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

৪৪. তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত। *আস সুনান আত তিরমিযি*। বৈরুত: দারু-এহইয়াইত তুরাসিল আরাবি।

৪৫. তালিব, আব্দুল মান্নান। (১৯৯৪)। *বাংলাদেশে ইসলাম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৪৬. নদভী, আবুল হাসান আলী। (১৯৩৬)। *হিন্দুস্থান কী-কাদীম দরসগাহ*। আযমগড়: দারুল মা'রিফ।

৪৭. নার্গিস, ড. শেখ সালমা। (২০১৫)। *বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষাক্রম ও বিদ্যালয়ে অনুশীলন*। ঢাকা: অন্য প্রকাশ।

৪৮. নোমানী, আল্লামা শিবলী। (১৯৮৯)। *সীরাতুন্নবী (স:)*। আযমগড়: দারুল মুসান্নিফীন।

৪৯. নদভী, সায়্যিদ সোলাইমান। (১৯৩৮)। *মুসলমান কি আকীদা তা'লীম*। আযমগড়: দারুল মা'রিফ।

৫০. নদভী, মাওলানা সৈয়দ রিয়াসত আলী। (১৯৯২)। *ইসলামী নেজামে তালিম*। আযমগড়: দারুল মুসান্নিফীন।

৫১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। (২০২২)। *জনশুমারি ও গৃহ গণনা-২০২২*। ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৫২. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র এম.এ.(সংকলিত)। (১৯৮৪)। *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (৪র্থ সং.)*। কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ।

৫৩. বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। *সহীহ বুখারী*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৫৪. বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। (১৪০৯ হি.)। *আদাবুল মুফরাদ* (৩য় সং.)। বৈরুত: দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়াহ

৫৫. বেগম, অধ্যাপক ড. কামরুন্নেসা। (২০০১)। *প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশ*। ঢাকা

৫৬. বারী, মুহাম্মদ শামীমুল। (২০১১)। *শিক্ষা সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন*। ঢাকা: আইসিএস প্রকাশনী।

৫৭. মালেক, ড. আবদুল, বেগম, মরিয়ম, ইসলাম, ফখরুল, ও রিয়াদ, শেখ শাহবাজ। (২০১২)। *শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলাদেশে শিক্ষা*। ঢাকা: অনুপম প্রিন্টার্স ইউজিসি প্রকাশনা।

৫৮. মাবুদ, ড. আব্দুল। **(২০১৫)**। *রাসূলুল্লাহর (স:) শিক্ষাদান পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

৫৯. মাবুদ, ড. আব্দুল। (২০১৬)। *ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা* (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

৬০. মিয়া, মো: ইসমাইল। (২০০৪)। *মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) শিক্ষা চিন্তায় শিক্ষা দর্শন ও ইসলাম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬১. মহিউদ্দিন, এ.কে. এম.। (১৪৯৭হি./১৯৯৬খ্রি.)। *চট্টগ্রামে ইসলাম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬২. মাসুম, ড. মো: আবদুল্লাহ আল । (২০০৮)। *বৃটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৬৩. মিয়া, এম.এ.ওহাব। (২০০৪)। *শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও মূল্যায়ন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৬৪. মোমিন উল্লাহ, অধ্যাপক মুহাম্মদ। (১৯৮০)। *শিক্ষার ইতিহাস*। ঢাকা: এডুকেয়ার পাবলিকেশন।

৬৫. রহিম, মাওলানা আব্দুর। (২০১৯)। *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী।

৬৬. রহমান, মোহাম্মদ মুজিবুর। (২০১১)। *শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি*। ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী।

৬৭. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর। (২০১৭)। *আল মু'জামুল ওয়াফি, আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান* (২৩ তম মুদ্রণ)। ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী।

৬৮. রফিক, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। (২০১৩)। *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রসারে মাওলানা আবুল কাসেম ছিফাতুল্লাহ এর অবদান* (অপ্রকাশিত এমফিল অভিসন্দর্ভ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা।

৬৯. রব, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর। (১৯৯৯)। *ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। ঢাকা: ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি।

৭০. শরীফ, আহমদ (সম্পা.)। (২০০৭)। *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (৪র্থ মুদ্রণ)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৭১. সলীম, গোলাম হোসাইন। (১৯৭৮)। *রিয়াদুস সালাতীন* (অনুদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

৭২. সাত্তার, আবদুস। (২০১৫)। *আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭৩. সাত্তার, ড. মো.আব্দুস। (২০০৪)। *বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭৪. হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ। (২০০১)। *ইসলাম পরিচয়*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭৫. হিট্টি, পি.কে। (১৯৯৯)। *আরব জাতির ইতিহাস*। কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স।

৭৬. হায়কাল, ড. হুসাইন। (১৯৯৮)। *মহানবী (স:) এর জীবন চরিত* (মাওলানা আব্দুল আউয়াল কর্তৃক অনুদিত)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৭৭. Aristotle. (1946). *The Politics (book vii)*. (Trans: Errets Barker). Oxford: Clarendon press.

৭৮. Hoque, M. Azizul. (1994). *Report of the Moslem Education Advisory Committee*.

৭৯. Kothari CR. (2014). *Research Methodology: Methods and Technique*. New Delhi: New Age International Publications.

৮০. Lewis, Bernard. (1992). *The faith and faithful*. London: Thames and Hudson.

৮১. Mackenze, S.Jhon. (1993). *A Manual of Ethics*. New York: Oxford University press.

৮২. Plato. (1926). *The law (Book-1)*. Trans: R.G. Bury. New York: G.P Patamas sons.

৮৩. Roussesu, Jan Jacques. (1966). (Trans: Barbara Foxtey). London: J.M. Dent and Sons ltd.

৮৪. Russel, Bertrand. (1985). *On Education*. London: Unwin paparbooks.

৮৫. Sarangi, R. (1994). *Moral Education in School: Based and Implication*. New delhi: Deep and Deep Publication.

৮৬. Taylor, Paul.W. *Problems of moral philosophy* (2nd edition). California: Dickenson publishing co.inc.

৮৭. Venkataiah, N. (1998). *Value Education an Overview*. New delhi: Apit Publishing corporation.

৮৮. Wehr, CF. Hans. (1976). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken Language Services Inc.

৮৯. Wehmeier, Sally. (2003-2004). *Oxford Advanced* L*earners Dictionary* (Sixth edition). New York: Oxford University Press.

৯০. www.bangladesh.gov.bd.

পরিশিষ্ট

তৃতীয় শ্রেণি শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীর নামঃ রোলঃ

বিদ্যালয়ের নামঃ

ঠিকানাঃ

১. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি স্রষ্টা, পালনকারী, রিযিকদাতা, পরম দয়ালু এ সম্পর্কে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

২. নবি রাসুলগণ আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির শিক্ষক/পথপ্রদর্শক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাঁদের উপর নাযিল হয়েছে আসমানি কিতাবসমূহ এ সম্পর্কে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখেরাত। পৃথিবীর ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখেরাতে ভোগ করতে হবে; এ সম্পর্কে-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৪. ইবাদত হিসাবে ওযু, গোসল, সালাতের নিয়মসমূহ সম্পর্কে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৫. দৈনন্দিন জীবনে ইবাদত হিসাবে ওযু, গোসল ও সালাতের ফরজ ও নিয়মসমূহ আমি-

(ক) নিয়মিত পালন করি (খ) মাঝে মাঝে পালন করি

৬. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও কোন সালাত কখন আদায় করতে হয় তা আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) একেবারেই জানি

৭. আব্বা-আম্মার কথা শোনা, সদা সত্য কথা বলা, সালাম দেয়া, সহপাঠী ও মেহমানের সাথে ভালো আচরণ, জীবে দয়া করা ও মানুষের সেবা করা এগুলোকে সৎ চরিত্র হিসাবে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৮. দৈনন্দিন জীবনে উপরে উল্লেখিত ইবাদতসমূহ (৭নং) আমি সচেতনভাবে-

(ক) নিয়মিত পালন করি (খ) মাঝে মাঝে পালন করি

৯. কুরআন মজিদ আল্লাহর কিতাব। এটি আরবি ভাষায় নাযিল হয়। এই আরবি বর্ণমালার ২৯ টি হরফ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ আমি-

(ক) সঠিকভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

১০. আরবি বর্ণমালার হরফগুলোর হরকত, তানবীন, জযম, তাশদীদ সহকারে উচ্চারণ আমি-

(ক) সঠিকভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি (ঘ) একেবারেই জানি না

১১. আরবি হরফসমূহ ও আরবি হরফ সহকারে শব্দগঠন করে পড়তে ও লিখতে আমি-

(ক) সঠিকভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি (ঘ) একেবারেই জানি না

১২. সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর মধ্যে শুদ্ধভাবে মুখস্ত পারি-

(ক) সবগুলো (খ) ২টি (গ) ১টি

১৩. মহানবি (স) ছিলেন মানবদরদি, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, পরোপকারী, আমানতদার, বন্ধুভাবাপন্ন, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অন্যান্য গুণের অধিকারী। এ আদর্শ সম্পর্কে আমি-

(ক) সঠিকভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

১৪. উপরে উল্লেখিত রাসুল (স) এর জীবনাদর্শসমূহ আমি-

(ক) সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করি (খ) আংশিক অনুসরণ করি

১৫. হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও অন্যান্য নবি-রাসুলের নাম জানি-

(ক) ৬ জনের (খ) ৪ জনের (গ) ২ জনের

১৬. বিদ্যালয়ে তোমাদের কোন শিক্ষককে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ কর?

- হ্যাঁ

- না

চতুর্থ শ্রেণি শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীর নাম: রোল:

বিদ্যালয়ের নাম:

ঠিকানা:

১. মহান আল্লাহর আদেশে সৃষ্টি জগতের সবকিছুই নিয়মমতো পরিচালিত হচ্ছে এ সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

২. মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এ সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

৩. কালেমায়ে শাহাদাত, ঈমানে মুজমাল ও ইমানে মুফাসসাল আমি আরবিতে শুদ্ধভাবে পড়তে ও বলতে পারি-

ক. সবগুলো খ. ২টি গ. ১টি

৪. নবি রাসুলগণ আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির পথপ্রদর্শক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাঁদের উপর নাযিল হয়েছে আসমানি কিতাবসমূহ এ সম্পর্কে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখেরাত। পৃথিবীর ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখেরাতে ভোগ করতে হবে; এ সম্পর্কে-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৬. পবিত্রতার অংশ হিসাবে অযুর নিয়ম, অযু ভঙ্গের কারণ, গোসলের নিয়মসমূহ আমি-

ক. নিয়মিত পালন করি খ. মাঝেমাঝে পালন করি

৭. আযান, আযানের দু'য়া, ইকামতের বাক্যগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থসহ আমি মুখস্ত বলতে-

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি ঘ. একেবারেই পারি না

৮. তাশাহুদ, দরূদ শরীফ, দু'য়া মাসুরা, সালাম ও মুনাজাতের বাক্যগুলো আমি-

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি

৯. সালাতের আহকাম, আরকান, জুমার সালাতের এবং দুই ঈদের সালাতের নিয়মসমূহ আমি বলতে

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি ঘ. একেবারেই পারি না

১০. সালাতের আহকাম ও আরকান পালনসহ দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত, জুমার সালাত আমি-

ক. নিয়মিত পালন করি খ. মাঝে মাঝে পালন করি

১১. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা, শিক্ষককে সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা, সত্য কথা বলা ও ওয়াদা পালন করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা এগুলো যে সচ্চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১২. (১১নং) এ উল্লেখিত সচ্চরিত্রসমূহ আমি সচেতনভাবে-

ক. নিয়মিত পালন করি খ. মাঝে মাঝে পালন করি

১৩. আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা, অহংকার করা এগুলো যে অসৎ চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১৪. (১৩নং) এ উল্লেখিত অসচ্চরিত্রসমূহ থেকে আমি সচেতনভাবে বেঁচে থাকি-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে

১৫. কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১৬. যবর, যের ও পেশযুক্ত শব্দ,তানবীন, জযম ও তাশদীদ যুক্ত শব্দ আমি পড়তে, বলতে ও লিখতে-

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি

১৭. মাদ্দ, মাখরাজ, ইদগাম ও ইযহার এর নিয়মসহ আমি পবিত্র কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতে-

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি

১৮. সূরা নাসর, সূরা লাহাব ও সূরা ইখলাস শুদ্ধভাবে উচ্চারণে আমি মুখস্ত পড়তে ও বলতে পারি-

ক. সবগুলো খ. ৩টি গ. ২টি

১৯. মহানবি (স) এর শৈশব, যৌবন, হিলফুল ফুযুল গঠন, নবুয়ত লাভ ও মক্কায় ইসলাম প্রচার এবং তাঁর জীবনের আদর্শগুলো: যেমন- মানবদরদী, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, আমানতদার, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অন্যান্য অনেক সৎগুণের অধিকারী ছিলেন। এ সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি ঘ. একেবারেই পারি না

২০. উপরে উল্লেখিত (১৯নং) রাসুল (স) এর জীবনাদর্শসমূহ আমি-

ক. সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করি খ. আংশিক অনুসরণ করি

২১. হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত অন্যান্য নবি রাসুলের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আমি

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

২২. বিদ্যালয়ে তোমাদের কোন শিক্ষককে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ও অনুসরণ কর ?

- হ্যাঁ

- না

৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীর নামঃ রোলঃ

বিদ্যালয়ের নামঃ

ঠিকানাঃ

১. মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলী (আল্লাহ বিশ্বের পালনকর্তা, আল্লাহ ক্ষমাশীল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান) ইত্যাদি সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

২. নবি রাসুলগণের আগমনের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের কাজ সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি ঘ. জানি না

৩. মৃত্যুর পরবর্তী জীবন আখেরাত। পৃথিবীর ভালোমন্দ কাজের পুরস্কার ও শাস্তি আখেরাতে ভোগ করতে হবে; এ সম্পর্কে আমি-

(ক) ভালোভাবে জানি (খ) মোটামুটি জানি (গ) আংশিক জানি

৪. কবরের জীবন, কবরের সওয়াল-জওয়াব, মিজান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

৫. অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত হিসাবে সালাতের নিয়মকানুন, আহকাম-আরকান, সালাতের ওয়াজিবসমূহ আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

৬. অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত হিসাবে আমি সাওম পালন করি-

ক. সবগুলো খ. (১-২০)টি গ. (১-১০)টি

৭. ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ ২টি স্তম্ভ হলো যাকাত ও হজ। এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি ঘ. জানি না

৮. পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত বিভিন্ন ব্যবহারিক দু'য়া যেমন; কোন কাজ শুরু করার দু'য়া, ঘুমানোর ও ঘুম থেকে উঠার দু'য়া, মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু'য়া এবং সালাম ও সালামের উত্তর ইত্যাদি সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

৯. আব্বা-আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করা, শিক্ষকের সম্মান করা, বড়দের সম্মান করা, সত্য কথা বলা ও ওয়াদা পালন করা, পরিবেশ সংরক্ষণ করা, ক্ষমা করা ইত্যাদি যে সচ্চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১০. (৯নং) এ উল্লেখিত সচ্চরিত্রসমূহ আমি সচেতনভাবে-

ক. নিয়মিত পালন করি খ. মাঝে মাঝে পালন করি

১১. আব্বা-আম্মার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, লোভ করা, অপচয় করা, পরনিন্দা করা, অহংকার করা এগুলো যে অসৎ চরিত্রের অংশ সে সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১২. (১১নং) এ উল্লেখিত অসচ্চরিত্রসমূহ থেকে আমি সচেতনভাবে বেঁচে থাকি-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে

১৩. আমি ভালো কাজে সহযোগিতা করি ও মন্দকাজে বাধা দিয়ে থাকি এবং নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করি-

ক. নিয়মিত খ. মাঝেমাঝে

১৪. সততা, দেশপ্রেম এবং জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১৫. কুরআন মজিদের পরিচয়, গুরুত্ব ও তিলাওয়াতের ফযিলত সম্পর্কে আমি-

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি

১৬. তাজবীদের যাবতীয় নিয়ম কানুন ও মাখরাজসহ কুরআন মজিদ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে-

ক. ভালোভাবে পারি খ. মোটামুটি পারি গ. আংশিক পারি ঘ. পারি না

১৭. সূরা ফীল, সূরা কুরাইশ, সূরা মাউন, সূরা কাউসার, সূরা কাফিরূন শুদ্ধ উচ্চারণে মুখস্ত পড়তে পারি-

ক. সবগুলো খ. ৪টি গ. ২টি ঘ. একটিও না

১৮. উপরে উল্লেখিত (১৭ নং) সূরাগুলো আমি সালাতে পড়ি -

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

১৯. মহানবি (স) এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আমি জানি এবং তাঁকে অনুসরণ করি

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

২০. কুরআন মজিদে উল্লেখিত ২৫ জন নবি-রাসুলের নামের মধ্যে আমি বলতে পারি -

ক. সকলের নাম খ. (১-২০) জনের নাম গ. (১-১০) জনের নাম

২১. হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়াও পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত অন্যান্য নবি রাসুলের জীবনী ও আদর্শ সম্পর্কে আমি -

ক. ভালোভাবে জানি খ. মোটামুটি জানি গ. আংশিক জানি ঘ. জানিনা

শিক্ষক (৪র্থ ও ৫ম)

শিক্ষকের নাম: পদবী:

বিদ্যালয়ের নাম:

ঠিকানা: মোবাইল নং:

১. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা কারিকুলাম সম্পর্কে আপনি-

ক. পুরোপুরি অবগত খ. আংশিক অবগত গ. অবগত নই

২. শ্রেণি কার্যক্রমে অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল অর্জনে সম্পূর্ণ সচেতন থাকি। আমি-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. মন্তব্য নেই

৩. দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক নির্দেশনা অনুসরণ করি। আমি-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. মন্তব্য নেই

৪. উদাহরণ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে আল্লাহর পরিচয় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু যথার্থ।

ক. সম্পূর্ণ একমত খ. একমত নয় গ. মন্তব্য নেই

৫. শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত অধ্যায়ভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম: যেমন- বিভিন্ন সচ্চরিত্রের তালিকা, অসৎ চরিত্রের তালিকা, আল্লাহর নাম, কাবা ঘরের ছবি, মুহাম্মদ (স) এর বাণী, বিভিন্ন আরবি হরফ ইত্যাদি পোস্টার, চার্ট ও মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৬. সাপ্তাহিক যে কোন দিনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শ্রেণি কক্ষ ও বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৭. শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত পরিকল্পিত কাজ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সালাত, আযান, ইকামত, সূরা তিলাওয়াত, তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দু'য়া মাসুরা ও মুনাজাত ইত্যাদি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৮. শিক্ষক বিদ্যালয়ে আখলাকে হামিদাহ অনুশীলনের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা?

- হ্যাঁ
- না

৯. বিষয়ভিত্তিক কোন আলাদা প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে কিনা?

-হ্যাঁ

-না

১০. শিখনফল অর্জনে আখলাকে হামিদাহ ও আখলাকে যামিমার বিষয়বস্তু ও নির্দেশিত ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদম না

১১. বিদ্যালয়ে শারীরিক ইবাদতগুলো অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা

- আছে
- নাই

১২. বিদ্যালয়ে শারীরিক ইবাদতগুলো অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন

-আছে

- নাই

১৩. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক আরবি হরফ, তাশদীদযুক্ত বর্ণ ও শব্দ, দুই হরফ ও তিন হরফ যুক্ত শব্দ, জযম, তানবীন ও মাদ্দযুক্ত বর্ণ ও শব্দ ইত্যাদি বোর্ডে লিখে উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করানো হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

১৪. শ্রেণিকক্ষে বিদ্যমান উপকরনের পাশাপাশি আনুষাঙ্গিক অন্যান্য: যেমন- (ছবি, প্রজেক্টর, অডিও ইত্যাদি) উপকরণ ব্যবহার করা হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদম না

১৫. পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান কুরআনের সূরাসমূহ শুদ্ধভাবে অনুশীলনে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়-

ক. নিয়মিত খ. মাঝেমাঝে গ. একদম না

১৬. নৈতিকতা ও সৎ চরিত্রের উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যালয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন-

ক. সম্পূর্ণ একমত খ. একমত গ. একমত নই

১৭. ধর্ম ও নৈতিকতা অনুশীলনের জন্য উৎসাহ প্রদানের জন্য বার্ষিক মূল্যায়ণ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা প্রয়োজন-

- আছে
- নাই

১৮. নৈতিকতা ও ইসলাম শিক্ষার শিখনফলগুলো দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন হচ্ছে-

ক. সম্পূর্ণ একমত খ. একমত গ. একমত নই

১৯. বিদ্যমান সামাজিক অসঙ্গতি: যেমন- পিতামাতার অবাধ্যতা, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, শিক্ষকের সাথে অসদাচরণ ইত্যাদি থেকে দূরে রাখতে প্রাথমিক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু যথার্থ-

ক. দৃঢ়ভাবে একমত খ. একমত গ. একমত নই

২০. বর্তমান পরিস্থিতিতে উপরে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এর পেছনে নিচের কোন কারণটি মুখ্য বলে মনে করেন?

ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা খ. বিদ্যালয়ে যথার্থ অনুশীলনের অভাব

গ. অভিভাবকের সচেতনতার অভাব ঘ. আর্থ-সামাজিক অবস্থা

২১. শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এবং বিদ্যালয়ের রুটিন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সময় (সপ্তাহে ২ পিরিয়ড) পর্যাপ্ত বলে মনে করেন কিনা?

- হ্যাঁ
- না

২২. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ধর্ম শিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত কিনা?

- হ্যাঁ
- না

২৩. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে রচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত-

ক. দৃঢ়ভাবে একমত খ. একমত গ. একমত নয়।

অভিভাবক (৩য় ও ৪র্থ)

অভিভাবকের নাম: পদবী:

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের নাম:

ঠিকানা: মোবাইল নং:

১. আপনার সন্তান ইমান ও আকাইদ (আল্লাহর পরিচয়, নবি রাসুলের পরিচয়, আখিরাত, আসমানি কিতাবের পরিচয়) সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানতে চায়-

- হ্যাঁ

- না

২. আপনার সন্তান ওযু, গোসল ও সাওমের নিয়মকানুন পালনে আগ্রহী?

-হ্যাঁ

- না

৩. পিতামাতার কথা শুনে, বড়দের সালাম ও সম্মান করে, সত্য কথা বলে, সহপাঠী ও মেহমানদের সাথে ভালো আচরণ, বাড়ীর কাজে সহায়তা এবং রোগীর সেবা করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৪. মিথ্যা কথা, চুরি, মন্দ কথা, ভাইবোনের সাথে, সহপাঠী ও প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৫. বাসায় নিয়মিত শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৬. বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়-

ক. সম্পূর্ণ একমত খ. একমত ঘ. একমত নই

৭. বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো হয় কিনা?

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে ঘ. একদমই না

৮. বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো প্রয়োজন বলে মনে করেন?

-হ্যাঁ

- না

৯. ভালো কাজের জন্য পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশিদের উদ্ধুদ্ধ করে কিনা?

-হ্যাঁ

- না

১০. যথাযথ সময়োনুযায়ী সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর কিনা?

- হ্যাঁ

- না

১১. শিশু ভালো কাজে (নামাযের জন্য ডেকে দেয়া, দান সাদাকা করা, সহনশীলতা ও অপরকে সহায়তা) মা বাবার হস্তক্ষেপ কামনা করে?

- হ্যাঁ

- না

১২. রমজান মাসে সাওম পালনে আগ্রহী?

- হ্যাঁ

- না

১৩. শিক্ষার্থীরা বাসায় বিভিন্ন নবি-রাসুলদের আদর্শ ও শিক্ষাণীয় ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করে বা জানতে চায়?

- হ্যাঁ

- না

অভিভাবক (৫ম)

অভিভাবকের নাম: পদবী:

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের নাম:

ঠিকানা: মোবাইল নং:

১. আপনার সন্তান ইমান ও আকাইদ (আল্লাহর পরিচয়, নবি-রাসুলের পরিচয়, আখিরাত, আসমানি কিতাবের পরিচয়) সম্পর্কে প্রশ্ন করে বা জানতে চায়?

-হ্যাঁ

- না

২. আপনার সন্তান ওযু, গোসল ও সাওমের নিয়মকানুন পালনে আগ্রহী?

-হ্যাঁ

- না

৩. পিতা মাতার কথা শুনে, বড়দের সালাম ও সম্মান করে, সত্য কথা বলে, সহপাঠী ও মেহমানদের সাথে ভালো আচরণ, বাড়ীর কাজে সহায়তা এবং রোগীর সেবা করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৪. মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, মন্দ কথা বলা, ভাইবোন, সহপাঠী ও প্রতিবেশির সাথে ঝগড়া করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৫. বাসায় শুদ্ধভাবে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৬. বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়-

ক. সম্পূর্ণ একমত খ. একমত গ. একমত নই

৭. বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো হয় কিনা?

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

৮. বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবহারিক বিষয়গুলো: যেমন- সালাত আদায় করে দেখানো ও অনুশীলন করানো প্রয়োজন বলে মনে করেন?

-হ্যাঁ

- না

৯. ভালো কাজের জন্য পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশিদের উদ্bুদ্ধ করে কিনা?

-হ্যাঁ

- না

১০. যথাযথ সময়োনুযায়ী সালাত আদায়ের ব্যাপারে তৎপর কিনা?

- হ্যাঁ
- না

১১. শিশু ভালো কাজে (নামাযের জন্য ডেকে দেয়া, দান সাদাকা করা, সহনশীলতা ও সহপাঠীদের সহায়তা) মা-বাবার হস্তক্ষেপ কামনা করে?

- হ্যাঁ
- না

১২. রমজান মাসে সাওম পালনে আগ্রহী?

- হ্যাঁ
- না

১৩. শিক্ষার্থীরা বাসায় বিভিন্ন নবি-রাসুলদের আদর্শ ও শিক্ষাণীয় ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করে বা জানতে চায়?

- হ্যাঁ
- না

১৪. পরিবারে আপনার সন্তান ভালো আচরণ অনুশীলন করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে-

ক. নিয়মিত খ. মাঝে মাঝে গ. একদমই না

১৫. পরিবারে আপনার সন্তান অসুস্থ ব্যক্তির বা রোগীর সেবা করা, গৃহপালিত পশু-পাখির যত্নে আগ্রহী?

-হ্যাঁ

-না

১৬. আপনার সন্তান বিভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ?

- হ্যাঁ
- না

১৭. আপনার সন্তান নিজধর্ম পালনে আন্তরিক ?

- হ্যাঁ
- না

১৮. ছুটির দিনে আপনার সন্তান পরিবারে বাড়ির আঙ্গিনা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করে ?

-হ্যাঁ

- না

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা

১. অর্জিতব্য শিখনফলসমূহ প্রান্তিক যোগ্যতার সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে?

-হ্যাঁ

- না

২. শিখনফলসমূহ শিক্ষার্থীর বয়সের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে?

- হ্যাঁ

- না

৩. বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা (যেমন: পিতা মাতার অবাধ্যতা, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, শিক্ষকের সাথে অসদাচরণ ইত্যাদি) নিরসনে কারিকুলামের বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত ও যথাযথ কিনা?

- হ্যাঁ

- না

৪. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর শিখনফল অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা?

- হ্যাঁ

- না

৫. শিক্ষাক্রমের পরিকল্পিত কাজের সাথে সমন্বয় রেখে শিক্ষক নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে কিনা?

- হ্যাঁ

- না

৬. নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ বিষয়ে শিক্ষকের আচরণ অনুসরণীয় বলে আপনি মনে করেন কিনা?

- হ্যাঁ

- না

৭. শিক্ষাক্রম, নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে মনে করেন?

- হ্যাঁ

- না

৮. শিক্ষাক্রম, নির্দেশিকা ও পাঠ্যপুস্তকে নির্দেশিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারকির কোন ব্যবস্থা আছে কিনা?

- হ্যাঁ
- না

৯. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ধর্ম শিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সে দিকে নজর দেয়া। এই উদ্দেশ্য পূরণে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু পর্যাপ্ত কিনা?

- হ্যাঁ
- না

১০. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে রচিত পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত-

ক. দৃঢ়ভাবে একমত খ. একমত গ. আংশিক ঘ. একমত নয়।

১১. শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এবং বিদ্যালয়ের রুটিন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের সময় (সপ্তাহে ২ পিরিয়ড) পর্যাপ্ত বলে মনে করেন কিনা?

- হ্যাঁ
- না

১২. শিক্ষানীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শিখনফল কতটুকু সফল বা ব্যর্থ বলে আপনি মনে করেন?

....
....
....

১৩. ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়টি পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক আছে কিনা?

- হ্যাঁ
- না